মাওলানা ইসমাইল রেহান

মাওলানা ইসমাইল রেহান

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

[পঞ্চম খণ্ড]

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

[পঞ্চম খণ্ড]

মূল

মাওলানা ইসমাইল রেহান

অনুবাদ

মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান

ইত্তিহাদ

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা | জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

০১৯৩৫-২৮৯৮৩২ | ০১৭৮৯-৮৭৩৬৭৯

০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫ | ০১৯৫৩-০৩৯৮৯৩

আল ইহদা

ঢালকানগর মাদরাসার আমার কয়েকজন পরম প্রিয় উস্তাদ এবং মাওলানা আহমাদ লাট সাহেবের নামে—

যাদের থেকে সাহাবায়ে কেরামের জীবন ও আদর্শ এবং তাকওয়া ও ইখলাসের ঘটনা শুনে বারবার উদ্দীপ্ত হয়েছি। হাদিসের দরসের শান্ত সমাহিত পরিবেশে স্নেহশীল উস্তাদগণের মুখে যখন সাহাবায়ে কেরামের কোনো ঘটনা শুনতাম, মনে হতো, তারা কি মানুষ ছিলেন? মানুষ এত মহান, এত নির্মোহ এবং এত আত্মত্যাগী হয় কী করে? ইজতেমার বিশাল ময়দানে, চটের সামিয়ানার ছায়ায় মাওলানা আহমাদ লাট সাহেবের মর্মস্পর্শী চেতনাজাগানিয়া শব্দে যখন হজরত ইবনে উমর রা. এর ইখলাস ও আল্লাহমুখিতার ঘটনাটি শুনেছি, মনে হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামকে আরেকবার নতুন করে চিনেছি। মানুষের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি এত দৃঢ় বিশ্বাস এবং এত শক্তিশালী আস্থা হতে পারে?

—বিনীত অনুবাদক

অনুবাদকের কৈফিয়ত

মেহেরবান আল্লাহর অফুরন্ত দয়া ও মেহেরবানিতে 'মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডটি পাঠকের হাতে আসার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এ আনন্দঘন মুহূর্তে রব্বে কারিমের দরবারে বারবার সিজদাবনত হওয়ার ইচ্ছা জাগে। কারণ সবই তার করুণার ফল।

আমার অনুবাদের অংশ ছিল ৪র্থ খণ্ডের ভূমিকার পর থেকে ৫ম খণ্ডের শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ 'মুশাজারাত' তথা সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধের অধ্যায়-দু'টি। বিষয়টি যে কতটা স্পর্শকাতর আশাকরি যেকোনো সচেতন পাঠকের তা জানা আছে। অনুবাদের সময় এ অনুভূতি বারবার আমাকে থমকে দিয়েছে। কোনো কোনো শব্দের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকি কয়েকদিনও ভাবতে হয়েছে। এটা নিশ্চয় আমার অযোগ্যতা ও অপরিপক্বতার ফল। তবু চেষ্টা ছিল, যেন মহান সাহাবায়ে কেরামের শানের পরিপন্থি কোনো শব্দ বা বাক্য না লিখে ফেলি। কতটুকু পেরেছি, জানি না। যদি কারো দৃষ্টিতে অসমীচীন বা অশোভন কিছু ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের অবগত করবেন। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, পাঠকের যেকোনো পরামর্শ আমরা পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করব এবং পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধনে সচেষ্ট থাকব ইনশাআল্লাহ।

বিনয়াবনত

৩০ জুমাদাল উখরা, ১৪৪২

মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান
মুরাদপুর, ঢাকা

'তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ'র স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান 'আল মানহাল পাবলিশার্স'-এর পক্ষ থেকে মাকতাবাতুল ইত্তিহাদকে প্রদত্ত বাংলা অনুবাদ প্রকাশের

অনুমতিপত্র

92 321 2855000
92 321 3135009
92 213 4914596

St# 4 & 5, Block: 1/A,
Near Shaikh Zaid Islamic Centre,
Gulistan-e-Juhar, Karachi, Pakistan.

www.almanhalpublisher.com
admin@almanhalpublisher.com
web.facebook.com/almanhal.publisher
@almanhalpublish

Ref: AMP-107 Date: 10-Feb-2021

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Permission

for the publication of the Book.

Peace be upon you and Allah's mercy and blessings be upon you!

Name: Maktabatul Ettihad,
Bangla Bazar, Dhaka, Bangladesh.

We allow Maktabatul Ettihad, Bangladesh to publish the Bengali translation of our famous book, "Tareekh E Ummat E Muslima (4 volumes per now)" by Molana Ismail Rehan Sahib.

No person / Institution other than Maktabatul Ettihad is allowed to copy or translate the contents of the said book. Otherwise Maktabatul Ettihad (NID: 151375926893) will take strict legal action.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجازت نامہ

برائے اشاعت کتاب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

بنام: مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ بازار، ڈھاکہ، بنگلادیش

ہم مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ دیش کو اپنی مشہور ومعروف کتاب بنام "تاریخ امت مسلمہ (چار جلدیں)" مؤلف حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب مدظلہٗ کا بنگلہ زبان میں ترجمہ شائع کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

نیز مکتبۃ الاتحاد کے سوا کسی اور شخص/ادارے کو مذکورہ کتاب کے مواد کی نقل یا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں۔ بصورت دیگر مکتبۃ الاتحاد کو مجوزہ قانونی چارہ جوئی کرنے کی اجازت ہے۔

والسلام

المنہل پبلشرز

کراچی، پاکستان

Al Manhal Publisher
Block 1-A, Gulistan-e-Juhar, Karachi
021-34612901 | 0321-3135009

Hamid Ali

حامد علی کھوکھر

جنرل منیجر

المنہل پبلشرز، کراچی

সূচিপত্র

খেলাফতে রাশেদার সমাপ্তিকাল

খেলাফতে রাশেদা-পরবর্তীযুগ
মুয়াবিয়া রা. এর খেলাফতকাল

মীমাংসার জন্য অঙ্গীকারনামা

যুদ্ধবিরতির এক সপ্তাহ পর, ১৭ সফর ৩৭ হিজরিতে হজরত আলি রা. এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মধ্যে নিম্নোক্ত অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষরিত হয়-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

এটি আলি ইবনে আবু তালিব ও মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং তাদের সাথিদের মধ্যে কুরআন ও হাদিসভিত্তিক অঙ্গীকারপত্র।

১. হজরত আলি রা. এর ফয়সালা গোটা ইরাকবাসীর উপর এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ফয়সালা গোটা শামবাসীর উপর কার্যকর হবে, তারা উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক।
২. হজরত আলি রা. তার সহযোগী আবদুল্লাহ বিন কায়েস, (আবু মুসা আশআরি)-কে এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত আমর ইবনুল আস রা.-কে সালিসরূপে নির্বাচন করতে সম্মত হয়েছেন।
৩. উভয় সালিস এই মর্মে শপথ করবেন যে, তারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবেন এবং যে বিষয়ের বিধান আল্লাহর কিতাবের সাথে মিলবে না, তা রাসুলের হাদিসে তালাশ করবেন।
৪. উভয় সালিস এবং তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষা করা হবে।
৫. উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। সংলাপ অব্যাহত থাকবে।
৬. উভয় সালিস ইরাক ও শামের মধ্যবর্তী একটি স্থান নির্ধারণ করবে।
৭. ফয়সালার জন্য আগত রমজানের শেষ পর্যন্ত সময় নির্ধারিত; কিন্তু উভয় সালিস চাইলে এর পূর্বের বা পরের কোনো সময়ও নির্ধারণ করতে পারবেন।
৮. এই সময়ের মধ্যে মানুষের জীবন, সম্পদ, পরিবার-পরিজন, সন্তানাদি, সব নিরাপদ থাকবে। অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং সমস্ত পথ খোলা থাকবে।

এ অঙ্গীকারপত্রে হজরত আলি রা. এর পক্ষ থেকে যারা স্বাক্ষর করেছেন, তাদের নাম এই-

১. হজরত হাসান রা.
২. হজরত হুসাইন রা.
৩. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.
৪. হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা.
৫. হজরত আশআস বিন কায়েস রা.
৬. হজরত সাহল বিন হুনাইফ রা.
৭. হজরত রাফে বিন খাদিজ রা.
৮. হজরত উকবা বিন আমের রা.

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পক্ষ থেকে যারা স্বাক্ষর করেছেন, তাদের নাম এই-

১. হজরত হাবিব বিন মাসলামা ফেহরি রা.
২. হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা.
৩. হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা.
৪. হজরত আবদুল্লাহ বিন খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.[১]

সমঝোতা সফল হওয়ার জন্য হজরত আলি রা. এর মহানুভবতা

উক্ত অঙ্গীকারপত্রের শুরু হজরত আলি রা. এর নামের সাথে 'আমিরুল মুমিনিন' লেখা হয়েছিল। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দিক থেকে জোরালোভাবে সেটি মুছে ফেলতে বলা হলো। হজরত আলি রা. পূর্ণ উদারতার সাথে সেটি কেটে দিয়ে তদস্থলে 'আলি বিন আবু তালিব' লিখে দিতে বলেন।[২] এর দ্বারা অনুমান করা যায়, সংলাপ ও চুক্তিকে সফল করার জন্য হজরত আলি রা. কতটা আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। এ কারণে প্রতিপক্ষের আইনি আপত্তিকে কোনো গোলযোগের কারণ হতে দেননি। আর এই চিন্তা থেকেই হজরত আলি উভয় সালিসকে অসিয়ত করেছিলেন যে, তোমরা উভয়ে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবে। কুরআন যার আদেশ করেছে, তাকে জীবিত করবে। কুরআন যাকে নিষেধ করেছে, তাকে নিষিদ্ধ করবে।[৩]

---

[১] আল আখবারুত তিওয়াল, পৃষ্ঠা : ১৯৪-১৯৬, আনসাবুল আশরাফ : ২/৩৩৪-৩৩৫, তারিখুত তাবারি : ৫/৫৪,৫৫, আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত।

[২] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৩১৮৭, তারিখুত তাবারি : ৫/৫৩, সনদ সহিহ,

عن على بن مسلم عن حبان بن هلال عن مبارك بن فضاله عن الحسن عن الاحنف

[৩] আলি রা. বলেন,→

যুদ্ধবিরতির চুক্তির ইতিবাচক ফল ও সন্ত্রাসীদের বিক্ষোভ

আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সালিসির উক্ত সিদ্ধান্ত সবার জন্য সান্ত্বনার বাণী হয়ে উঠল। ইরাক ও শামের বাহিনী নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেল। হজরত আলি তার খেলাফতের কেন্দ্র কুফায় এবং হজরত মুয়াবিয়া তার কেন্দ্র দামেশকে চলে গেলেন। মুসলিমবিশ্বের জীবনযাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

পক্ষান্তরে সন্ত্রাসীদের মধ্যে শুরু হলো বিক্ষোভ। দুঃখ ও বেদনায় তাদের অবস্থা বড় শোচনীয় হয়ে উঠল। খোদ শিয়াপন্থি ঐতিহাসিক আবু মিখনাফের বক্তব্য অনুযায়ী এই সন্ত্রাসীরা যখন হজরত আলি রা. এর বাহিনীর সঙ্গে সিফফিনের দিকে যাচ্ছিল, তখন এরা ছিল পরস্পর চিনি ও দুধের মতো ঘনিষ্ঠ এবং একে অন্যের সহযোগী। কিন্তু যখন মীমাংসার সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, তখন এরা নিজেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠল এবং গালমন্দ করতে লাগল।[৪]

এটা তো স্পষ্ট যে, হজরত আলির চারপাশে জড়ো-হওয়া এই দাঙ্গাবাজ লোকগুলো কোনো সাহাবি বা তাবেয়ি ছিল না। বরং এরা ছিল সেসব সন্ত্রাসী, যারা বিভিন্ন ঘৃণ্য স্বার্থে জড়িয়ে ইসলামি খেলাফতকে দুর্বল এবং মুসলমানদেরকে বিক্ষিপ্ত করতে চাচ্ছিল। যখন তাদের স্বার্থ হাসিল হলো না, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা হতাশ হয়ে পড়ল এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলো।

এই দাঙ্গাবাজদের চিন্তায় প্রভাবিত লোকেরা আজও হজরত আলি রা. এর উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি অসন্তুষ্ট। তারা মনে করে এ সিদ্ধান্ত ছিল প্রজ্ঞার পরিপন্থি। আবার কেউ কেউ একে হজরত আলি রা. এর অজ্ঞতা ও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রতারণার ফল বলে আখ্যায়িত করে। অথচ হজরত আলি ও মুয়াবিয়া রা. এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবি সালিসি ব্যবস্থায় একমত হয়ে মূলত নিম্নোক্ত আয়াতের উপর আমল করেছিলেন-

---

ان تحكما بما فى كتاب الله فتحييا ما احيا القرآن وتميتا ما امات القرآن. (مصنف ابن ابى شيبة، ح : ٣٧٨٥٧. ط الرشد)

৪

خرجوا مع على الى صفين وهم متوادون احياء، فرجعوامتباغضين اعداء، مابرحوا من عسكرهم بصفين حتى فشا فيهم التحكيم ولقد اقبلوا يتدافعون الطريق كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط. (تاريخ الطبرى : ٦٣/٥)

وَ اِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

আর যদি মুমিনদের দুটি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তা হলে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও।[৫]

এই চুক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল মুসলমানদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা। পবিত্র কুরআন তো যুদ্ধরত কাফেরদের সন্ধিপ্রস্তাবও গ্রহণ করার শিক্ষা দেয়। ইরশাদ হয়েছে,

وَ اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

আর যদি কাফেররা সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তা হলে আপনিও তার প্রতি আগ্রহী হোন।[৬]

কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, দাঙ্গাবাজদের এটাও ভালো লাগল না যে, হজরত আলি রা. কালিমা-বলা মুসলমান ভাইদের সাথে সন্ধি করে নেবেন।

বহিঃশক্তির ব্যর্থতার গ্লানি

জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনে মুসলমানদেরকে পরস্পরে মারামারি ও হানাহানিতে লিপ্ত দেখে তাগুতি শক্তিগুলো মুসলিমবিশ্বকে নতুন করে আঘাত করার পায়তারা করছিল। পারস্য ও ইরানের কয়েকটি বিজিত এলাকার অমুসলিমরা হজরত আলি রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করল। কোনো কোনো এলাকার মানুষ ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেল।

এসব বিদ্রোহ দমন করার জন্য হজরত আলি রা. তার এক সেনাপতি এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বৈমাত্রেয় ভাই জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানকে প্রেরণ করলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে বিদ্রোহের আগুন নেভাতে সক্ষম হন। ফলে সেসব এলাকায় আবার ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়।[৭] আর এভাবেই তাগুতি শক্তিগুলোর মনের বাসনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

---

[৫] সুরা হুজুরাত, আয়াত ৯

[৬] সুরা আনফাল, আয়াত ৬১

[৭] তারিখুত তাবারি : ৫/১৩৭

মীমাংসার ঘটনা : কতটা সঠিক, কতটা ভুল!!

সিফফিনের যুদ্ধের আট মাস পরে, ৩৭ হিজরির রমজানে হজরত আলি ও মুয়াবিয়ার মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য হজরত আবু মুসা আশআরি ও হজরত আমর ইবনুল আস রা. ইরাক ও শামের সীমান্তবর্তী এলাকা 'আজরুহ'-এর নিকটে দুমাতুল জান্দাল নামক স্থানে একত্র হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, উম্মাহর দুটি পক্ষের মধ্যে বিতর্কের সমাধান অন্বেষণ করা। যে বৈঠকে এ কথোপকথন হয়েছিল, তাকে বলা হয় 'মাজলিসে তাহকিম' তথা মীমাংসার বৈঠক। আর দুই সালিসকে বলা হয় 'হাকামাইন' তথা দুই বিচারক।[৮]

হজরত আলি রা. কেন মীমাংসার বৈঠকে উপস্থিত হলেন না?

হজরত মুয়াবিয়া রা. মীমংসার জন্য শাম থেকে ইরাকের সীমান্তে আগমন করেন। কিন্তু হজরত আলি রা. উপস্থিত হননি। কারণ, হজরত আলি রা. এর নতুন বিরোধীপক্ষ খারেজিরা ব্যাপকভাবে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। হজরত আলি যদি একদিনের জন্যও কুফায় অনুপস্থিত থাকতেন, তা হলে এই ফেতনাবাজ লোকগুলো ইসলামি খেলাফতের সিংহাসন উলটে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাত। নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে এই পরিস্থিতির আভাস পাওয়া যায়।

'৩৭ হিজরির রমজানের নতুন চাঁদ যখন উদিত হলো। তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. চারশত অশ্বারোহী নিয়ে দামেশক থেকে বের হয়ে দুমাতাল জান্দাল এসে পৌঁছেন। তারপর ইয়াজিব বিন হার আল আবসিকে কুফায় হজরত আলির কাছে পাঠিয়ে তার আগমনের সংবাদ প্রদান করেন এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে আসার জন্য আহ্বান জানান।

---

[৮] তারিখুত তাবারি : ৫/৬৭

ইয়াজিদ বিন হার হজরত আলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার আবেদন করে বলেন, আপনার উপস্থিতি এ বিতর্কের সমাধান, যুদ্ধের অবসান এবং ফেতনার আগুন নির্বাপিত করার কারণ হবে।

হজরত আলি রা. বললেন, ইবনে হার, আমি ওইসব লোকের কণ্ঠরোধ করে বসে আছি। যদি আমি তাদেরকে রেখে এখান থেকে বের হই, তা হলে এ শহরে শামবাসীর সঙ্গে সংঘটিত যুদ্ধের চেয়ে অনেক ভয়াবহ ফেতনা দেখা দেবে। সুতরাং আমি আমার স্থলে আবু মুসা আশআরিকে পাঠাচ্ছি। লোকেরা তাকে নির্বাচনের প্রতি সন্তুষ্ট আছে। সাথে আবদুল্লাহ বিন আব্বাসকেও পাঠাচ্ছি। সে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। এ দুজনের সম্মুখে যা হবে, তা যেন আমার সম্মুখেই হবে'।

তারপর হজরত আলি বসরা থেকে হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. কে ডেকে পাঠান। এমনিভাবে হজরত আবু মুসা আশআরি রা. কেও ডেকে আনেন। তারপর অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে তাদেরকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে কুফায় অবস্থান করেন।[৯]

হজরত আলি রা. এর পক্ষ থেকে এই বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য যে বাহিনী প্রেরণ করা হয়, তাতে চারশত অশ্বারোহী ছিল। তার নেতৃত্বে ছিলেন হজরত শুরাইহ বিন হানি রহ.। হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করেন।

এদিকে হজরত মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকেও চারশত সদস্য আসেন। এদের মধ্যে হজরত আমর ইবনুল আস এবং তার পুত্র আবদুল্লাহ রা. ছিলেন নেতৃত্ব দানকারী।

নিরপেক্ষ সাহাবিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর, হজরত মুগিরা বিন শুবা, হজরত আবদুর রহমান বিন আবদে ইয়াগুস, হজরত আবদুর রহমান বিন হারেস এবং হজরত আবু জাহাম বিন হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুম।[১০]

---

[৯] আনসাবুল আশরাফ : ২/৩৪৬,

عن المدايني، عن ابى الفضل التنوخى عن ميمون بن مهران، عن عمر بن عبد العزيز. ط دار الفكر

[১০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া হ্ : ১০/৫৭০, ৫৭১, তারিখুত তাবারি : ৫/৬৭-৭১

মীমাংসার বৈঠকে কী আলোচনা-পর্যালোচনা হলো?

উক্ত বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছিল, সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় খুবই সংক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া যায়। গ্রহণযোগ্য কোনো সূত্রে বিস্তারিত বিবরণ আমাদের কাছে পৌঁছেনি।

অন্যদিকে দুর্বল রাবিরা প্রকৃত ঘটনাকে মনগড়া কাহিনির ধুলোয় আবৃত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এবং হজরত আমর ইবনুল আস রা. যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেননি। অবশেষে এক ভীষণ গণ্ডগোলের মধ্য দিয়ে মজলিস শেষ হয়।

এমনিভাবে এসব দুর্বল রাবির আলোচনা থেকে মনে হয়, মীমাংসার ঘটনায় সালিসদ্বয় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হজরত উসমান রা. এর কিসাসের পরিবর্তে কেবল খেলাফত নিয়েই কথা বলেছেন। অথচ তা সঠিক নয়। সহিহ সনদে যদিও একথা প্রমাণিত আছে যে, খেলাফতের বিষয়টিও আলোচনায় এসেছিল এবং চলমান বিবাদ মীমাংসার জন্য তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব অর্পণ করার ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল; কিন্তু এর অর্থ তো এটা হতে পারে না যে, সালিসদ্বয় বৈঠক ও বিতর্কের মূল বিষয় নিয়ে কোনো কথাই বলবেন না।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, রাবিরা আলোচনার মূল কথাগুলোর অধিকাংশ লুকিয়ে রেখে তদস্থলে বিভিন্ন কল্পকাহিনি জুড়ে দিয়েছে।

মীমাংসার বৈঠকের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল উম্মাহকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করা। আর এটা নির্ভরশীল ছিল হজরত উসমান রা. এর কিসাস বাস্তবায়নের কোনো সর্বসম্মত শরয়ি রূপরেখা তৈরি করার উপর। সে কারণে মীমাংসার বৈঠকের মূল আলোচ্যবিষয় এটাই ছিল যে, যেকোনোভাবে হজরত আলি রা. এর হতে বাইয়াত হওয়া এবং হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো সর্বসম্মত উপায় বের করা।

এখন সহিহ কোনো বর্ণনায় যদিও উক্ত বৈঠকের বিবরণ বর্ণিত হয়নি, তবে আমরা ধারণা করতে পারি যে, হজরত উসমান রা. এর কিসাস গ্রহণের বিষয় নিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছিল। কারণ এই কিসাসের বিষয়টিই হজরত আলি রা. এর খেলাফতকে শামবাসীর দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য বানিয়ে দিয়েছিল। কেননা তারা হজরত আলির বিরুদ্ধে

হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের প্রশ্রয় দেওয়ার অপবাদ আরোপ করত। তাদের মতে হজরত আলি রা. এর জন্য আবশ্যক ছিল এই অপবাদ দূর করার লক্ষ্যে সকল বিদ্রোহীকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করা অথবা তাদেরকে শামবাসীর হাতে তুলে দেওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি এই দুটির কোনোটি না করবেন, ততক্ষণ তিনি তার সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের প্রশ্রয়দাতা হিসেবে গণ্য হবেন আর ততক্ষণ তাকে শরয়ি শাসক বলে মেনে নেওয়া যায় না।

অন্যদিকে হজরত আলি রা. এর সম্মুখে তাদের উক্ত দাবি মেনে নেওয়ার পথে আইনি ও ফিকহি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক যে বাধাগুলো ছিল, আমাদের ধারণা হজরত আবু মুসা আশআরি রা. উক্ত বৈঠকে অবশ্যই তা দলিল-প্রমাণ সহকারে উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের সালিস হজরত আমর ইবনুল আস রা.-ও তো কোনো সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। একদিকে হজরত আবু মুসা আশআরি রা. ছিলেন ইলম ও প্রজ্ঞার মূর্তপ্রতীক, অন্যদিকে হজরত আমর ইবনুল আস রা. ছিলেন অভিজ্ঞ রাষ্ট্রদূত ও অতুলনীয় যুক্তিবিদ। ফলে কেউ কাউকে কথায় হারাতে পারলেন না।

বৈঠকে একমত না হওয়ার পথে দ্বিতীয় সমস্যা এই ছিল যে, শামের বহু মানুষের বিশ্বাস ছিল হজরত আলি রা. ক্ষমতার স্বার্থে হজরত উসমান রা. কে হত্যা করিয়েছেন।[১১] এ কারণেই সিফফিনের ময়দানে শামবাসী পূর্ণ আবেগ-উদ্দীপনা সহকারে ইরাকিদের বিরুদ্ধে তরবারি চালনা করাকে বৈধ মনে করেছিল। আর এ বিশ্বাস সহকারে তাদের জন্য কোনোভাবেই হজরত আলি রা. এর হাতে বাইয়াতের ব্যাপারে একমত হওয়া সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর নেতৃত্ব ও আমির হওয়ার ব্যাপারে তাদের অন্তরে ছিল পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস।

---

[১১] ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন,

ان قوما شهدوا عليه بالزور عند اهل الشام انه شارك ف دم عثمان وكان هذا مما دعاهم الى ترك مبايعته.

অর্থাৎ কিছু লোক শামবাসীর সম্মুখে হজরত আলি রা. এর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, তিনি হজরত উসমান রা. এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। আর এ বিষয়টিই শামবাসীকে হজরত আলির বাইয়াত বর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। (মিনহাজুস সুন্নাহ : ৪/৪০৬)

মোটকথা, কিসাসের বিষয়টিই হজরত আলি রা. এর ব্যক্তিত্ব ও খেলাফতকে শামবাসীর দৃষ্টিতে বিতর্কিত; বরং অযোগ্য করে তুলেছিল। সালিসদ্বয়ও এ বিষয়ের কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

এহেন পরিস্থিতিতে সর্বসম্মত খেলাফত ফিরিয়ে আনার জন্য সালিসদ্বয় একটি ভিন্ন মেরুতে চিন্তা করতে শুরু করলেন। তা হলো, তৃতীয় এমন কোনো ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করা, যার সিদ্ধান্ত বিতর্কিত সকল বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হবে। আর তৎকালীন মুসলিমবিশ্বে হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. ছিলেন এমনই এক জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, যার ব্যাপারে গোটা উম্মাহ একমত হওয়ার আশা করা যাচ্ছিল। তাই হজরত আবু মুসা আশআরি রা. বললেন,

لا ارى لهذا الامر غير عبد الله بن عمر

> এ সমস্যা সমাধানের জন্য আবদুল্লাহ বিন উমর ছাড়া আমি কাউকে দেখি না।

হজরত আমর ইবনুল আস রা.-ও একথায় ভিন্নমত প্রকাশ করলেন না। তবে তার ইচ্ছা ছিল আবদুল্লাহ বিন উমর যদি এ দায়িত্ব লাভ করেন, তা হলে তিনি যেন খুশি হয়ে তা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর হাতে তুলে দেন। কিন্তু সমস্যা হলো, হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. এ দায়িত্ব গ্রহণের প্রতি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। বরং তিনি অপারগতা প্রকাশ করে বললেন,

ولا اعطى ولا اقبلها الا عن رضى من المسلمين

> এ দায়িত্ব আমাকে দেওয়াও যায় না, আর আমি গ্রহণ করতেও প্রস্তুত নই। তবে যদি গোটা উম্মাহ একমত ও সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তা হলে হতে পারে।[১২]

---

[১২] এ ঘটনাটি দুটি সহিহ সনদে এবং একটি হাসান সনদে বর্ণিত আছে।

- তন্মধ্যে প্রথম বর্ণনায় আছে, হজরত আমর ইবনুল আস রা. হজরত ইবনে উমর রা.কে লক্ষ করে বললেন, انا قد رأينا ان نبايعك 'আমাদের অভিমত, আমরা আপনার হাতে বাইয়াত হবো'।

একই বর্ণনায় আছে, হজরত আমর ইবনুল আস আরো

فهل لك على ان نعطيك مالا وتدعها لمن هو احرص عليها منك.

খেলাফত গ্রহণে হজরত ইবনে উমরের অপারগতার কারণ

এখন হয়তো কেউ ধারণা করবে যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. যদি তখন দায়িত্বটি গ্রহণ করতেন, তা হলে হয়তো উম্মাহ ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত হয়ে যেতেন। কিন্তু নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাবো, হজরত আবদুল্লাহ বিন উমরের চিন্তা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল।

- এটা তো সুপ্রমাণিত যে, উভয় পক্ষের মূল বিতর্ক ছিল কিসাস সম্পর্কে, খেলাফত সম্পর্কে নয়। হজরত মুয়াবিয়া রা. যদিও হজরত আলি রা. কে বর্তমান খলিফা বলে মেনে নেননি; কিন্তু তিনি (সহিহ বর্ণনা অনুযায়ী) হজরত আলিকে খেলাফতের উপযুক্ত অবশ্যই মনে করতেন। তিনি তো প্রকাশ্যে বলতেন, 'আলির সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই। তিনি আমার চেয়ে বড় আলেম এবং অধিক মর্যাদার অধিকারী'।[১৩]

  তিনি আরো বলতেন, 'আলি যদি হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদেরকে আমাদের হাতে তুলে দেন, তা হলে আমি তার সম্মুখে মাথা নত করে দেব'।

سنده : بلاذوری قال : حدثنی احمد بن ابراهیم الدورق، حدثنی ابو خیثمة، حدثنا وهب ابن جریر، حدثنا ابی (جریر بن حازم) قال : سمعت یعلی بن حکیم، یحدث عن نافع (انساب الاشراف : ٣٤٥/٢، ط دار الفکر بیروت)

- অপর সহিহ বর্ণনায় আছে, হজরত আমর ইবনু আস রা. হজরত ইবনে উমর রা.কে বললেন,

ماتجعل لی ان صرفتها الیك؟ (انساب الاشراف : ٣٤٥/٢)

এ উভয় বর্ণনার সকল রাবি নির্ভরযোগ্য।

- অন্যদিকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে,

قال ابو موسی : لا اری لهذا الامر غیر عبد الله بن عمر، فقال عمرو لابن عمر : انا نرید ان نبایعك.

অর্থাৎ হজরত আবু মুসা আশআরি রা. বললেন, আমি এই বিষয়ের জন্য আবদুল্লাহ বিন উমর ছাড়া কাউকে উপযুক্ত মনে করি না। তখন হজরত আমর ইবনুল আস রা. (ইবনে উমর রা. কে) বললেন, 'আমরা আপনার হাতে বাইয়াত হতে চাই'। (হিল্‌য়াতুল আউলিয়া : ১/২৯৩)

[১৩] তারিখে দিমাশক : ৫৯/১৩২; সিয়ারু আলামিন নুবালা' : ৩/১৪০; ইবনে হাজার এই সনদকে হাসান বলেছেন, (ফাতহুল বারী: ১৩/৮৬)

এহেন প্রেক্ষাপটে যদি হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা.কে খলিফা নিযুক্ত করা হতো, তা হলে তাতেও কোনো পার্থক্য হতো না। কেননা ফিকহি জটিলতার কারণে হজরত উসমান রা. এর কিসাসের ব্যাপারে হয়তো তিনিও হজরত আলির মতের ভিন্ন কোনো পথ অবলম্বন করতে পারতেন না। ফলে শামবাসীর ওই দাবি ও আপত্তি থেকেই যেত।

- হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর প্রস্তাবের ধরন থেকে হয়তো অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, শামের লোকেরা হজরত মুয়াবিয়া ছাড়া কাউকে খলিফারূপে দেখতে চায় না। এহেন প্রেক্ষাপটে নতুন কারো জন্যই সর্বসম্মত খলিফা হওয়ার কোনো উপায় ছিল না। বরং সেক্ষেত্রে আশঙ্কা ছিল, নতুন কারো নাম ঘোষণা করলে বিবদমান উভয় পক্ষের বহু মানুষ নতুন করে আপত্তি তুলবে। আর এর দ্বারা বিবাদ মীমাংসা হওয়ার পরিবর্তে আরো বেড়ে যাবে এবং উম্মাহ দুই দলের পরিবর্তে তিন বা চার দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে।
- হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. ব্যক্তিগতভাবেও রাজনৈতিক ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করতেন।
- হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. জানতেন, হজরত আলি রা. এর খেলাফতই সত্য ও সঠিক। তার বিরুদ্ধে যত সংশয়-সন্দেহ ও অভিযোগ ছড়ানো হয়েছে তা সব মিথ্যা ও ভুল। তিনিই খলিফায়ে রাশেদ এবং এই মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তার চেয়ে উত্তম কেউ নেই। এহেন পরিস্থিতিতে তার স্থানে নিজেকে বসানো কখনোই বরকত, রহমত কিংবা উম্মাহর ঐক্যের উপায় হতে পারে না।

সংলাপ ও সমঝোতার শেষপর্ব

মীমাংসা বৈঠকের আলোচনা একটি বন্ধমুখের গলিতে গিয়ে আটকে ছিল। বিষয়টি সালিসদ্বয়ের জন্যও ছিল বেশ পীড়াদায়ক। অন্যরাও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। কেননা প্রত্যেকেই ছিলেন উম্মাহর কল্যাণকামী। উম্মাহর সৎ ও সত্যবাদী এ দুটি দল কী করে আবার একতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এটাই ছিল সকলের মনের বাসনা। কিন্তু এই মুহূর্তে তারা

এ তিক্ত বাস্তবতা মেনে নিতে বাধ্য ছিল যে, উম্মাহর মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তবে এই পরিস্থিতিতেও উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক ছিল যে, এখন দুই দলের অবস্থান কী হবে?

যুদ্ধবিরতির কারণে উভয় পক্ষই লড়াই থেকে বিরত ছিল। কিন্তু যে একতার আশায় সবাই বুক বেধেছিল, এই মুহূর্তে তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। ফলে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, এখন থেকে উভয় পক্ষের পারস্পরিক আচার-আচরণ কেমন হবে?

এ বৈঠক শেষ করার পূর্বেই এ প্রশ্নের সমাধান দেওয়া ছিল সালিসদের দায়িত্ব। হজরত আবু মুসা আশআরি রা. যেহেতু ইলমি দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাই হজরত আমর ইবনুল আস রা. অবশেষে তাকেই প্রশ্ন করলেন,

ما ترى في هذا الامر؟

এ ব্যাপারে আপনার অভিমতটি এবার বলুন।

তিনি বললেন,

ارى انه من النفر الذين توفى رسول الله وهو عنهم راض

আমি মনে করি, হজরত আলি ওইসব মহান ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত, যাদের প্রতি আল্লাহর নবী মৃত্যু পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন (অর্থাৎ আল্লাহর নবী যেহেতু আজীবন তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সুতরাং আপনারাও যদি বিনাশর্তে তার হাতে বাইয়াত হওয়ার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন, তা হলে ভালো হতো)।

হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এর এ উত্তর কতটা শক্তিশালী, প্রমাণপুষ্ট ও চূড়ান্ত ছিল, তা যেকোনো বিজ্ঞ পাঠক বুঝতে পারবেন।

এরপর হজরত আমর ইবনুল আস রা. বিষয়টির অপর দিকটি স্পষ্ট করার জন্য প্রশ্ন করলেন,

فاين تجعلني انا ومعاوية؟

তা হলে আমাকে এবং মুয়াবিয়াকে আপনি কোথায় রাখলেন?

অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের অবস্থানে অটল থাকি, তা হলে আমাদের অবস্থান কী হবে? হজরত আলির সঙ্গেই-বা আমাদের সম্পর্ক কেমন হবে? আমাদেরকে কি বিদ্রোহী ও দাঙ্গাবাজ বলে গণ্য করবেন; নাকি একটি পৃথক শাসনব্যবস্থার মর্যাদা দেবেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এমনই এক ঐতিহাসিক বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, যা ছিল অত্যন্ত পরিমিত ও সুসমৃদ্ধ। তিনি বলেছিলেন,

ان يستعن بكما ففيكما معونة، وان يستغن عنكما فطال ما استغنى امر الله عنكما.[١٤]

---

[১৪] তারিখে দিমাশক : ৪৬; হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর জীবনী।

وذكر هذا الاسناد الامام البخارى واشار الى هذه الرواية. (التاريخ الكبير: ٣٩٨/٥)

এ বর্ণনাটি হজরত আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন হজরত আলি রা. এর রাষ্ট্রদূত হজরত হুসাইন বিন মুনযির রহ.। অন্যদিকে আল্লামা ইবনে আরাবি রহ. ইমাম দারাকুতনি থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। (দ্রষ্টব্য : আল আওয়াসিমু মিনাল কাওয়াসিমি, পৃষ্ঠা : ১৮০)

তবে আল্লামা ইবনে আরাবি স্পষ্ট করে বলেননি যে, তিনি ইমাম দারাকুতনির কোন কিতাব থেকে এ বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইবনে আরাবির ব্যাপারে আমরা এমন সন্দেহ করতে পারি না যে, তিনি কোনো বানোয়াট বর্ণনার উদ্ধৃতি পেশ করবেন। তাই আশা করা যায়, ইমাম দারাকুতনি বর্ণনাটি কোথাও অবশ্যই উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে এই আশাও আছে যে, ইমাম দারাকুতনি তার বিশেষ মর্যাদা ও বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কোনো শক্তিশালী সনদেই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।

যাই হোক, আমি আমার হস্তগত ইমাম দারাকুতনির কোনো কিতাবে এ বর্ণনাটি পাইনি। হতে পারে ইবনে আরাবি দারাকুতনির যে কিতাব থেকে বর্ণনাটি নিয়েছেন, সেটি এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে ভবিষ্যতে কখনো পাওয়াও যেতে পারে। তাহলে বর্ণনাটির শক্তিশালী উদ্ধৃতি অর্জিত হয়ে যাবে।

তা ছাড়া তারিখে দিমাশকেও বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সনদের দীর্ঘসূত্রতার কারণে মধ্যবর্তী কয়েকজন দুর্বল রাবির উপস্থিতি বর্ণনটিকে দুর্বল করে দিয়েছে। তবু বর্ণনা হিসেবে এটিকে ঐসব দুর্বল বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত, যাতে দেখানো হয়েছে যে, মীমাংসার উক্ত বৈঠক একটা তামাশারূপে শুরু হয়েছিল এবং একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তা শেষ হয়ে গেছে।

এই গ্রন্থে শুরু থেকেই আমাদের কর্মপন্থা এই যে, সনদের বিচারে একই পর্যায়ের বর্ণনার মধ্যে যেখানে সংঘর্ষ দেখা দেয়, সেখানে আমরা এমন বর্ণনাকে প্রাধান্য দিই, যা সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার জন্য অধিক উপযুক্ত হয়।

অর্থাৎ যদি হজরত আলি রা. তোমাদের কাছে সাহায্য চান, তবে তোমাদের মধ্যে সাহায্যের যোগ্যতা আছে। আর যদি তিনি তোমাদের থেকে বিমুখ হয়ে যান, তা হলে বহুকাল যাবৎ আল্লাহর রীতি তোমাদের থেকে বিমুখ হয়ে ছিল। অর্থাৎ তোমাদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তো আল্লাহ তায়ালার সকল কার্যক্রম চলেছে। সুতরাং এখনো যদি তোমরা না থাকো, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না।

শেষ ঘোষণা : মীমাংসা বৈঠকের পর উভয় দলের অবস্থা

হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এর উক্ত বাক্যটি যেন মীমাংসা বৈঠকের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ছিল। হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর নীরবতা এটিকে সমর্থন দান করেছিল। কথাটির সারসংক্ষেপ এই ছিল যে, চলমান বিতর্কের যতদিন সমাধান না হবে, ততদিন দুই দল দুটি ভিন্ন এলাকায় শাসন পরিচালনা করবে। সুতরাং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের কার্যক্রম চলবে।

এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের পর উভয় পক্ষ কোনো ধরনের হাঙ্গামা ছাড়া দুমাতাল জান্দাল থেকে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়।[১৫]

***

ডক্টর আকরাম জিয়া উমারি উক্ত মীমাংসা বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'মীমাংসা বৈঠক নিষ্ফল হওয়ার কারণ হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এর ব্যক্তিত্ব নয়; বরং এর কারণ ছিল বিতর্কের সমাধানের জটিলতা এবং উভয়পক্ষের নিজ নিজ অবস্থানের উপর অবিচলতা'।[১৬]

---

[১৫] খলিফা বিন খাইয়াত মীমাংসা-বৈঠকের আলোচনা উল্লেখ করে এভাবেই কোনো ফল না হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন,

فلم يتفق الحكمان على شيئ وافترق الناس....

সালিসদ্বয় কোনো বিষয়ে একমত হতে পারলেন না। তারপর মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। (তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯২)

[১৬] عصر خلافة الراشدة لدكتور اكرم ضياء العمرى، ص ٤٧٦

ভ্রান্ত বর্ণনাগুলো কীভাবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল?

ষড়যন্ত্রকারী চক্র কখনোই আশা করেনি যে, উভয় পক্ষের মতবিরোধ বহাল থাকা সত্ত্বেও মীমাংসা বৈঠক থেকে এ ধরনের কোনো ঘোষণা আসবে। কিন্তু যখন এসেই পড়ল, তখন রাগ ও ক্ষোভে তাদের করুণ দশা হলো। তবে সমস্ত রাগ ও ক্ষোভ তারা ঝাড়তে লাগল হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এবং হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে।

এ চক্রের লোকেরা উক্ত ঘোষণার বিপরীতে যত কথা প্রচার করেছে, তার সারসংক্ষেপ এই ছিল যে, হজরত আলি রা. এর প্রতিনিধি হজরত আবু মুসা আশআরি রা. একজন সরল মানুষ। পক্ষান্তরে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রতিনিধি হজরত আমর ইবনুল আস রা. একজন মিথ্যুক ও প্রতারক। হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর কথার কারণেই হজরত আবু মুসা আশআরি রা. ভরা মজলিসে হজরত আলি ও হজরত মুয়াবিয়া রা. কে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দেন। তারপর হজরত আমর ইবনুল আস রা. ধোঁকা দিয়ে সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এ ঘোষণা দিতে শুরু করেন যে, হজরত আলি রা. কে তার প্রতিনিধিরাই তো সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি হজরত মুয়াবিয়াকে আপন অবস্থায় বহাল রেখেছি।

এই প্রতারণার পরই সেখানে উপস্থিত সাহাবি ও তাবেয়িদের মধ্যে পারস্পরিক ধিক্কার ও অভিশাপ এবং গালমন্দ শুরু হয়। এমনকি একপর্যায়ে হানাহানি শুরু হয় এবং উভয়পক্ষের অন্তর ঘৃণা ও শত্রুতায় ভরে ওঠে।[১৭]

---

[১৭] তারিখুত তাবারি : ৫/৭০, ৭১; এসব বর্ণনা বর্জন করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এর অধিকাংশ সনদের শেষ মিলেছে আবু মিখনাফে গিয়ে, যার কট্টর রাফেজি হওয়ার কথা সকলেরই জানা। তবে তাবারিতে কিছু বর্ণনা ইবনে শিহাব যুহরির সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আর ইবনে শিহাব যুহরি নিঃসন্দেহে হাদিসশাস্ত্রের ইমাম। কিন্তু ইমাম যুহরি স্বয়ং এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেননি। কাজেই তার বর্ণনা মুরসাল। আর উসুলের ইমামগণ একমত যে, এজাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুরসাল বর্ণনা যথেষ্ট নয়। (ইয়াহয়া ইবনে মাঈন থেকে বর্ণিত আছে, ইমাম যুহরির মুরসাল কোনো সমস্যা নয়। - আল মারাসীল লিবনি আবী হাতিম, পৃষ্ঠা : ৩)

বিশিষ্ট সাহাবিগণ ঘটনার তদন্ত করেছেন!

মীমাংসা বৈঠক সম্পর্কে ষড়যন্ত্রকারী চক্রের এই প্রোপাগান্ডা সাহাবি ও তাবেয়িদের কানেও পৌঁছল। তাই তারা বিষয়টি যাচাই করলেন। দেখা গেল মীমাংসা বৈঠকে এমন কিছুই ঘটেনি।

একারণেই হজরত আলি রা. এর একান্ত সঙ্গী হজরত হুসাইন ইবনে মুনযির রহ. বলেছেন, 'আমি হজরত আমর ইবনুল আসের কাছে গিয়ে বললাম, আপনাকে এবং হজরত আবু মুসা আশআরি রা. কে যে মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাকে বলুন। আপনারা সে ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দিলেন?

হজরত আমর ইবনুল আস রা. বললেন, 'এ ব্যাপারে মানুষ যা বলার তা তো বলেছে। কিন্তু আল্লাহর কসম, মানুষ যেমন বলছে, তেমন কোনো কথাই হয়নি'।[১৮]

---

[১৮] এ কথা বলে হজরত আমর ইবনুল আস রা. তার ও হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এর মধ্যকার সেই কথোপকথন উল্লেখ করেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। (তারিখে দিমাশক : ৪৬/১৭৫, হজরত আমর ইবনুল আস রা.র জীবনী, আত তারিখুল কাবির, ইমাম বুখারি : ৫/৩৯৮)

নোট : এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, মীমাংসা-বৈঠকে গণ্ডগোল হওয়ার তথ্যসংবলিত যেসব বর্ণনা তুলনামূলক কম দুর্বল এবং যা সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে অশোভন কথা মিশ্রিত, সেগুলো মোট তিনটি। যথা :

- معمر عن الزهری : حتى اختلفا واستبا (مصنف عبد الرزاق، ح : ٩٧٧٠)

  তবে এটি ইমাম যুহরি থেকে মুরসালসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর স্পর্শকাতর বিষয়ে যুহরির মুরসাল দলিলযোগ্য নয়। এমনটিই বর্ণিত আছে হজরত ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান থেকে।

  كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى ارسال الزهری وقتادة شيئا ويقول : هو بمنزلة الريح. (الجرح والتعديل : ٢٤٦/١)

- زهری عن عبد الله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم

  এই সনদে একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে। তাতে বলা হয়েছে-

  وكان ذلك مكيدة من عمرو بن العاص. (تاريخ دمشق : ١١٧/٥٩)

  কিন্তু এর সনদে আবু বকর বিন আবি সুবরা আছে, যার সম্পর্কে হাদিস বানানোর অভিযোগ আছে (তাহযিবুত তাহযিব : ১২/২৭-২৮)। তা ছাড়া এতে ওয়াকিদিও আছে, আর উনি তো মাতরুক।

- عن عمرو بن الحكم : لما التقى الناس بدومة الجندل. (تاريخ دمشق : ١٧٢/٤٦)

এ ঘটনা থেকে জানা গেল, উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মিথ্যা প্রোপাগান্ডার খণ্ডন করেছিলেন। সেই সাথে তাদের কারো থেকেই মীমাংসার বিষয় সম্পর্কে এমন কোনো কথা বর্ণিত হয়নি, যা উপরোক্ত বর্ণনার মতো সন্দেহজনক কথার সমর্থন করে।

দুই সালিস ও আইন প্রয়োগের ক্ষমতাসম্পন্ন আদালত বা ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকের মধ্যে কী পার্থক্য

এখানে স্মরণ রাখতে হবে, যেকোনো বিবাদ বা বিতর্ক সমাধানের জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক পন্থা হলো, বিবদমান বা বিতর্কিত বিষয়কে কোনো নিরপেক্ষ ও আইনপ্রয়োগের ক্ষমতাসম্পন্ন আদালতের হাতে কিংবা ক্ষমতাশীল শাসকের হাতে ন্যস্ত করতে হবে। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর মুসলিমবিশ্বে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সর্বোচ্চ আদালত কেবল খলিফারই ছিল। আইনি ও রাজনৈতিকভাবে এর চেয়ে উপরের কোনো স্তর ছিল না। কিন্তু এখন যেহেতু স্বয়ং খলিফায়ে রাশেদকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার তার চেয়ে উচ্চস্তরের এমন কোনো দরবার বা আইনপ্রয়োগের ক্ষমতাও ছিল না, যেখানে বিচার দাবি করা যায়; তাই বিতর্কের স্থায়ী কোনো সমাধান পেশ করারও কোনো সুযোগ ছিল না।

আর যুক্তি, প্রমাণ ও সামাজিক নিয়মে এটা প্রমাণিত আছে যে, এমন নিরুপায় অবস্থায় যুদ্ধরত দুই দলের পক্ষ থেকে সন্ধির জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধিরা একসাথে বসে বিবাদ ও বিতর্কের গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে প্রতিনিধিদের একান্ত দায়িত্ব থাকে, নিজেদের অবস্থান বোঝা, প্রতিপক্ষের অবস্থান বোঝা এবং তারপর মীমাংসার কোনো উপায় বের করা।

প্রথমত এ বর্ণনা মুরসাল। তদুপরি এর সনদেও আছে আবু বকর বিন আবি সুবরার মতো কাজ্জাব রাবি। সেই সাথে মাতরুক রাবি ওয়াকিদি এবং ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবি ফারদাও আছে।

মোটকথা, মীমাংসার ঘটনা সম্পর্কে গণ্ডগোলের তথ্যসংবলিত বর্ণনাসমূহের মধ্যে তুলনামূলক উত্তম বর্ণনাগুলোও যখন এভাবে দুর্বল বলে প্রমাণিত হলো, তখন অন্যগুলোর কী অবস্থা হতে পারে? আর এরপরে নসর বিন মুজাহিম রাফেজির ঐসব বর্ণনার তো কোনো অবস্থানই নেই, যা 'ওয়াকআতু সিফফিন' নামক পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লিখিত ঘটনায়ও এমনই হয়েছিল। তাই নিরুপায় হয়ে সালিস নির্বাচনের পথই বেছে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সালিস বা বিচারকের ক্ষমতা কেবল এতটুকুই থাকে যে, তারা সন্ধির জন্য কোনো পথ সৃষ্টি করার অধিকার রাখেন। সেক্ষেত্রে তাদের কোনো সমাধানের ব্যাপারে একমত হতে না পারারও আশংকা থাকে। আর তাকদিরের সিদ্ধান্ত এমনই ছিল বিধায় এখানে এটাই ঘটেছিল।

সুতরাং উক্ত দুই সালিসকে আইনপ্রয়োগের ক্ষমতাসম্পন্ন আদালতের সাথে তুলনা করে কারো এমন প্রশ্ন করার অবকাশ নেই যে, দুজন বিজ্ঞ সালিস একত্রে বসার পরও কেন সমস্যার সমাধান হলো না।

শামে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা

মীমাংসা বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার মধ্য দিয়ে শাম ও ইরাকের এক পতাকাতলে সমবেত হওয়ার সম্ভাবনা বাহ্যত শেষ হয়ে গেল। তাই দুই মাস পরে ৩৭ হিজরির জিলকদে হজরত মুয়াবিয়া রা. রীতিমতো একজন শাসক হিসেবে শামবাসীদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার শাসনব্যবস্থার ঘোষণা দেন।[১৯]

---

[১৯] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯২; তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি : ৩/৫৫২

সীমান্তবর্তী ঝটিকা আক্রমণ

জঙ্গে সিফফিনের পর মুসলিমবিশ্বের সিংহভাগ ভূখণ্ড খেলাফতে রাশেদার নিয়ন্ত্রণেই ছিল। হিজাজ, ইয়েমেন, ইরাক, পারস্য, খোরাসান থেকে বেলুচিস্তান পর্যন্ত দীর্ঘ বিস্তীর্ণ এলাকা- এ সবই ছিল খলিফাতুল মুসলিমিনের ক্ষমতাধীন। এমনিভাবে শামের পশ্চিম দিকে মিসর ও মিসরের অধীনস্থ গোটা আফ্রিকাও ছিল খেলাফতে রাশেদার অংশ। অন্যদিকে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ক্ষমতা ছিল কেবল একটি ভূখণ্ড তথা শাম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

৩৭ হিজরির সফর মাসে সংঘটিত সিফফিনের যুদ্ধের পর যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তা ৩৭ হিজরির রমজানে অনুষ্ঠিত মীমাংসা বৈঠক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। উক্ত বৈঠকে দুই পক্ষের মধ্যে কোনো চুক্তি হয়নি। দুই পক্ষের কথোপকথন থেকে উভয়ের মনোভাব এবং সন্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া গেছে। হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এর শেষকথাটি স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, শামিদের সাথে গাম্ভীর্যপূর্ণ সন্ধির পথ তারা উন্মুক্ত রাখবেন।

কিন্তু এর কিছুদিন পরই, ৩৭ হিজরির জিলকদ মাসে হজরত মুয়াবিয়া রা. শামের ভূমিতে তার শাসন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন। এরপর দীর্ঘ ন' মাস পর্যন্ত উভয় পক্ষের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজ করে এক শান্তিপূর্ণ নীরবতা। উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো ঝটিকা আক্রমণ বা নতুন করে সন্ধির আলোচনা কিছুই হয়নি। কিন্তু ইতিহাস সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে, তারা জানেন, যখন দুটি পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হয়, তখন হঠাৎ করেই সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ ফিরে আসে না। হঠাৎ করেই দুপক্ষের সম্পর্ক একটি ইতিবাচক স্তরে উপনীত হয় না। বরং কিছুদিন পর্যন্ত চলতে থাকে ঝটিকা আক্রমণ এবং নিজ নিজ শক্তি ও ক্ষমতার প্রদর্শন। এভাবে দুই পক্ষের নতুন সম্পর্কের অবস্থা বুঝে যেকোনো একটি কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়।

ইসলামের ইতিহাসে যেহেতু এমন ঘটনা এ-ই প্রথম ঘটেছিল, তাই বিবদমান দুই পক্ষের জন্য একটি সন্ধিচুক্তির পর্যায়ে আসতে বেশ সময় লেগে গেল। তা ছাড়া সিফফিনের যুদ্ধে ইরাকিদের হাতে যেসব গোত্রের শামি সৈন্য নিহত হয়েছিল, তাদের ক্ষোভ ও আক্রোশও অবশ্যই এত দ্রুত ঠান্ডা হয়নি। সে কারণে শামের সাধারণ জনমত ইরাকি শাসনের বিরুদ্ধে থাকাই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। শামের মানুষ নিজেদেরকে মনে করত ইরাকিদের হাতে নির্যাতিত।[২০]

অন্যদিকে হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত আলি রা. কে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী মনে করা সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত তিনি আপন অবস্থানে

---

[২০] সিফফিনের ময়দানে যে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল, তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সাধারণ মানুষই নয়, উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনেও গভীর রেখাপাত করেছিল। পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত এর কষ্ট তাদের কথায় ও আচরণে প্রকাশ পেয়েছিল। ফলে তারা হজরত আলি রা. কে গালমন্দ না করলেও তার জন্য ভালোবাসা পোষণ করতেন না। নিম্নে এ সম্পর্কে দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। যথা :

হুরাইয বিন উসমান (৮০ - ১৬৩ হিজরি)

তিনি ছিলেন নিজ যুগে হিমসের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস। তার সম্পর্কে নাসেবি হওয়ার অভিযোগও আছে। জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি হজরত আলিকে গালমন্দ করেন?

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনোই তার সম্পর্কে কোনো বাজে কথা বলিনি।

কিন্তু তিনি পরিষ্কার বলতেন, 'আমি তাকে মহব্বত করি না। কারণ সিফফিনের যুদ্ধে তিনি আমাদের গোত্রের একটি বড় দলকে হত্যা করেছেন।

(قال: لا احبه. لانه قتل من قومى يوم صفين جماعة سير اعلام النبلاء: ٨٠،٨١/٧)

সাওর বিন ইয়াজিদ

তিনি ছিলেন শামের মুহাদ্দিস। হজরত আলির সমালোচনা থেকে তিনি খুব সতর্ক থাকতেন। কোনো মজলিসে এজাতীয় কোনো আলোচনা উঠলে তিনি উঠে এক কোণে চলে যেতেন। এ কারণে তার সমকালীন লোকদের থেকে তাকে অনেক কথা শুনতে হতো। (তারিখে ইবনে মাঈন: 8/8২৩)

কিন্তু এই সাওরের দাদা নিহত হয়েছিলেন সিফফিনের যুদ্ধে। আর এ কষ্টের কারণে তিনি এতটুকু অবশ্যই বলতেন, 'আমার দাদাকে যে হত্যা করেছে, তাকে আমি পছন্দ করি না।'

(وكان جد ثوربن يزيد قد شهد صفين مع معاوية وقتل يومئذ. فكان ثور اذا ذكر عليا قال: لا احب رجلا قتل جدى. -طبقات ابن سعد: ٤٦٧/٧، صادر)

অবিচল ছিলেন। এদিকে দুই পক্ষের মধ্যে কোনো চুক্তিও হয়নি। তাই প্রত্যেকেই অপর পক্ষকে মনে করছিল বিদ্রোহী।

একারণে হজরত মুয়াবিয়া রা. মনে করতেন, হজরত আলির অধীনস্থ এলাকাগুলো তার জন্য দখলের চেষ্টা করা জরুরি। তাই তিনি হজরত আলির অধীনস্থ এলাকার উপর আক্রমণ করতে শুরু করেন। প্রায় দুই বছর পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। এ দিনগুলোতেই হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বাহিনী মিসর দখল করে। যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে। নিম্নে এ সময়কার ঘটনাবলির একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র তুলে ধরা হলো।

১. ৩৮ হিজরির শাবানে হজরত আলি রা. কুফা ও বসরার সকল সৈন্য নিয়ে খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে যান।[২১] বসরার গভর্নর হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসও হজরত আলির সঙ্গে যান। ফলে বসরা হয়ে পড়ে একেবারে সেনাশূন্য।

   এ সুবর্ণ সুযোগটি কাজে লাগানোর জন্য বসরায় অবস্থানরত উসমানি আন্দোলনের সদস্যরা হজরত মুয়াবিয়াকে বসরা দখলের আহ্বান জানায়। হজরত মুয়াবিয়া সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে আবদুল্লাহ বিন আমর আল হাজরামির নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠিয়ে দেন। এ বাহিনী যখন বসরায় আক্রমণ চালায়, বসরার ভারপ্রাপ্ত গভর্নর জিয়াদ শহর ছেড়ে পালিয়ে জীবন রক্ষা করে। হজরত আলি রা. তখন খারেজিদের বিরুদ্ধে জিহাদে ব্যস্ত। জিয়াদ গিয়ে তাকে বিস্তারিত অবস্থা অবগত করে।

   সংবাদ পাওয়া মাত্র হজরত আলি রা. তার এক নামকরা সেনাপতি জারিয়া বিন কুদামাকে বসরা রক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেন। শামের আক্রমণকারী বাহিনী 'দারে সানবিল' নামে একটি ভবনে আশ্রয় নিয়েছিল। জারিয়া বিন কুদামা সেখানেই তাদেরকে অবরোধ করেন। তারপর তিনি তাদেরকে অস্ত্র সমর্পণের আবেদন করেন। কিন্তু তারা

---

[২১] খারেজিদের বিরুদ্ধে অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ সামনে একটি পৃথক অধ্যায়ে আসবে।

তাতে সম্মত হয় না। ফলে ওই ভবনের উপর আগুনের গোলা বর্ষণ করা হয়। এতে সকল আক্রমণকারীর করুণ মৃত্যু ঘটে।[২২]

২. পরের বছর ৩৯ হিজরিতে হজরত মুয়াবিয়া রা. আবার দু'হাজার সৈন্য পাঠিয়ে ইরাকের সীমান্তবর্তী শহর 'আইনুত তামার' দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা সংখ্যায় কম হলেও অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে তাদের মোকাবেলা করে। ফলে শামি বাহিনী পরাজিত হয়ে ফিরে যায়।[২৩]

৩. এ বছরই আনবার ও মাদায়েন-এর উপর আক্রমণের জন্য হজরত মুয়াবিয়া রা. ছ' হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এরা এসে হামলা ও লুটতরাজ চালিয়ে ফিরে যায়। হজরত আলির আদেশে সাঈদ বিন কায়েস তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিন্তু ততক্ষণে আক্রমণকারীরা বহুদূর চলে গেছে।[২৪]

৪. এ বছরই আবদুল্লাহ বিন মাসআদা ফাজারিকে ১৭০০ সৈন্য দিয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. জাযিরাতুল আরবে পাঠান, যাতে সে প্রথমে তিমা এবং তারপর মক্কা-মদিনার লোকদেরকে অনুগত করে।

এদের মোকাবেলায় হজরত আলি রা. মুসাইয়াব ইবনে নাজবা ফাজারিকে পাঠান জাযিরাতুল আরব রক্ষা করার জন্য। তিনি তিমায় শামি বাহিনীর গতিরোধ করেন। দুই দলের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়। একপর্যায়ে শামি বাহিনী পিছু হটে একটি দুর্গে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তারপর বাঁচার কোনো পথ দেখতে না পেয়ে দয়ার আবেদন করে। হজরত মুসাইয়াব ইবনে নাজবা রহ. সদয় হয়ে তাদেরকে শামে ফিরে যেতে দেন।[২৫]

---

[২২] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯৬, ১৯৭, তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি: ৩/৫৮৭; হিজরি : ৩৮, তারিখুত তাবারি : ৫/১১০

ويؤيده رواية صحيحة عن عبد الرحمن ابن ابى بكرة عن ابى بكرة رضى الله، فيه ....فلما كان يوم حرق ابن الحضرمى، حرقه جارية بن قدامة، قال: اشرفوا على ابى بكرة. (صحيح البخارى، ح: ٧٨٧٠، كتاب الفتن، باب قوله لا ترجعوا بعدى كفارًا....)

[২৩] তারিখুত তাবারি : ৫/১৩৩

[২৪] তারিখুত তাবারি : ৫/১৩৪

[২৫] তারিখুত তাবারি : ৫/১৩৫

৫. এ বছরই হজরত মুয়াবিয়া রা. যাহ্হাক বিন কায়েসকে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে ইরাকের সীমান্তবর্তী এলাকা- 'ওয়াকিসা' ও 'সা'লাবিয়া'তে আক্রমণ করার আদেশ দেন। কিন্তু হজরত আলি রা. এর পক্ষ থেকে হুজর বিন আদি রা. চার হাজার সৈন্য নিয়ে সীমান্ত প্রতিরক্ষার জন্য সেখানে পৌঁছে যান এবং 'তাদমুর' নামক স্থানের কাছে গিয়ে আক্রমণকারীদের পিছু হটিয়ে দেন।[২৬]

৬. ৩৬-৩৮ হিজরি পর্যন্ত, উভয় পক্ষই হজের সময় মক্কা ও মদিনার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। যে পক্ষের অগ্রবর্তী দল আগে পৌঁছে যেত, তারাই সে বছর হজের আমির নিযুক্ত করত। এই টানাটানি ও হুড়োহুড়ির কারণে মানুষের বেশ কষ্ট হতো। তাই হজরত উম্মে সালামা রা. এবং হজরত উম্মে হাবিবা রা. নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন যে, 'আমরা হজরত আলি ও মুয়াবিয়াকে পত্র লিখে বলে দিই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মাহ কোনো একটি মতের উপর ঐকমত্য না হয়, ততক্ষণ এইসব বাহিনী পাঠানো বন্ধ রাখুন। কেননা এরা মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে।'

এ পরামর্শের ভিত্তিতে হজরত উম্মে হাবিবা আপন ভাই হজরত মুয়াবিয়াকে এবং উম্মে সালামা রা. হজরত আলি রা. কে বুঝানোর দায়িত্ব নেন। কুরাইশ ও আনসারের কয়েকজন নির্বাচিত ব্যক্তির মাধ্যমে উক্ত চিঠি পাঠানো হয়।

এই উদ্যোগের ফলে হজরত মুয়াবিয়া রা. হজ পরিচালনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। হজরত আলি রা.-ও প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু হজরত হাসান রা. তাকে বাধা দিয়ে বলেন, হজের পরিচালনা ছেড়ে দেওয়াটা কল্যাণকর হবে না।[২৭] সম্ভবত এর কারণ এই ছিল যে, হজের আমির নিযুক্ত করা শুরু থেকেই খলিফার একটি অধিকার হিসেবে চলে এসেছে। এখন এটি ছেড়ে দেওয়া খেলাফতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির অর্থে ধরা যেতে পারে এবং এর কারণে খেলাফতের পদ প্রভাবিত হতে পারে।

---

[২৬] তারিখুত তাবারি : ৫/১৩৬

[২৭] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস : ৯৭৭০, যুহরী থেকে মুরসাল সনদে বর্ণিত, যুহরী পর্যন্ত সকল রাবী সিকাহ।

৭. ৩৯ হিজরিতে হজরত মুয়াবিয়া রা. ইয়াজিদ বিন শাজারাকে হজ পরিচালনার জন্য হেজাজে পাঠান। কিন্তু সেখানে হজরত আলি রা. এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমির হজরত কুসাম বিন আব্বাস রা. তাকে বাধা প্রদান করেন। অবশেষে হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. এর চেষ্টা ও মধ্যস্থতায় বিষয়টি আপস-রফা করা হয় এবং হজের দায়িত্ব হজরত শাবিহ বিন উসমান রা. কে প্রদান করা হয়।[২৮]

৮. ৪০ হিজরিতে হজরত মুয়াবিয়া রা. তার সেনাপতি বুসর বিন আরতাতকে এক বিরাট বাহিনী দিয়ে ইয়েমেন ও হেজাজের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন। এই বাহিনী হিজাজবাসীকে বশীভূত করে ইয়েমেন পর্যন্ত আক্রমণ করে এগিয়ে যায়। হজরত আলি রা. কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নর উবাইদুল্লাহ বিন আব্বাসকে পরাজিত করে ইয়েমেন দখল করে নেয়। কিন্তু এর কিছুদিন পরই হজরত আলির প্রসিদ্ধ সেনাপতি জারিয়া বিন কুদামা নতুন উদ্যোমে এক বাহিনী নিয়ে আসেন। শামি বাহিনী তাদের মোকাবেলায় দাঁড়াতে সক্ষম হয় না। ফলে তারা ইয়েমেন ও হিজাজ থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারপর থেকে উবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস হজরত আলির শাহাদাত পর্যন্ত ইয়েমেনের নিয়মতন্ত্রিক গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২৯]

---

[২৮] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯৮

[২৯] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯৮; আত তারিখুল আওসাত লিল বুখারি : ১/৮৬, ১১৫,

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা এ ঘটনার এতটুকুই প্রমাণিত। ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে এসব ঘটনার অনেক বিস্তারিত বিবরণ আছে। তবে সেগুলোর অধিকাংশ রাবি যয়িফ হওয়ার কারণে আমরা তা উল্লেখ করিনি। এই রাবিদের মধ্যে আবু মিখনাফ অন্যতম। সুতরাং এদের বর্ণনার অধিকাংশ তথ্য অতিরঞ্জিত বা বানোয়াট হওয়ার আশংকাই বেশি।

মিসরের ইতিকথা

সিফফিনের যুদ্ধের পর হজরত মুয়াবিয়া রা. বিভিন্নভাবে তার স্বাধীন শাসনব্যবস্থা সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন। এই উদ্যোগের পক্ষে তার দলিল এই যে, তার মতে ইরাকের শাসনব্যবস্থা ছিল বেআইনি। তাই তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইও ছিল শরিয়তসম্মত। কিন্তু কোথাও তিনি সফলতা লাভ করেননি। দেড় বছর পর ৩৮ হিজরিতে তিনি প্রথম মিসর দখলের মাধ্যমে তার শাসন-ক্ষমতা সম্প্রসারিত করার সুযোগ পান।[৩০]

মিসরে হজরত আলি রা. এর খেলাফত খুব একটা মজবুত ছিল না। কেননা ভৌগোলিকভাবে মিসর ছিল শাম ও ফিলিস্তিন-সংলগ্ন। তাই সেখানে শামিদের মোকাবেলায় নিজেদের সৈন্য বাহিনীকে সুসংহত রাখা কষ্টকর ছিল। তা ছাড়া সেখানে উসমানি আন্দোলনের লোকও ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়, যারা হজরত আলির হাতে বাইয়াত হতে প্রস্তুত ছিল না।

এ অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে তিন বছরের মধ্যে হজরত আলি রা. তিন জন শাসক একের পর এক নিযুক্ত করেছিলেন। যথা :

১. মুহাম্মদ বিন আবু হুযাইফা।

২. কায়েস বিন সা'দ।

৩. আশতার নাখায়ি।

অন্যদিকে হজরত মুয়াবিয়া রা. মিসর দখল করা এজন্য জরুরি মনে করছিলেন যে, হজরত উসমান রা. এর শেষদিনগুলোতে মিসরই ছিল

---

[৩০] তৎকালীন যুগের ঐতিহাসিক-বর্ণনাসমূহের মধ্যে যেখানে মিসরের আলোচনা আছে, সেখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল সেই শহর, যা প্রাচীন মিসরের ফেরাউনি শাসন-ক্ষমতার রাজধানী 'ব্যবিলনে'র সামনের দিকে হজরত উমর রা. এর শাসনামলে আবাদ করা হয়েছিল। সেই শহরের নাম ছিল ফুসতাত। পরে এ ফুসতাতই মিসরের রাজধানী হিসেবে নির্ধারিত হয়। কয়েক শতাব্দী পরে যখন কায়রো আবাদ হয়, তখন এই ফুসতাত পরিণত হয় কায়রোর একটি মহল্লা। ফুসতাতে হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর তত্ত্বাবধানে নির্মিত মসজিদ আজও আপন অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ত্রাসী ও দাঙ্গাবাজদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরাট একটা অংশ মিসর থেকেই মদিনায় গিয়েছিল। তখন হজরত উসমান রা. এর পক্ষ থেকে মিসরের গভর্নর ছিলেন আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রা.। হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতা প্রতিহত করার জন্য তিনি ৩৫ হিজরির শেষদিকে উকবা বিন মালেককে নিজ স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে মিসর থেকে বেরিয়ে যান। তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী আন্দোলনের নেতা মুহাম্মদ বিন আবু হুযাইফা রাজধানী ফুসতাত দখল করে উকবা বিন মালেককে বিতাড়িত করে। ইবনে আবি সারাহ রা. তখন ফিলিস্তিন পৌঁছেছিলেন। এমন সময় তার অবর্তমানে বিদ্রোহের সংবাদ পান। সংবাদ পেয়ে তিনি মিসর প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাকে মিসরের সীমান্তে আটকে দেয়। তারপর তিনি আসকালান চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের খবর জানতে পারেন। তিনি সেখানেই এক নির্জন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। কিছুদিন পর সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন।[৩১]

মিসরে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রথম আক্রমণ ও মুহাম্মদ বিন আবু হুযাইফার হত্যা

ইতিমধ্যে মদিনায় হজরত আলি রা. খলিফা মনোনীত হয়েছেন। তিনি যেভাবে অন্যান্য বিদ্রোহীর থেকে বাইয়াত গ্রহণ করে তাদেরকে

---

[৩১] তারিখে ইবনে ইউনুস আল মিসরি (মৃত্যু : ৩৪৭ হিজরি) ১/ ২৭০, ৪৪১,

ونقل اسم نائب ابن ابى سرح بمصر عقبة بن عامر وهو سهو، والصحيح هو عقبة بن مالك كما نقل الذهبى فى تاريخ الاسلام: ٣/ ٦٠٢، فى ترجمة: محمد بن ابى حذيفة. وراجع: تاريخ المدينة لابن شبة: ٤/ ١١٥٣، تاريخ الطبرى: ٤/ ٥٦٤،

কোনো কোনো রাবির এ বক্তব্য সঠিক নয় যে, হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রা. এর উপস্থিতিতে মুহাম্মদ বিন আবি হুযাইফা মিসর দখল করেছিলেন। মুহাম্মদ বিন আবি হুযাইফার আলোচনা পেছনে চলে গেছে। তাকে প্রতিপালন করেছিলেন হজরত উসমান রা.। কিন্তু এ যুবাবয়সে কোনো যোগ্যতা ছাড়াই পদ দখল করতে চাইল। হজরত উসমান রা. তাকে অভিজ্ঞ বানানোর জন্য মিসর পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সে সেখানে গিয়ে বিদ্রোহী ও ষড়যন্ত্র আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে মিসরের গভর্নর হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রা. এর বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করে। যখন হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রা. হজরত উসমান রা. এর সাহায্যে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা করেন। তখন মুহাম্মদ বিন আবি হুযাইফা রাজধানী দখল করে নেয়।

দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তেমনিভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে মুহাম্মদ বিন আবু হুযাইফাকেও মিসরের গভর্নরের পদে বহাল রাখেন। কিন্তু এ ব্যাপারটি হজরত মুয়াবিয়া রা. এর জন্য ছিল অসহনীয়। কেননা হজরত উসমান রা. এর বিরোধীদেরকে যেকোনোভাবে তিনি চূড়ান্ত শাস্তির মুখোমুখি করতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে সঙ্গে নিয়ে মিসরের সীমান্ত এলাকা 'আরিশ' পৌঁছেন। প্রতিপক্ষের এগিয়ে আসার সংবাদ পেয়ে মুহাম্মদ বিন আবু হুযাইফাও সীমান্তে পৌঁছে আরিশের দুর্গে মোর্চা তৈরি করে বসেছিল। শামি বাহিনী দুর্গ অবরোধ করে এত অধিক পরিমাণে প্রস্তর বর্ষণ করে যে, মিসরি বাহিনী অস্ত্রসমর্পণে বাধ্য হয়। এরপর মুহাম্মদ বিন আবু হুযাইফাকে তার সঙ্গীদের সাথে হত্যা করা হয়। আরিশের পর নীলনদ পর্যন্ত ছিল মরু অঞ্চল। ওদিকে রাজধানী ফুসতাতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ছিল অসাধারণ। তাই শামি বাহিনী সামনে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত মনে না করে ফিরে চলে যায়।[৩২]

মিসরে কায়েস বিন সা'দ রা. এর গর্ভনরের দায়িত্ব পালন

মুহাম্মদ বিন আবু হুযাইফার হত্যার সংবাদ পেয়ে হজরত আলি রা. হজরত কায়েস বিন সা'দ রা. কে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠান। তিনি মিসর গিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে হজরত আলি রা. এর খেলাফতের পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করেন। কিন্তু 'খিরিবতা' নামক একটি এলাকার ১০ হাজার লোক এ বাইয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত বিলম্বিত করার

---

[৩২] এটা ৩৬ হিজরির ঘটনা। যখন হজরত আলি রা. ইরাকে গিয়ে জঙ্গে জামালের মতো জটিল সমস্যার মোকাবিলা করছিলেন। (তারিখুত তাবারি : ৫/১০৬)
মুহাম্মদ বিন আবি হুযাইফার হত্যার এই ঘটনা যদিও ওয়াকিদি থেকে বর্ণিত, তবে অন্যান্য ঐতিহাসিক থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন: ইবনে ইউনুস আল মিসরিও (মৃত্যু : ৩৪৭ হিজরি) এ ঘটনাকে ৩৬ হিজরির বলে উল্লেখ করেছেন। (তারিখে ইবনে ইউনুস : ১/৪৪১)
হিশাম কালবির বর্ণনা এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ বিন আবি হুযাইফার হত্যা হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর মিসর দখলের পর হয়েছিল। অর্থাৎ ৩৮ হিজরিতে। বিভিন্ন ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায়, কালবির এ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ৩৬ হিজরির বর্ণনাই সঠিক। (তারিখুত তাবারি : ৫/১০৬)

ঘোষণা করে, যতক্ষণ পর্যন্ত হজরত উসমান রা. এর কিসাস সম্পন্ন না হবে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হজরত মাসলামা বিন মুখাল্লাদ ও হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা.। হজরত কায়েস বিন সা'দ রা. অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে কোনো রকম কঠোরতা আরোপ না করে তাদের বাইয়াত বিলম্বিত করেন।[৩৩]

অন্যদিকে সাবায়ি চক্র মিসরে তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছিল। কিন্তু হজরত কায়েস বিন সা'দ রা. এর কৌশল ও গভীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে তারা ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। ফলে তারা হজরত আলি রা. এবং হজরত কায়েস বিন সা'দ রা. এর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে ষড়যন্ত্র শুরু করে। হজরত কায়েস বিন সা'দ রা. 'খিরিবতা' এলাকার লোকদেরকে বাইয়াত না হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। সাবায়ি চক্র এটাকে এভাবে প্রচার করতে থাকে যে, হজরত কায়েস বিন সা'দ খেলাফতের কেন্দ্রের সাথে গাদ্দারি করেছেন। এভাবে তারা হজরত আলি রা. এর মনে কায়েস বিন সা'দ রা. সম্পর্ক খারাপ ধারণা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। তারা চাচ্ছিল, যেকোনোভাবে তাদের পছন্দের ব্যক্তি আশতার নাখায়িকে সেখানকার শাসক বানাতে।[৩৪]

মিসরের পথে আশতার নাখায়ির রওনা এবং হঠাৎ মৃত্যু

এই অবস্থাদৃষ্টে হজরত আলি রা. এর সুযোগ্য ভাতিজা হজরত আবদুল্লাহ বিন জাফর রা. এর বুদ্ধিতে একটি বিষয় সামনে আসে। তিনি খুব পীড়াপীড়ি করে হজরত আলি রা. এর কাছে আবেদন করেন যে, আপনি আশতার নাখায়িকে মিসরে পাঠান। যদি সে মিসর সামলে নিতে পারে, তা হলে তো আপনার উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। আর যদি না পারে, তা হলে আপনি তার থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন।

আশতার নাখায়ির রাগি স্বভাব ও অহমিকার কারণে হজরত আলি রা.-ও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তার মতেও আশতারকে মিসর পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো মনে হলো।

---

[৩৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৪৯, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৪৮৭
[৩৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৫৩

এ চিন্তা অনুযায়ী হজরত কায়েস বিন সা'দ রা. কে মিসরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে আশতারকে শাসক বানিয়ে পাঠানো হয়।[৩৫] আশতার রওনা করে মিসরের সীমান্তে কুলযুমের তীরে পৌঁছে যায়। সেখানে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তার একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ তাকে মধুর শরবত পান করতে দেয়। ঘটনাক্রমে সে শরবত পান করার পরই তার মৃত্যু হয়ে যায়।[৩৬]

হজরত আলি রা. এ সংবাদ জানতে পেরে বলেন, لليدين والفم অর্থাৎ সে মুখ থুবড়ে পড়ে মরেছে।[৩৭]

---

[৩৫] এই পুরো ঘটনা আবু উমর মুহাম্মদ বিন ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব আল কিন্দি (মৃত্যু : ৩৫৫ হিজরি) সহিহ ও মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। তার পাঠ এই :

عن عبد الله بن جعفر رضـ : قال: كنت اذا اردت ان لا يمنعنى على شيئا قلت بحق جعفر فقلت له: اسألك بحق جعفر الا بعثت الاشتر الى مصر فان ظفرت فهو الذى تحب، والا استرحت منه. قال سفيان وكان قد ثقل عليه وابغضه وقلاه، قال: فولاه وبعثه. (كتاب الولاة: ٢١/١)

[৩৬] কিতাবুল ওলাত : ১/২১; তারিখুত তাবারি : ৪/৫৫৩

[৩৭] কিতাবুল ওলাত : ১/২১

নোট : لليدين والفم আসলে একটি বদদোয়ার বাক্য। সুতরাং তার সম্পর্কে নসর বিন মুযাহিম রাফেজির সেই বর্ণনা বর্জিত হবে, যাতে আশতার নাখায়ির মৃত্যু সম্পর্কে হজরত আলি রা. এর পক্ষ থেকে দোয়া বিষয়ক শব্দ বর্ণিত আছে। যেমন, لله مالك لو كان جبل ইত্যাদি। (কিতাবুল ওলাত : ১/২২, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৩৪)

আসমাউর রিজালের কিতাবে আশতার নাখায়ির আলোচনা

আশতার নাখায়ির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও বাজে মানসিকতার আলোচনা পেছনে কয়েক স্থানে করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জারাহ-তাদিলের অধিকাংশ ইমাম রেওয়ায়েত বর্ণনার ক্ষেত্রে তাকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেছেন। (দ্রষ্টব্য : আস সিকাত লিল আজলি : ১/৪১৭; আস সিকাত লিবনি হিব্বান, হাদিস : ৫৩৩৮, তা'জিলুল মানফাআ, জীবনী : ৬৪২৯)

এর কারণ সম্ভবত এই যে, আসলে সে নির্বুদ্ধিতার কারণে সাবায়িদের গুরু হয়ে উঠেছিল। মূলত তার আকিদা খারাপ ছিল না। অবশ্য হজরত আলির মহব্বতে বাড়াবাড়ির কারণে হজরত আলির বিরোধীপক্ষের চরম দুশমন ছিল সে। হজরত আলি রা. নিজেও তার এ বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। কারণ এর ফলে মুসলমানদের অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই তিনি তাকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হাফেজ যাহাবি রহ. লিখেছেন, 'তার নাম ছিল মালেক ইবনুল হারেস। সে ছিল نخع তথা নাখ' নামক গোত্রের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সে হজরত উমর রা. এবং হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করত। ইয়ারমুকের যুদ্ধে সে শরিক হয়েছিল এবং তাতে তার চোখ নষ্ট হয়েছিল। সে হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে

কেউ কেউ হজরত মুয়াবিয়া রা. কে আশতারের মৃত্যুতে জড়িত বলেছে। কিন্তু এর কোনো প্রমাণ নেই।

মুয়াবিয়া রা. এর মিসর দখল এবং মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে হত্যা

আশতার নাখায়ির মৃত্যুর পর হজরত আলি রা. মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে মিসরের গভর্নর বানিয়ে পাঠান। মুহাম্মদ বিন আবু বকর অতীতে হজরত উসমান রা. এর বিরোধীদলের নেতৃত্ব প্রদান করেছিল। তাই তার ব্যাপারে মানুষ ভালো কিছু জানত না। মানুষকে তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করতে তাকে অনেক বেগ পেতে হলো। সে মিসর গিয়ে খিরিবতা এলাকার লোকদেরকে বাইয়াতের জন্য এক মাস সময় দেয়। কিন্তু যখন তারা নিরপেক্ষ অবস্থানেই অটল থাকে, তখন সে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। এটি ৩৮ হিজরির ঘটনা। তার এ পদক্ষেপের কারণে মিসরের অবস্থা বেশ অশান্ত হয়ে ওঠে।[৩৮]

বিদ্বেষ-ছড়ানো-লোকদের অন্যতম। কাফেলার সাথে সেও হজরত উসমান রা. এর নিকট গিয়েছিল এবং অনাচার ছড়িয়েছিল। সে অনলবর্ষী বক্তা ও অত্যন্ত সাহসী অশ্বারোহী ছিল। সিফফিনের যুদ্ধেও শামিল হয়েছিল'।

হাফেজ যাহাবি আরো লিখেছেন, 'আবদুল্লাহ বিন সালামা আল মুরাদি বলেন, উমর রা. আশতারকে দেখেছেন। আমি তখন পাশে ছিলাম। তিনি তাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখেছেন এবং এক দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকিয়ে বলেছেন, তার কারণে মুসলমানদের উপর বিপদের দিন আসবে'। (তারিখুল ইসলাম: ২/ ৩৩৬, তাদাম্মুরী)

ইমাম আহমাদ বিন হামবল রহ. আশতার থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন। (ইকমালু তাহযিবিল কামাল: ১১/৩৫)

মূলত আসমাউর রিজালের কিতাবাদিতে আশতার নাখায়ির অবস্থান মারওয়ান ইবনুল হাকামের মতো, যাদের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় দিকই ছিল। তাই একদল তাদেরকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, আরেক দল আস্থাহীন বলেছেন।

হজরত আলি রা. আশতারের মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কিন্তু তার সামরিক দক্ষতা এবং তার গোত্রীয় জনবল কাজে লাগানোর জন্য তিনি তাকে পক্ষে রাখতে চাচ্ছিলেন। সেই সাথে এ শ্রেণির লোকদের নেতিবাচক চেতনা ও কট্টর মনোভাবের সংশোধনও তার উদ্দেশ্য ছিল, যা শিয়া আকিদা-বিশ্বাস থেকেও অগ্রসর হয়ে রাফেজি চিন্তাধারার বর্ণ ধারণ করেছিল। মূলত এটি ছিল হজরত আলি রা. এর রাজনৈতিক ও দাওয়াতি কর্মকৌশল, যা নিঃসন্দেহে শরয়ি সীমারেখার ভেতরেই ছিল। সুতরাং আশতারকে পক্ষে রাখার কারণে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করা যায় না।

[৩৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৫৭

হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ এবং হজরত মাসলামা বিন মুখাল্লিদ রা. এর অধীনস্থ ১০ হাজার সৈনিক মুহাম্মদ বিন আবু বকরের ক্ষমতায় কোনো রকম প্রভাবিত হলো না। বরং তারা তার মোকাবেলায় অটল থাকে। আর এই সমমনা দলটিকে পক্ষে নিয়েই হজরত মুয়াবিয়া রা. এর জন্য মিসর দখল করার সুবর্ণ সুযোগ হাতে এসে গেল। তিনি হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে বাহিনী দিয়ে মিসর পাঠিয়ে দেন।

এদিকে মুহাম্মদ বিন আবু বকরের জন্য একসাথে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত উভয় দিকের শত্রুর মোকাবেলা করা দুষ্কর হয়ে পড়ল। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হজরত আমর ইবনুল আস রা. তাকে পরাজিত করে মিসর দখল করে নেন।[৩৯]

এই লড়াইয়ে মুহাম্মদ বিন আবু বকর বন্দি হয় এবং তাকে হত্যা করা হয়। এটি ৩৮ হিজরির ঘটনা।[৪০]

---

[৩৯] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯২, ১৯৩

[৪০] তারিখে খলিফা, পৃষ্ঠা : ১৯৩ সনদ সহিহ।

নোট : মুহাম্মদ বিন আবি বকরের হত্যা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের যে বিশদ বিবরণ আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত, তাতে একথাও আছে যে, মুহাম্মদ বিন আবি বকরকে মৃত গাধার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। আর এ খবর শুনে হজরত আয়েশা রা. অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে হজরত মুয়াবিয়া ও হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে সারা জীবন বদদোয়া করেছেন। (তারিখুত তাবারি : ৫/১০২, ১০৫)

মিসরে শামবাসীর আক্রমণ এবং মুহাম্মদ বিন আবি বকরকে হত্যার বিষয়টি অবশ্যই প্রমাণিত। একইভাবে আপন ভাইয়ের হত্যার সংবাদে হজরত আয়েশার ব্যথিত হওয়াও স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে আবু মিখনাফের রেওয়ায়েতে বর্ণিত সকল তথ্যই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বরং কিছু বক্তব্য অবশ্যই মিথ্যা ও মনগড়া। যেমন : হজরত আয়েশা রা. এর প্রতি অভিশাপ ও বদদোয়া দেওয়ার বিষয়টি সম্পৃক্ত করা। একই কথা মুহাম্মদ বিন আবি বকরকে মৃত গাধার পেটে পুরে পুড়িয়ে হত্যার ব্যাপারেও। কেননা এটাও অতিরঞ্জন বলেই মনে হয়।

এক নজরে মুহাম্মদ বিন আবু বকরের জীবন

মুহাম্মদ বনি আবু বকর ছিলেন একজন নেককার ও ইবাদতগুজার ব্যক্তি। তার সম্মানিত মাতা ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবি হজরত আসমা বিনতে উমাইস রা.।

এই আসমা বিনতে উমাইসের প্রথম বিবাহ হয়েছিল হজরত জাফর বিন আবি তালিব রা. এর সঙ্গে। সে ঘরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজরত মুহাম্মদ বিন জাফর। তারপর মুতার যুদ্ধে হজরত জাফর রা. যখন শহিদ হন, তখন তার দ্বিতীয় বিবাহ হয় হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর সঙ্গে। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/২৮৭)

এরপর বিদায় হজের সফরে তার গর্ভে মুহাম্মদ বিন আবু বকর জন্মলাভ করে। দুধের শিশু থাকাকালে একবার এই সন্তান আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি চেহারার একটি ঝলক লাভ করেছিল। তার বয়স যখন আড়াই বছর, তখন তার মহান পিতা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর তৃতীয় দফায় হজরত আসমা বিনতে উমাইস রা. এর বিবাহ হয় হজরত আলি রা. এর সঙ্গে। আর তার পূর্বের দুই স্বামীর দুটি পুত্রসন্তান- মুহাম্মদ বিন জাফর এবং মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে হজরত আলি রা. প্রতিপালন করতে থাকেন। উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকাও তার এই ভাইটিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয় যে, এমন মর্যাদপূর্ণ ঘরের সন্তান হয়ে যুবাবয়সে মুহাম্মদ বিন আবু বকর চক্রান্তকারীদের জালে ফেঁসে যায়। ফলে সেও হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনে শামিল হয়ে যায়। তবে সুখের কথা, শেষদিকে সে তার ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসার সুযোগ পেয়েছিল। নির্ভরযোগ্য রাবিদের বর্ণনা অনুযায়ী হজরত উসমানের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণে মুহাম্মদ বিন আবু বকর জড়িত ছিল না। (আল ইসতিয়াব : ৩/ ১৩৬৬, ১৩৬৭)

তা ছাড়া হজরত আলির পক্ষ থেকে তাকে সঙ্গী বানিয়ে রাখা এবং পদে বসানোটা এ কথার প্রমাণ যে, সে উসমান রা. এর হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিল না। অবশ্য বিদ্রোহের জঘন্য অপরাধে অবশ্যই জড়িত ছিল। কিন্তু জীবনের সমাপ্তিকালে নিজেও অত্যন্ত করুণ পরিণতির শিকার হয়েছিল। হাফেজ যাহাবি রহ. তার হত্যার ঘটনার উপর মন্তব্য টেনে বলেন,

عسى القتل خيرا لهم وتمحيصا.

আশা করা যায়, নিহত হওয়া তার জন্য কল্যাণকর হবে এবং গুনাহ থেকে পরিত্রাণের মাধ্যম হবে। (সিয়ারু আলামিন নুবালা': ৩/৪৮১)

কাসেম বিন মুহাম্মদ

মুহাম্মদ বিন আবু বকর নিহত হওয়ার পর তার ইয়াতিম পুত্র কাসেমকে প্রতিপালন করেন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। যার ফলে এক সময় এই কাসেম বিন মুহাম্মদকে মদিনার সুবিখ্যাত আলেম ও ফকিহদের মধ্যে গণ্য করা হতো। ইমাম বুখারি রহ. তার রেওয়ায়েত নকল করে লিখেছেন,

وكان افضل زمانه

তিনি ছিলেন তার যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

(সহিহ বুখারি, কিতাবুল হজ, বাবুত তীব বা'দা রমইল জিমার)

হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. বলতেন, আমি এ যুবকের চেয়ে হজরত আবু বকরের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ কাউকে দেখিনি।

ইমাম মালেক রহ. বলতেন, কাসেম ছিলেন এ উম্মতের একজন ফকিহ (তাহযিবুল কামাল: ২৩/৪৩০)

হজরত কাসেম বিন মুহাম্মদ রহ. প্রায়ই সেজদাবনত হয়ে এই দোয়া করতেন,

اللهم اغفر لابى ذنبه فى عثمان

তার হত্যার সংবাদে হজরত আলিও ভীষণ ব্যথিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমি তাকে সন্তানের মতো মনে করতাম। সে আমার ভাইও ছিল, ভাতিজাও ছিল। আল্লাহর কাছে আশা করি, তিনি ধৈর্যের প্রতিদান দান করবেন'।[৪১]

মিসর দখলের ফল

মিসরে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া হজরত আলি রা. এর শাসনব্যবস্থার জন্য ছিল বিরাট ক্ষতিকর বিষয়। কেননা এর দ্বারা এক বিশাল এলাকা হজরত আলির হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে শামের শাসনব্যবস্থা আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

কিন্তু স্থানীয় মুসলমানদের জন্য এটি হয়েছিল শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ। কেননা শাসন-ক্ষমতার এ পরিবর্তনের ফলে মিসরের রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল এবং গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়েছিল। এমনিতেও ভৌগোলিকভাবে মিসর ছিল শামের সীমান্তবর্তী এলাকা। উভয় দেশের উন্নয়ন নির্ভরশীল ছিল একক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপর। হজরত মুয়াবিয়া রা. তার শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য মিসরকে শামের সাথে মিলিয়ে নেওয়া আবশ্যক মনে করলেন। তাই তিনি এমনটিই করলেন। মিসর দখলের পর তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে, মুসলিমবিশ্বের পশ্চিম অংশকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সামলে রাখার যোগ্য রাখেন।

সে যুগে রোমানরা মিসরে গোপনে যোগসাজশ শুরু করেছিল। সেখানে সাবায়ি চক্রও বেশ সংঘবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সময় তাদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. এর গভর্নর হজরত আমর ইবনুল আস রা. সেখানে আইন-শৃঙ্খলার অস্থিতিশীলতা দূর করেন। ভিনদেশি এজেন্টদের খুঁজে বের করে তাদের সকল পথ বন্ধ করেন।

হে আল্লাহ, হজরত উসমানের ব্যাপারে আমার বাবার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। (ওফায়াতুল আ'ইয়ান, ইবনে খাল্লিকান: ৪/৫৯)
হজরত কাসেম বিন মুহাম্মদ রহ. হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এর যুগ পর্যন্ত হায়াত লাভ করেছিলেন। তার কিছু আলোচনা হজরত উমর বিন আবদুল আজিজের শাসনামলের অধিনে আসবে।

[৪১] মা'রিফাতুস সাহাবা লি আবি নাঈম আল ইসফাহানি : ১/১৬৮

এরই ধারাবাহিকতায় সে সময় এমন এক কিবতিকেও আটক করা হয়েছিল, যে ইউরোপী শক্তিকে চিঠির মাধ্যমে মুসলমানদের দুর্বলতা এবং বিভিন্ন গোপন রহস্য জানিয়ে দিত। তার কাছ থেকে যে অর্থ জব্দ করা হয়েছিল তা ছিল এক কোটি তিন লক্ষ দিনার। (প্রায় ২৬ কোটি টাকা)। সরকারি আদেশে তা বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৪২]

একজন সাধারণ মানুষের কাছে এত পরিমাণ অর্থ একমাত্র ভিনদেশি মদদেই আসতে পারে। যাতে এগুলো ব্যয় করে সে স্থানীয় লোকদের মন-মস্তিষ্ক এবং ঈমান কিনে নিয়ে বিশৃঙ্খলা ও অনাচার সৃষ্টি করতে পারে।

[৪২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৬৬২

দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি

মিসরে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সীমান্ত আক্রমণ সত্ত্বেও হজরত আলি রা. শামবাসীর সঙ্গে যথারীতি উদারতা ও নম্রতা বজায় রাখেন। এমনটা কোথাও প্রমাণিত নেই যে, হজরত আলি রা. শামিদের দিকে দ্বিতীয়বার সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করেছিলেন। অথচ জাযিরাতুল আরবে শামিদের আক্রমণ এবং মিসরে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি একটা নতুন যুদ্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য শক্তিশালী কারণ হতে পারত।

হজরত আলি রা. রাষ্ট্রপরিচালনার এ রহস্য সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত ছিলেন যে, শাসক হওয়ার অর্থ রাষ্ট্রের উপর এমন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত থাকা, যার দ্বারা যেকোনো আইনপ্রয়োগের ক্ষমতা অর্জিত হয়। এ ক্ষমতা যেখানে একেবারে শেষ হয়ে যায়, সেখানে শাসনও শেষ হয়ে যায়।

সুতরাং কোনো দল যদি অস্বাভাবিকভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে তাদের দখলীকৃত এলাকায় সরকারি বিধান বাস্তবায়নের সমস্ত চেষ্টা তরবারির বলে ব্যর্থ করে দেয়, এবং এ অবস্থা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে, তা হলে সেক্ষেত্রে বিষয়টি বিদ্রোহ থেকে বেরিয়ে পৃথক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দিকে যেতে শুরু করে। তখন সরকার ও বিদ্রোহী দলের পরিবর্তে বিষয়টি দুই রাষ্ট্র ও দুই শাসকের বিরোধ হয়ে দাঁড়ায়।

এহেন পরিস্থিতিতে যদি প্রতিপক্ষ ন্যায়পরায়ণ ও খোদাভীরু হয়, তা হলে অকারণে তার সাথে যুদ্ধে জড়ানোর প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, নিজেদের বর্তমান সীমান্তগুলোর প্রতিরক্ষা অবশ্যই বর্তমান শাসকের দায়িত্ব।

শামবাসীর সঙ্গে হজরত আলি রা. এর রাজনৈতিক কৌশলের ধারা

চিন্তা করলে দেখা যাবে, হজরত আলি রা. এর রাজনৈতিক কর্মপন্থা নিম্নোক্ত ধারায় বিন্যস্ত ছিল। যথা :

১. হজরত আলি রা. মিসরে শামিদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে কোনো রকম কঠোর পদক্ষেপ নেননি। কেননা মিসর আসলেই তার কর্তৃত্বের বাইরে চলে গিয়েছিল।

২. হজরত আলি রা. শামের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার আক্রমণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছিলেন। কেননা দুইপক্ষের বিষয়টি ধীরে ধীরে ন্যায়পরায়ণ দলের পৃথক রাষ্ট্র কায়েমের দিকে যাচ্ছিল।

৩. তবে তখন পর্যন্ত ওই রাষ্ট্রের সাথে কোনো রকম অঙ্গীকার হয়নি। ফলে প্রায়ই সীমান্তে হানাহানি হতো। হজরত আলি রা. নিজ সীমান্তের যথাযথ প্রতিরক্ষা করেছিলেন এবং শামিদেরকে কোথাও সফল হতে দেননি।

৪. হজরত আলি চাইলে শামিদের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত লড়াই করতে পারতেন। কিন্তু সিফফিনের যুদ্ধে যে বিরল জনশক্তি ধ্বংস হয়েছিল, তার কারণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত ছিলেন। যেমনটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন ঠিক যুদ্ধ চলাকালে।[৪৩]

   এ কারণে হজরত আলি এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে চাচ্ছিলেন না, যার ফলে সিফফিনের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটুক। তাই তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার পন্থা গ্রহণ করেছিলেন।

৫. অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, হজরত আলি তার দূরদৃষ্টি, অসাধারণ ফিকহি প্রজ্ঞা ও পরিণামদর্শিতার মাধ্যমে জঙ্গে সিফফিন থেকে ফেরার পথেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই দুই দলের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ক্রমে দীর্ঘসূত্রতা লাভ করবে। আর তখন আপনা থেকেই মুসলিমবিশ্বে দুটি ইনসাফভিত্তিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হবে।

হজরত আলির হৃদয়ে মুয়াবিয়া রা. এর শাসক হওয়ার অনুভূতি ও উদারতা

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ঈমান, ইখলাস, কর্ম ও চরিত্র এবং তার নেতৃত্বের যৌগ্যতা সম্পর্কে হজরত আলি রা. এর মনে কোনো রকম সন্দেহ ছিল না। বিভিন্ন ইঙ্গিত থেকে জানা যায়, সিফফিনের যুদ্ধের পরই

৪৩

لو علمت ان الامريكون هكذا ما خرجت من الكوفة. (مصنف ابن ابى شيبة، ح: ٣٧٨٥٢)

তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ভারসাম্যপূর্ণ নেতৃত্বের পথে তিনি নিজের থেকে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না। বরং সন্ধি ও সমঝোতাকেই প্রাধান্য দেবেন, যেন তিনি হজরত মুয়াবিয়াকে তার ইজতিহাদি ভুলের ক্ষেত্রে অপারগ মনে করে নিয়েছিলেন। কিন্তু হজরত আলির বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ সহযোগীদের মত এতটা প্রশস্ত ছিল না এবং তাদের মনোভাবও এতটা উদার ছিল না। কেননা সিফফিনের ময়দানে তাদের হাজারো প্রিয় মানুষ শামিদের হাতে নিহত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ব্যথা ও বেদনা এত অল্প সময়ের ব্যবধানে মুছে যাওয়ার ছিল না।

হজরত আলি অত্যন্ত বিজ্ঞোচিতভাবে তার বন্ধুদের আহত হৃদয়ে মলম লাগাতে এবং তাদের মন-মস্তিষ্কে তরলতা আনার চেষ্টা করেন। হজরত আলি রা. এর একান্ত সহযোগীরা বলতেন, সিফফিন থেকে ফেরার পর হজরত আলি রা. তার সাথিদের সাথে এমন কিছু বলতে শুরু করেছিলেন, যা আগে কখনোই তিনি বলেননি। যেমন তিনি বলতেন, 'মুয়াবিয়ার শাসনকে অবহেলা করো না। সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মুয়াবিয়া তোমাদের থেকে বিদায় হয়ে যায়, তা হলে দেখবে, তোমাদের মুণ্ডুগুলো ধড় থেকে হানজাল ফলের মতো কেটে কেটে পড়ে যাবে'।[৪৪]

হজরত আলির এ কথা কোনো স্থূল বক্তব্য ছিল না। বরং পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর তার গভীর দৃষ্টি এবং স্পষ্ট পরিণামদর্শিতারই বহিঃপ্রকাশ ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শামের মাটিতে গোত্রীয় কোন্দল ও পক্ষপাত উথলে ওঠা সত্ত্বেও সেখানে হজরত মুয়াবিয়া তার ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বলে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী হয়েছেন। তার পরে শামের কোনো রাজনীতিক তার মতো সঠিক সিদ্ধান্ত ও ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ ঘটাতে পারবে না। সুতরাং তার পরে সেখানে গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ রূপ সৃষ্টি হতে পারে।

৪৪

بسند سحيح واللفظ للخلال: "لا تكرهوا امارة معاوية، والذى نفسى بيده ما بينه وبين ان تنظروا الى جماجم الرجال تندروا عن كواهلها كانها الحنظل الا ان يفارقكم معاوية." (السنة للخلال، ح: ١٢٨٣، مصنف ابن ابى شيبة، ح: ٣٧٨٥٤، ط الرشد، تاريخ دمشق: ٥٩/ ١٥١)

হজরত আলি আরো অনুভব করেছিলেন যে, ইরাকিদের স্বভাবগত অসাঞ্জস্য ও বিক্ষিপ্ততার মোকাবেলায় হজরত মুয়াবিয়া রা. শামিদেরকে যেভাবে সুসংগঠিত করে রেখেছেন, এর ফল সাধারণত রাজনৈতিক বিজয় আকারেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। সুতরাং ভবিষ্যতে উম্মাহর নেতৃত্ব তার হাতেই গুটিয়ে আসা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়।

এ সমস্ত দিক সামনে রেখে হজরত আলি রা. তার একান্ত সাথিদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন, যদি আসলেই কখনো এমন হয়, তা হলে ইরাকিরা যেন এটাকে তাদের আমিত্বের পরিপন্থি মনে না করে। বরং একজন উপযুক্ত ব্যক্তিরূপে মুয়াবিয়ার শাসনকে যেন তারা মেনে নেয়।

মীমাংসার বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর ৩৭ হিজরির জিলকদ মাসে যখন হজরত মুয়াবিয়া রা. শামের পৃথক শাসকরূপে জনগণ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন,[৪৫] তখন একটি পৃথক রাষ্ট্র ও শাসন-ব্যবস্থারূপে শামের অবস্থান আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

---

[৪৫] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯২,

نصه: وبايع اهل الشام لمعاوية بالخلافة فى ذى القعدة سنة سبع وثلاثين.

ونقل الذهبى: ثم بايع اهل الشام معاوية بالخلافة فى ذى القعدة سنة ثمان وثلاثين كذا قال. وقال خليفة وغيره انهم بايعوه فى ذى القعدة سنة سبع وثلاثين، وهو أشبه، لان ذالك كان اثر رجوع عمروبن العاص من التحكيم. (تاريخ الاسلام للذهبى: ٣/٥٥٢، تدمرى)

দ্রষ্টব্য : এসব ইবারত থেকে বাহ্যিকভাবে মনে হয়, হজরত মুয়াবিয়া রা. ৩৭ হিজরিতেই তার খেলাফতের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সাঈদ বিন আবদুল আজিজ তানুখি থেকে বর্ণিত একটি হাসান পর্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী হজরত মুয়াবিয়া রা. তার খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেছেন হজরত আলির শাহাদাতের পর, ৪০ হিজরিতে। রেওয়ায়েত এই:

سية اربعين: وفى هذه السنة بويع معاوية بالخلافة بايلياء.....وكان قبل يدعى بالشام اميرا. وحدثت عن ابى مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال: كان على يدعى بالعراق اميرالمؤمنين وكان معاوية يدعى بالشام الامير، فلما قتل على دعا معاوية اميرالمؤمنين. (تاريخ الطبرى: ٥/١٦١)

সুতরাং সঠিক কথা এই যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. ৩৭ হিজরিতে পৃথক শাসক হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন (এটাকেই কেউ কেউ আল খিলাফাহ বলে ব্যক্ত করেছে)। তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. ইরাকের খেলাফত থেকে পার্থক্য রাখার জন্য শুধু 'আমির' উপাধি গ্রহণ করতেন। হজরত আলি রা. এর শাহাদাতের পর তিনি 'আমিরুল মুমিনিনে'র উপাধি ব্যবহার করেন।

ওদিকে হজরত আলি মানুষের মন-মস্তিষ্ককে এমন কোনো শাসকের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন, যা উভয় রাষ্ট্রের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হবে। যারা শামের উপর আক্রমণ করার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল, তিনি তাদের মত খণ্ডন করে এভাবে বুঝাতে থাকেন যে, খারেজিদের মূলোৎপাটন এর চেয়ে বেশি জরুরি। তিনি বলতেন, তোমরা কি চাও, মুয়াবিয়া ও শামের দিকে ধাবিত হবে, আর এই শত্রুদেরকে তোমাদের পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদের উপর চড়াও হতে দেবে?[৪৬]

সীমান্তের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অঙ্গীকার

যদিও হজরত আলি রা. এর এই নম্রতা ও সহনশীলতার উত্তরে শামিদের পক্ষ থেকে লাগাতার সীমান্ত হামলা অব্যাহত ছিল, এমনকি আলি রা. এর জীবনের শেষবছর ৪০ হিজরিতে বুসর বিন আরতাত রা. এর নেতৃত্বে শামি বাহিনী হিজাজ অতিক্রম করে ইয়েমেন পর্যন্ত তছনছ করে দিয়েছিল। কিন্তু হজরত আলি কেবল তার এলাকার প্রতিরক্ষা ও শামি বাহিনীকে পশ্চাদপসারিত করেই ক্ষান্ত থেকেছেন। এর কিছুদিন পরেই হজরত মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে হজরত আলিকে নিম্নোক্ত চিঠি প্রেরণ করা হয়,

> পর সমাচার এই যে, আপনি যদি চান, তা হলে ইরাক আপনার কাছে থাকুক আর শাম আমার কাছে, যাতে উম্মাহর মধ্যে তরবারি চালনা বন্ধ হয়ে যায় এবং মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত না হয়।[৪৭]

এ চিঠির উদ্দেশ্য ছিল, দুজনের কেউ যেন কারো সীমান্তে হামলা না করে। যার অধীনে যে এলাকা আছে, তা তার কাছেই থাকবে। হজরত আলি জঙ্গে

---

[৪৬] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫১৬, باب تحريض على قتل الخوارج، ط دار الجيل
আবু মিখনাফ কয়েকটি বানোয়াট রেওয়ায়েত পেশ করে এ মিথ্যা প্রচার করেছে যে, হজরত আলি শামে আক্রমণ করার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু লোকেরা খারেজিদের ফেতনা-ফাসাদের দোহাই দিয়ে তাকে আগে অভ্যন্তরীণ বিপদের দিকে মনোনিবেশ করতে বলে।
অথচ এটা সম্পূর্ণ উলটো কথা। যেমনটি সহিহ মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় এবং সে বর্ণনার আলোকে এসব ভ্রান্ত রেওয়ায়েতের খণ্ডনও হয়ে যায়। এখান থেকে এ ধারণাও করা যায় যে, রাফেজি রাবিরা রেওয়ায়েতের আসল রূপ বিকৃত করে তাকে কতটা বাস্তবতা বিরোধী করে উপস্থাপন করতে পারে!

[৪৭] তারিখুত তাবারি : ৫/১৪০

সিফফিনের পর এ কর্মপন্থাই গ্রহণ করেছিলেন। তখন থেকে এ পর্যন্ত তিনি একবারও শামের সীমান্ত এলাকায় কোনো সৈন্য প্রেরণ করেননি।

যখন হজরত মুয়াবিয়াও এ কর্মপন্থা অনুসরণের আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তখন হজরত আলি রা. খুশি হয়ে তা গ্রহণ করলেন। আর এর মধ্য দিয়েই দুই দেশের সীমান্ত-রক্ষার চুক্তি হয়ে গেল। এরপর থেকে হজরত আলি তার দেশের আয় জমা করে তার শাসনাধীন এলাকায় এবং হজরত মুয়াবিয়া তার দেশের প্রয়োজনে ব্যয় করতে থাকেন।[৪৮]

হজরত আলি রা. এর খেলাফতের শেষমাসগুলোতে উভয় দেশেই শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান ছিল। হজরত আলির শাহাদাত পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে আর কোনো লড়াই হয়নি।

---

[৪৮] তারিখুত তাবারি : ৫/১৪০

সন্ধির উক্ত ঘটনা কেবল এই একজন রাবিই বর্ণনা করেছেন। তাবারি ছাড়া কোনো ঐতিহাসিক এটা বর্ণনা করেননি। তদুপরি তাবারির বর্ণনাও বেশ সংক্ষিপ্ত। যার দ্বারা মোটেই ধারণা পাওয়া যায় না যে, বুসর বিন আরতাত রা. এর বাহিনী আক্রমণ করার পর হঠাৎ এই সন্ধি কী করে হলো?

এ প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি কারণ যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। যথা : হজরত আলি রা. এর পক্ষ থেকে সফল প্রতিরক্ষার পর শামিদের পুনরায় আক্রমণ করা নিষ্ফল মনে করেছে।

১. হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত আলি রা. এর উত্তম স্বভাব ও উদার মনোভাবে প্রভাবিত হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার প্রতি আগ্রহী হয়েছেন।

২. শামের সাধারণ জনমত এরপর আর যুদ্ধের পক্ষে ছিল না।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, সন্ধি কোন মাসে হয়েছিল?

সকল ঐতিহাসিক একমত যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. বুসর বিন আরতাত রা. কে হিজাজ ও ইয়েমেনের অভিযানে পাঠিয়েছেন ৪০ হিজরিতে। এ বাহিনী ইয়েমেন দখল করে নিয়েছিল। তারপর হজরত আলির পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা বাহিনী এলে শামি বাহিনী পিছু হটে শামে চলে গিয়েছিল। আর এই আসা-যাওয়া, অবস্থান করা এবং বিজিত এলাকার ব্যবস্থাপনা ঠিক করতে কমপক্ষে তিন মাস অবশ্যই ব্যয় হয়ে থাকবে। এ হিসেবে যদি ধরা হয়, অভিযান হয়েছিল ৪০ হিজরির শুরুতে অর্থাৎ মহররম মাসে, তাহলে তাতেও হয়তো শামি বাহিনী ফিরে যেতে যেতে রবিউল আখির শুরু হয়ে গিয়েছিল। যদি এরপর সন্ধির প্রস্তাব ও জবাব নিয়ে দূতদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়, তাতেও কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে হতে এক-দেড় মাস সময় অবশ্যই লেগে থাকবে। এর অর্থ দাঁড়াল, সন্ধিচুক্তি জুমাদাল উলা বা তার পরে কোনো সময় হয়েছিল। এভাবে আমরা বলতে পারি যে, হজরত আলি রা. এর খেলাফতের শেষ চার-পাঁচটি মাস ছিল গৃহযুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

আমিরুল মুমিনিন ও আমিরে শাম

সে সময় শামের সবচেয়ে বড় আলেম হজরত সাঈদ বিন আবদুল আজিজ তানুখি রহ. ইরাক ও শামের উক্ত দুই ইনসাফপূর্ণ ইসলামি শাসনব্যবস্থার মধ্যকার সম্পর্কের অবস্থাকে খুব সংক্ষিপ্ত ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করতেন, 'হজরত আলি রা. কে ইরাকে আমিরুল মুমিনিন বলা হতো এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. কে শামে (শুধু) 'আমির' বলা হতো। হজরত আলি যখন শাহাদাত বরণ করেন, তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. কে 'আমিরুল মুমিনিন' বলে সম্বোধন করা হলো'।[৪৯]

রোম সম্রাটের হুমকি ও হজরত মুয়াবিয়া রা.এ প্রতিউত্তর

হজরত মুয়াবিয়া রা. ও হজরত আলি রা. এর মধ্যকার রাজনৈতিক মতবিরোধ নিজ নিজ অবস্থানে ছিল। কিন্তু উম্মাহর কল্যাণকামিতা ও প্রতিরক্ষাকে উভয়েই সবকিছুর উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিতেন। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল না।

এরই ধারাবাহিকতায় দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধির পূর্বের একটি ঘটনা খুবই ভেবে দেখার বিষয়। রোম সম্রাট মুসলিমবিশ্বের উপর আক্রমণ করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে যখন দেখল ইসলামি সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাই সে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে শামের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলো।

হজরত মুয়াবিয়া রা. এই সংবাদ জানতে পেরে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে তাকে চিঠি পাঠালেন। তাতে লেখা ছিল, 'হে অভিশপ্ত, যদি তুই ফিরে না যাস, তবে আল্লাহর কসম, আমি এবং আমার চাচাতো ভাই আলি তোর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে মোকাবেলা করব। এমনকি আমরা তোকে তোর সমস্ত ক্ষমতা ও রাজত্ব থেকে বিচ্যুত করে ছাড়ব এবং জমিনের প্রশস্ততা তোর জন্য সংকীর্ণ করে আমরা ক্ষান্ত হবো'।

রোম সম্রাট এ চিঠি পড়ে সাথে সাথে কাঁপতে শুরু করল। সে বুঝে ফেলল যে, মুসলিম-নেতারা আসলে অন্যদের মোকাবেলায় এখনো সিসাঢালা প্রাচীরের মতো। সুতরাং তৎক্ষণাৎ সে হজরত মুয়াবিয়াকে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়ে তার সকল সৈন্য নিয়ে ফিরে চলে যায়।[৫০]

---

[৪৯] তারিখুত তাবারি : ৬/১৬১

[৫০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/ ৪০০, জীবনী : হজরত মুয়াবিয়া রা.।

ইসলামি রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানের ভিত্তি

হজরত আলি রা. জীবনের শেষ পর্যন্ত হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বিষয়ে আপসকামী মনোভাব ও কর্মপন্থা অবলম্বন করে গেছেন। তার এই অভূতপূর্ব ফিকহি সিদ্ধান্ত মুসলিমবিশ্বের পরবর্তী খেলাফতগুলোর জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে। তা হলো, যদি কোনো এলাকার কোনো মুসলিম শাসক, খেলাফত কর্তৃপক্ষের সাথে মতপার্থক্যের কারণে পৃথক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে নেয়, তা হলে খলিফার জন্য কোনো অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যক নয়। বরং মুসলমানদের জন্য এটাই কল্যাণকর হয় যে, ওই শাসকের নিজস্ব অবস্থান একটি বাস্তবতা ধরে নিয়ে তার রাষ্ট্রকে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়া হবে এবং কোনোভাবে তাদেরকে বাধা দেওয়া হবে না, তা হলে এমনটি করার সুযোগ আছে।

আব্বাসি ও উসমানি খেলাফতের যুগের অধিকাংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মুসলিম শাসক শরিয়তের উক্ত অবকাশের ভিত্তিতেই ক্ষমতা দখল করেছিল। আব্বাসি উসমানি যুগের স্বাধীন মুসলিমরাষ্ট্রগুলো সাধারণত কেন্দ্রীয় খেলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রেখেই চলত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক শান্তিচুক্তিও হতো। তবে অবস্থা তখনই খারাপ হতো, যখন মুসলিম শাসকরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করত।

যদি বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করে নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংবিধান কুরআন ও হাদিসের ন্যায়সঙ্গত বিধানের উপর পরিচালিত করে, আর প্রতিবেশী মুসলিম শাসকদের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক অটুট রাখে, তা হলে কেবল রাষ্ট্রীয় বিভিন্নতা মুসলমানদের রাজনৈতিক নীতিমালায় বড় ধরনের কোনো সমস্যার কারণ হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, যেসব শাসক খেলাফতের সাথে স্বেচ্ছায় বিরোধে জড়ায়, অথবা যে রাষ্ট্রগুলো তাদের ভুল চিন্তাধারা অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত পদদলিত করতে চায়, নিরপরাধ মানুষের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাতে চায়, সর্বোপরি শরিয়তের সীমারেখা উপেক্ষা করতে চায়, তাদের বিষয়টি ভিন্ন। তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা অবশ্যই জরুরি।

হজরত আলির ফিকহি মতের উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মধ্য থেকে কিছু লোক তার ঘরে প্রবেশ করে তার উপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছিল। অন্যদিকে কিছু লোক কেবল হইচই শুনে হাঙ্গামায় শরিক হয়েছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল অজ্ঞ ও আবেগপ্রবণ মানুষ। তারা নিছক প্ররোচনায় পড়ে বিশৃঙ্খলায় জড়িত হয়েছিল। মূল হত্যাকারী ছিল হাতেগোনা কয়েকজন। এই অপরাধীরা হজরত আলি-সহ সকল সাহাবির নিকট কিসাসের উপযুক্ত ছিল। তারা হজরত আলির দলে শামিল হয়নি। বরং হত্যাকাণ্ডের পরপরই তারা দূরদূরান্তের এলাকায় পালিয়ে আত্মগোপন করেছিল।

এখন বিতর্কের বিষয় কেবল ঐসকল বিদ্রোহীকে নিয়ে ছিল, যারা হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল না এবং বাইয়াত হয়ে হজরত আলির দলে শামিল হয়ে গিয়েছিল। এদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হবে, তা নিয়ে ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা যেমন ছিল, তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকেও মতবিরোধ ছিল।

জঙ্গে জামালের প্রতিপক্ষ ও শামিদের দাবি ছিল, এই বিদ্রোহীদের থেকেও কিসাস গ্রহণ করা জরুরি। পক্ষান্তরে হজরত আলির সম্মুখে যেসব শরয়ি দলিল উপস্থিত ছিল, তার আলোকে প্রমাণিত হচ্ছিল যে, বিদ্রোহী যখন অস্ত্রসমর্পণ করে, তখন সে নিরাপদ হয়ে যায়। এ বিষয়ে পরিষ্কার দলিল ছিল ডাকাত ও বিদ্রোহীদের ব্যাপারে কুরআনুল কারিমের নিম্নোক্ত আদেশ :

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তবে ওইসব লোকের কথা ভিন্ন, যারা তাওবা করে নেয়, এর পূর্বে যে, তোমরা তাদের উপর প্রবল হয়ে যাও। সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল এবং অতি দয়ালু।[৫১]

---

[৫১] সুরা মায়েদা, আয়াত ৩৪

একবার হারেসা বিন বদর নামক এক বিদ্রোহী বন্দি হওয়ার পূর্বক্ষণে অস্ত্র ফেলে সম্মুখে এসে উপস্থিত হলে হজরত আলি রা. তাকে নিরাপত্তা দিয়ে এ আয়াতই তেলাওয়াত করেছিলেন।[৫২]

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, হজরত আলির নিকটে নিরাপত্তার এ বিধান সব ধরনের বিদ্রোহীর জন্যই ছিল। কিন্তু সতর্কতাস্বরূপ তিনি দেখতে চাচ্ছিলেন যে, আসলেই কি এমন কোনো দলিল আছে, যার আলোকে প্রমাণিত হবে, নিরাপত্তার এ বিধান সবধরনের বিদ্রোহীর জন্য নয়; বরং কেবল ওইসব বিদ্রোহীর জন্য, যারা মুজতাহিদ এবং তাবিল করার সক্ষমতা রাখে! সম্ভবত একারণেই তিনি মানুষকে কিসাসের বিষয়ে ধৈর্য ও অপেক্ষার তাগিদ করতেন। এবং একারণেই তিনি হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের উপর কোনো শাস্তি জারি করেননি।

ইতিহাসের বিভিন্ন ইঙ্গিত সাক্ষ্য দেয় যে, চিন্তা ও অপেক্ষার এ সময়টি ছিল জঙ্গে সিফফিন এবং মীমাংসা বৈঠক পর্যন্ত। এ সময় পর্যন্ত শামিদের পক্ষ থেকে ঐসমস্ত লোক থেকে কিসাস গ্রহণের দাবি করা হয়, যারা মদিনায় হাঙ্গামা করার জন্য গিয়েছিল। কিন্তু হজরত আলি বা তার কোনো প্রতিনিধির পক্ষ থেকে কখনো এ অবস্থান পেশ করার কথা বর্ণিত হয়নি যে, শরিয়তে এ দাবি পূরণের কোনো সুযোগ নেই।

তবে এটাও সত্য যে, শেষ পর্যন্ত এ চিন্তাভাবনার পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরিশেষে উম্মাহর ইজমা এ বিষয়েই হয়েছিল যে, অস্ত্রসমর্পণকারী বিদ্রোহী মুজতাহিদ হোক বা না হোক, তাদের জন্য নিরাপত্তা প্রমাণিত এবং তারা কিসাস ও জরিমানা গ্রহণের যোগ্য নয়।[৫৩]

---

[৫২] তাফসিরুত তাবারি (তাফসিরে জামিউল বয়ান) : ৮/৩৯৩

[৫৩] এ সম্পূর্ণ আলোচনার দলিল কোনো ঐতিহাসিক-বর্ণনা নয়। বরং এর দলিল ফকিহদের বিভিন্ন ইবারত। যেমন,

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কাছে তার শাগরিদ আবু মুতি রহ. দীনের মৌলিক বিষয়াবলি ও আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলো করেছিল, তার সমষ্টি 'আল ফিকহুল আবসাত' নামক কিতাবখানা ইসলামি আকায়েদের প্রাচীন ও গ্রহণযোগ্য একটি উৎস। সেই কিতাবের নিম্নোক্ত ইবারত লক্ষ করুন :

قلت: الخوارج اذا خرجوا وحاربوا وأغاروا ثم صالحوا، هل يتبعون بما فعلوا؟

قال: لا غرامة عليهم بعد سكون الحرب، ولا حد عليهم، والدم كذلك لا قصاص فيه.

قلت: ولم ذلك؟

قال: للحديث الذى جاء انه لما وقعت الفتنة بين الناس فى قتل عثمان رضـ فاجتمعت الصحابة رضى الله عنهم على ان من اصاب دما فلا قود عليه، ومن أصاب فرجا حراما بتأويل فلا حد عليه، ومن أصاب مالا بتأويل فلا تبعة عليه الا ان يوجد المال بعينه فيرد الى صاحبه.

আমি জিজ্ঞেস করলাম, যখন কোনো দল বিদ্রোহ করে, লড়াই করে, লুটপাট করে, তারপর সন্ধি করে নেয়, তখন কি তাদের থেকে তাদের কার্যকলাপের জরিমানা নেওয়া হবে?

ইমাম আবু হানিফা রহ. বললেন, যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর তাদের উপর কোনো জরিমানাও আসবে না, কোনো দণ্ডও আসবে না। একইভাবে কারো রক্তের বদলায় কেসাসও নেওয়া হবে না।

আমি বললাম, এর কারণ কী?

তিনি বললেন, ঐ হাদিসের কারণে, যাতে বর্ণিত হয়েছে, যখন হজরত উসমান রা. এর হত্যাকাণ্ড নিয়ে মানুষের মধ্যে ফেতনা ছড়াল, তখন সাহাবায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, যারা কোনো রক্তপাত ঘটিয়েছে, তাদের উপর কেসাস নেই, যারা তাবিল করে সতীত্ব নষ্ট করেছে, তাদের উপর কোনো দণ্ড নেই, যারা কোনো তাবিলের কারণে সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, তাদের উপর কোনো জরিমানা নেই। শুধু ঐ অবস্থায় যখন সেই সম্পদ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যাবে। তখন তা মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'। (আল ফিকহুল আবসাত, পৃষ্ঠা : ২০)

ইমাম সারাখসি রহ. হুবহু একই বিষয়ে আলোকপাত করে লিখেছেন,

والاصل فيه حديث الزهرى: قال: وقعت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين، فاتفقوا على ان كل دم اريق بتأويل القرآن فهو موضوع، وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع، وكل مال اتلف بتأويل القرآن فهو موضوع، وما كان قائما بعينه فهو مردود على صاحبه. (المبسوط، باب الخوارج: ١٠/١٢٨)

মোটকথা, গৃহযুদ্ধের পর যখন সাহাবায়ে কেরাম প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত ছিলেন, তখন সকলে অতীতের ঘটনাবলিকে শরয়ি দলিলের আলোকে পর্যবেক্ষণ করার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কুরআনের তাবিলের ভিত্তিতে যে রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে, তার কোনো কেসাস নেওয়া হবে না। তাবিলের মাধ্যমে যে জিনিস নষ্ট করা হয়েছে, তার জরিমানা ওয়াজিব হবে না। তাবিলের মাধ্যমে যে সতীত্বকে বৈধ মনে করা হয়েছে। তার কারণে কোনো দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হবে না।

বাকি রইল একথা যে, এর কী প্রমাণ আছে, এই ইজমা হজরত আলি রা. এর খেলাফতকালে (বরং তারই তত্ত্বাবধানে) হয়েছিল?

এর উত্তর হলো, আল ফিকহুল আবসাতে ইমাম আবু হানিফা রহ. একে পরিষ্কারভাবে হজরত উসমানের কেসাসের বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বলেছেন। আর তা হজরত আলির যুগেই ঘটেছিল।

তা ছাড়া ইমাম সারাখসির ইবারত নিয়ে যদি গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে নিম্নোক্ত বাক্যটি থেকেও এটা প্রমাণিত হয়-

وقعت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين.

আর তা এভাবে যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে ফেতনার দুটি পর্ব ছিল। প্রথমবার হজরত আলি রা. এর খেলাফতকালে, যখন জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিন সংঘটিত

বিদ্রোহীদের ব্যাপারে হজরত আলি রা. এর মতের উপর ইজমা হওয়ার ফল

উক্ত ইজমা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মদিনায় হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের থেকে হজরত আলি রা. এর কিসাস গ্রহণ না করা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও তার জন্য আবশ্যক ছিল বিষয়টির চূড়ান্ত

হয়েছিল। দ্বিতীয়বার ইয়াজিদের যুগে, যখন কারবালা, হাররার ঘটনা এবং কাবাঘরকে অবরোধের ঘটনা ঘটেছিল। এর মধ্যে প্রথম ফেতনার সময় সাহাবায়ে কেরাম প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত ছিলেন। আর দ্বিতীয় ফেতনার সময়টি ছিল প্রথমটির বাইশ বছর পর। তখন পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছিল। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, উল্লিখিত বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা হজরত আলির যুগেই হয়েছিল।

ফকিহগণও অধিকাংশ আলেমের মত এটিই লিখেছেন যে, বিদ্রোহীরা যদি অস্ত্রসমর্পণ করে, তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। উপরন্তু বিদ্রোহী লড়াই চলাকালে তারা যেসব প্রাণ ও অর্থ-সম্পদ নষ্ট করবে, তার কোনো শাস্তি বা জরিমানা হবে না। যেমন উল্লেখ আছে,

- اذا تاب اهل البغى ودخلوا الى اهل العدل لم يؤخذوا بشئ مما أصابوا، يعنى بضمان ما أتلفوا من النفوس (المبسوط للسرخسى: ١٠/١٢٧)
- وما أتلف اهل البغى من اموالنا ودمائنا حالة الحرب فانهم لا يضمنون اذا تابوا وزالت منعتهم. (الفتاوى الهندية: اى عالمكيرى (عربى): ٢/٢٨٤، دار الفكر)

অবশ্য রণাঙ্গনের বাইরে যদি তারা কাউকে হত্যা করে থাকে, তাহলে সর্বৈকমত্যে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

اذا قتل الباغى احدا من اهل العدل فى غير المعركة يقتل به. (الموسوعة الفقهية الكويتية: ٨/١٤٣)

হজরত উসমান রা. এর হত্যা লড়াই চলাকালে হয়নি। বরং তাকে শহিদ করা হয়েছিল তার ঘরে প্রবেশ করে। তাই তার হত্যাকারীরা শাস্তির উপযুক্ত ছিল।

ইমাম সারাখসি রহ. এ বিষয়টিকেই অন্যত্র এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

فأما سقوط الضمان فهو حكم ثبت باتفاق الصحابة بخلاف القياس على ما روى عن الزهرى: قال: وقعت الفتنة الخ.... (المبسوط: ٣٠/١٤٢)

এ বিষয়ে দিয়ানাতান ও কাযাআনের পার্থক্য বর্ণনার জন্য তিনি লিখেছেন, 'ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, যদি তারা তাওবা করে নেয়, তাহলে আমি ফতোয়া দেব যে, তারা যেন জরিমানা দেয়। তবে আমি এ ব্যাপারে তাদেরকে বাধ্য করতে পারব না। তারা অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেছে। সুতরাং যদি দাবি রহিত হয়ে যায়, তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, বান্দা ও আল্লাহর মধ্যেও জরিমানা রহিত হয়ে যায়'। (আল মাবসূত: ১০/১২৮)

যাই হোক, এখানে ফিকহি মাসআলা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তাই সংক্ষেপে শুধু ইঙ্গিত করা হলো। বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ সহকারে আলোচনা ফিকহের কিতাবাদিতে দেখা যেতে পারে।

যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধান না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না, বরং নীরব থাকবেন।

আমিরুল মুমিনিন আসলে সেটাই করেছিলেন। এটি কেবল রাজনৈতিক কল্যাণের বিষয় ছিল না। বরং ছিল দীনি, শরয়ি ও ইলমি দায়িত্বশীলতার বিষয়।

হজরত আলি রা. ছিলেন বিচারবিষয়ক মাসআলার সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাই এ কথা বলা সঠিক যে, উক্ত ইজমা ও ইজতিহাদের পরিচালক তিনিই ছিলেন। আর যেহেতু হজরত আলি এই ইজমার পূর্বেই সতর্কতার বিষয়টি সামনে রেখে কিসাস গ্রহণে বিলম্ব করে আসছিলেন, তাই এ কথা বলা সঠিক হবে যে, তার মত শুরু থেকে এদিকেই ধাবিত ছিল যে, যেকোনো ধরনের বিদ্রোহী অস্ত্রসমর্পণের পর নিরাপদ হয়ে যাবে। কিন্তু এ মতের সমর্থনের জন্য সকল সাহাবির ইজমার প্রয়োজন ছিল। আর ইজমার জন্য প্রয়োজন ছিল পরিবেশ-পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ হওয়া এবং মানুষের মন-মানসিকতা আবেগমুক্ত হওয়া। কেননা আবেগতাড়িত অবস্থায় সঠিক ফতোয়া প্রদান করা যায় না।

এমনও হতে পারে যে, হজরত আলি রা. বিশৃঙ্খলাকারী এবং মুজতাহিদ নয় এমন বিদ্রোহীদের ব্যাপারে নিজের মত সম্পর্কে শুরু থেকেই পূর্ণ স্বচ্ছ ও সন্দেহমুক্ত ছিলেন। কিন্তু তার আশঙ্কা ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনো সে কথা শোনা ও মানার মতো যোগ্যতা সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং এখন থেকেই যদি বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়, তা হলে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বিক্ষুব্ধ জনতা শরয়ি দলিল না বুঝেই হজরত আলির সিদ্ধান্তকে হজরত উসমান রা. এর কিসাস আন্দোলনের পরিপন্থি একটি চক্রান্ত মনে করে বসবে। হয়তো এ কারণেই হজরত আলি রা. পরিবেশ-পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার এবং আবেগ শীতল হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন।

যাই হোক, পরিশেষে হজরত আলি মদিনার হাঙ্গামার ব্যাপারে পূর্ব থেকেই কার্যত যে ফিকহি সিদ্ধান্ত ও সতর্ক কৌশল গ্রহণ করেছিলেন, সকলেই প্রকাশ্যে তার সমর্থন করেছিল। সে সিদ্ধান্তের কারণেই তার মতে কেবল ওইসব লোকেরই কিসাস গ্রহণের যোগ্যতা ছিল, যারা হজরত উসমান রা. এর ঘরে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করেছিল।

হজরত মুয়াবিয়া তার শাসনামলে হজরত আলির ইজতিহাদের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন

ঐতিহাসিকভাবে এটা প্রমাণিত আছে যে, হজরত মুয়াবিয়াও নিজ শাসনামলে উক্ত ইজমাভিত্তিক মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন। কেননা যখন তার খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন তিনিও অক্ষরে অক্ষরে হজরত আলির উক্ত ইজতিহাদের অনুসরণ করেছেন এবং তার ২০ বছরের ক্ষমতাকালে কেবল দু'চারজন এমন ব্যক্তি থেকে কিসাস গ্রহণ করেছেন, যারা সরাসরি হজরত উসমান রা. এর অন্যায়-হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল।

সুতরাং এর কারণ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ইজতিহাদ পরিবর্তন হয়েছিল এবং সকল বিশৃঙ্খলাকারীকে হত্যা করার শরয়ি কোনো অবকাশ তখন পর্যন্ত তিনিও মানতেন না।

ঠিক একারণেই হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘটনায় জড়িত দুই প্রসিদ্ধ অপরাধী- উমাইর আয যাব্বি ৭৫ হিজরি পর্যন্ত এবং কামিল বিন জিয়াদ ৮৩ হিজরি পর্যন্ত ইরাকে বেঁচে ছিল। অবশেষে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের হত্যা করেছিল।[৫৪]

বলাবাহুল্য, হাজ্জাজ যেমন হজরত আলি ও মুয়াবিয়ার চেয়ে অধিক ইনসাফপ্রিয় ছিল না, তেমনি হজরত আলি ও মুয়াবিয়াও ইনসাফ ও ইত্তিবায়ে শরিয়তের ক্ষেত্রে কারো থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। সুতরাং হজরত আলি প্রথমে যা করেছেন এবং হজরত মুয়াবিয়া পরে যাকে গ্রহণ করেছেন, সেটাই ছিল শরিয়তের সঠিক পন্থা।

অতএব, হজরত আলির পক্ষ থেকে হজরত মুয়াবিয়ার দাবি মেনে না নেওয়া এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করার মৌলিক কারণ শরিয়তসম্মত ছিল। অর্থাৎ বিদ্রোহীদের অধিকাংশই সাবেক খলিফার হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল না। উপরন্তু তারা নতুন খলিফার হাতে বাইয়াত হয়ে শান্তিপূর্ণ অধিবাস গ্রহণ করেছিল। ফলে শরিয়তের পক্ষ থেকে তাদের উপর কিসাসের শাস্তি প্রযোজ্য হয়নি।

---

[৫৪] তারিখুত তাবারি : ৬/২০৭, ৩৬৫

যদিও রাজনৈতিক অপারগতা, শক্তির স্বল্পতা, ঐক্যের অভাব এবং পরিস্থিতির প্রতিকূলতা নিঃসন্দেহে কিসাস গ্রহণের পথে বাধা হয়েছিল; কিন্তু এগুলোকে পদক্ষেপ না নেওয়ার মৌলিক কারণ আখ্যায়িত করে শরয়ি অপারগতাকে যদি একেবারেই উপেক্ষা করা হয়, তা হলে হজরত আলির বিরুদ্ধে হত্যাকারী ও অপরাধীদের প্রতি আন্তরিকতা পোষণের মিথ্যা অভিযোগ পরিপূর্ণরূপে বিদূরিত হয় না। কোনো না কোনোভাবে এ সন্দেহ থেকেই যায় যে, যে শাসক শাম এবং নিহরুওয়ানের লোকদের মোকাবেলায় বিরাট বাহিনী নিয়ে লড়াই করতে পেরেছেন, তিনি মাত্র দু তিন হাজার মানুষকে কী করে বশীভূত করতে পারলেন না?

খারেজিদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব

মৌলিকভাবে খারেজিরা ছিল এমন লোকদের দল, যারা-

- শরিয়তের উপর আমল করার ক্ষেত্রে কঠোরতায় অভ্যস্ত ছিল এবং নিজেদের ইবাদত ও সাধনা নিয়ে গর্ব করত।
- তাদের দৃষ্টিতে বিশিষ্ট সাহাবিগণও সাধারণ মানুষের চেয়ে বিশেষ কোনো মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন না।
- তারা কুরআনুল কারিমের শাব্দিক অর্থের উপর চোখ বন্ধ করে যেমন আছে তেমনই আমল করাকে সর্বোচ্চ দীনদারি মনে করত। একমুহূর্তের জন্য তাদের একথা মনে হতো না যে, তাদের চিন্তার বাইরেও কুরআনের কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে। কেননা তাদের স্থূল বিবেক শরয়ি বিধানাবলির সূক্ষ্মতা বুঝতে অক্ষম ছিল।
- খারেজিদের মধ্যে সাধারণত তেজী, আবেগী ও কঠোর মেজাজের লোকেরা শামিল ছিল। এদের কোনো সরদার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যও পেয়েছিল। কিন্তু নিজেদের ধৃষ্ঠতা ও বেআদবির কারণে তারা কিছুই শিখতে পারেনি। একবার তাদের সরদার জুল-খুওয়াইসারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত লোকদের মধ্যে অর্থ বণ্টন করছিলেন। তখন এই দুর্ভাগা আপত্তি করে বলল, 'আল্লাহকে ভয় করুন, ইনসাফ বজায় রাখুন'।

  আল্লাহর নবী তার কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, 'ইনসাফ যদি আমি না করি, তা হলে আর কে করবে?'

  সঙ্গে সঙ্গে হজরত উমর রা. অনুমতি চেয়ে বললেন, 'এ বেআদবের মাথা ফেলে দিই'?

  কিন্তু আল্লাহর নবী নিষেধ করে বলেন, 'এ ব্যক্তির কিছু সঙ্গী হবে, যাদের নামাজ ও রোজা দেখে তোমাদের কাছে নিজেদের নামাজ-

রোজা কম মনে হবে। কিন্তু এরা দীন থেকে সেভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে তির লক্ষ্যভেদ করে চলে যায়'।[৫৫]

- খারেজিদের কিছু কিছু নেতার পূর্বের কোনো ফেতনার সাথে সম্পর্ক ছিল না। যেমন : আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব এবং উরওয়া বিন উদাইয়া।[৫৬]

- তাদের কিছু সরদার ভুল বুঝে অজ্ঞতাবশত তাদের সঙ্গে শামিল হয়েছিল। কিন্তু পরে তারা তাওবা করেছিল। যেমন : শাবাস বিন রিবয়ী।[৫৭]

- এদের মধ্যে কেউ আবার ছিল পাক্কা সাবায়ি। যেমন : হুরকুস বিন যুহাইর এবং আবদুল্লাহ ইবনুল কাওয়া। খারেজিদের মধ্যে সাবায়ি মতবাদের প্রভাব থাকার একটি প্রমাণ এটাও যে, তারা হজরত আবু বকর সিদ্দিক, হজতর উমর ফারুক-সহ অন্যান্য সাহাবিকে গালমন্দ করত।[৫৮]

- খারেজিদের মধ্যে কিছু লোক জঙ্গে জামালের পর উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এবং তার সঙ্গীদেরকে বন্দি করার ব্যাপারে বেশ পীড়াপীড়ি করে বলত, 'যাদের রক্ত আমাদের জন্য হালাল, তাদের ধনসম্পদ এবং তাদের স্ত্রী আমাদের জন্য কেন হারাম হবে'?[৫৯]

---

[৫৫] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪৩২, কিতাবুত তাওহীদ, সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫০৫
ঐতিহাসিকদের অভিমত অনুযায়ী হুরকুস বিন যুহাইরই ছিল যুল-খুওয়াইসারা। সে প্রথমে সাবায়িদের এবং পরে খারেজিদের হর্তাকর্তা বনে গেছিল। (আল ইসাবাহ : ২/৩৪৩, উসদুল গাবাহ : ১/৭১৪)

[৫৬] তারিখুত তাবারি, ৫/৫৫, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯২,

[৫৭] তারিখুত তাবারি, ৪/৪৮৩, ৪৮৪, আল আ'লাম লিয যিরিকলি: ৩/ ১৫৪, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯২

[৫৮] আবদুল্লাহ ইবনে ওয়ালে থেকে বর্ণিত,

ان عبد الله بن الكواء وشبيب بن ربعى وناسا معهما اعتزلوا عليا بعد انصرافه من الصفين الى الكوفة لما انكر عليهم من سب ابى بكر وعمر رضى الله عنهما. (مستدرك حاكم: ٤٧٠٢)

[৫৯]

عن ميسرة ابى جميلة قال: ان اول يوم تكلمت الخوارج يوم الجمل، قالوا: ما أحل لنا دمائهم وحرم علينا ذراريهم وأموالهم (مصنف ابن ابى شيبة، ح: ٣٧٧٥٧، ط الرشد)

- হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রেও এরা জড়িত ছিল। হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রা. এর সম্মুখে যখন খারেজিদের আলোচনা উঠল, তিনি বললেন, 'আমি তাদেরকে নিষেধ করে বলেছিলাম, হজরত উসমানকে হত্যা করো না। কিন্তু তারা শুনল না'।[৬০]

- এরা হজরত আলি ও মুয়াবিয়ার মধ্যকার যুদ্ধবিরতি ও সন্ধিচুক্তি প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছিল।[৬১]

- নিজেদের মতাদর্শের উপর এরা এত বেশি উগ্র ছিল যে, তাদের সাথে মতবিরোধকারী যেকোনো ব্যক্তির রক্ত প্রবাহিত করাকে এরা বৈধ মনে করত।[৬২]

- খারেজিদের প্রাদুর্ভাবের আগ পর্যন্ত মুসলমানদের স্লোগান ছিল 'আল্লাহু আকবার'। কিন্তু খারেজিরা এর পরিবর্তে لا حكم الا لله (আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেওয়ার অধিকার নেই) এ বাক্যটি তাদের স্লোগান বানিয়ে নেয়। এটিকে বলা হতো 'না'রায়ে তাহকিম'।[৬৩]

  এ স্লোগান সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেছিল খারেজি সরদার উরওয়া বিন উদাইয়া, সিফফিনের ময়দানে যুদ্ধবিরতির সময়। পরে এটাই তাদের প্রতীক বা নিদর্শন হয়ে যায়।[৬৪]

খারেজিরা হারুরাতে

হজরত আলি রা. যখন সিফফিন থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তার দলের মধ্যে মিশে থাকা খারেজিরা হজরত আবু বকর ও উমর রা.

---

[৬০] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৩৯৬

[৬১] তারিখুত তাবারি : ৫/৬৪,৬৫

[৬২]

وهم أطول الناس صلوة وأكثرهم صوما غير انهم اذا خلفوا الجسر اهراقوا الدماء. (مصنف ابن ابى شيبة. ح: ٣٧٩٠٣. ط الرشد)

[৬৩]

ان الحرورية لما خرجت وهو مع على بن ابى طالب رضى الله عنه قالوا: لا حكم الا لله. (صحيح مسلم. ح: ٢٥١٧)

[৬৪] তারিখুত তাবারি : ৫/৫৫

সম্পর্কে অশোভন কথা বলতে শুরু করে। হজরত আলি তা সহ্য করতে না পেরে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের অশালীন কথাবার্তার প্রতিবাদ করেন। যার ফলে খারেজিরা ক্ষুব্ধ হয়ে দল থেকে পৃথক হয়ে যায়।[৬৫]

তারপর দুই দল ভিন্ন ভিন্ন পথে চলতে থাকে। হজরত আলি যখন কুফায় প্রবেশ করেন, তখন খারেজিরা শহর থেকে দূরে 'হারুরা' নামক স্থানে তাঁবু টানিয়ে অবস্থান করে।[৬৬] তখন তাদের সংখ্যা ছিল ৮ হাজার। সেখানে তারা এটাই চর্চা করতে থাকে যে, হজরত আলি আল্লাহর দীনের বিষয়ে মানুষের শাসন মেনে নিয়েছে। অথচ শাসন তো একমাত্র আল্লাহর অধিকার। তিনি ছাড়া কারো অধিকার নেই যে, কোনো বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেবে।

খারেজিদের রুখে দেওয়া : হজরত আলির বিজ্ঞোচিত প্রমাণ উপস্থাপন

হজরত আলি রা. খারেজিদের অপপ্রচার খণ্ডন করার জন্য ঘোষণা করে দিলেন- সবাই যেন কুরআনুল কারিমের নুসখা নিয়ে খারেজিদের কাছে সমবেত হয়। তারপর তিনি নিজেও পবিত্র কুরআনের একটি বড় নুসখা সম্মুখে রেখে তাতে থপ থপ করে মৃদ আওয়াজে হাত মেরে বললেন, 'হে পবিত্র কালাম, মানুষের সাথে কথা বল'।

লোকেরা অবাক হয়ে বলল, আমিরুল মুমিনিন, এটা তো কাগজ ও কালির সমষ্টি, একে আপনি কী জিজ্ঞেস করছেন?

তিনি বললেন, বিদ্রোহী ও আমার মধ্যেও আল্লাহর সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত আছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

> وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَاۤ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۔
>
> যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে তোমরা বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কা করো, তা হলে সেই পুরুষের স্বজন থেকে একজন এবং সেই স্ত্রীর স্বজন

---

[৬৫] আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, হাদিস : ৪৭০২

[৬৬] তারিখুত তাবারি : ৫/৭৩, ৭৪

থেকে একজন সালিস প্রেরণ করো। উভয় সালিস যদি চায়, তা হলে আল্লাহ তায়ালা দুই পক্ষের মধ্যে ঐক্য করে দেবেন।[৬৭]

এবার বল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের রক্তের বিষয়টি কি একজন নারী-পুরুষের বিষয়ের চেয়েও কম গুরুত্বপূর্ণ?

এ কথা শুনে লোকেরা স্বীকার করল যে, হজরত আলি রা. সালিসের সিদ্ধান্ত করে যথার্থই করেছেন। তিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে খারেজিদের সাথে কথা বলার জন্য পাঠালেন। খারেজিদের এক নেতা আবদুল্লাহ ইবনুল কাওয়া তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে যায় এবং দলের নেতাদেরকে তার কথা শোনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তিনদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে কথোপকথন চলতে থাকে। কিন্তু তারা মানতে রাজি হয় না।[৬৮]

হজরত আলি রা. এর আরো কতিপয় দূত তাদের কাছে যায়। কিন্তু খারেজিরা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং দূতদের বাহনজন্তুগুলো আহত করে দেয়।[৬৯]

শেষ পর্যন্ত কোনোভাবেই যখন এরা মানতে রাজি হলো না, তখন হজরত আলি রা. নিজে তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বুঝাতে থাকেন।[৭০]

খারেজিদের সঙ্গে চুক্তি

হজরত আলি রা. তাদের সঙ্গে চুক্তি করেন যে, যদি তারা খেলাফতের অনুগত থাকে, তা হলে-

১. তাদেরকে মসজিদে গমন করতে এবং জিকির ও ইবাদত করতে বাধা দেওয়া হবে না।
২. গনিমতের সম্পদ এবং বাইতুল-মাল থেকে তাদের অংশ প্রদান করা হবে।
৩. তাদের উপর আক্রমণ চালানো হবে না।

---

[৬৭] সূরা নিসা, আয়াত ৩৫

[৬৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৫৬৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৬৫৬, সনদ সহিহ।

[৬৯] তারিখুত তাবারি : ৫/৯১

[৭০] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৯০০

এ চুক্তি অনুযায়ী হজরত আলি রা. ইসলামি সমাজে একটি শান্তিপূর্ণ বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকার সুযোগ এবং তাদের ব্যাপারে শহরের অধিকারপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করেন।[৭১]

এ চুক্তির পর অধিকাংশ খারেজি বিদ্রোহের উপর উগ্র মনোভাব ত্যাগ করে হজরত আলি রা. এর সঙ্গে কুফায় চলে আসে।[৭২] এটি ৩৭ হিজরির ১ শাওয়ালের ঘটনা। কিন্তু তারপরও প্রায় চার হাজার খারেজি তাদের মতের উপর জেদ ধরে বসে থাকে।

একটি দেশের সীমানার মধ্যে এভাবে স্বাধীন হয়ে একটি সশস্ত্র দলের ঘুরে বেড়ানো দেশের জন্য ছিল ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। কেননা এই লোকগুলো তাদের ভ্রান্ত আকিদার প্রসার ঘটাবার জন্য শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা তছনছ করে দিতে পারে। তাই হজরত আলি রা. তাদেরকে প্রস্তাব পাঠালেন, 'আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত স্থির হয়েছে যে, তোমরা অন্যায়ভাবে কারো রক্তপাত করবে না। কাফেলা লুণ্ঠন করবে না। কোনো জিম্মির উপর জুলুম করবে না। যদি তোমরা এগুলোর কোনোটি করো, তা হলে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ করা হবে'।[৭৩]

খারেজিরা কুফায়

কুফায় ফিরে এসেও খারেজিরা নীরব থাকেনি। তারা শুধু পক্ষে থাকার ব্যাপারে একমত হয়েছিল। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেনি। তা ছাড়া তারা এ ভুল বুঝের শিকার হয়েছিল যে, হজরত আলি রা. তাদের অবস্থান মেনে নিয়েছেন। তাই কুফায় ফিরে এসেই তারা প্রচার করে দিল যে, তারা হজরত আলির কাছে দ্বিতীয়বার এজন্য এসেছে যে, তিনি তার কুফুর থেকে তাওবা করেছেন। এক ব্যক্তি তো সরাসরি হজরত আলির কাছেই প্রশ্ন করে বসল, 'মানুষ বলাবলি করছে, আপনি নাকি আপনার কুফুর থেকে ফিরে এসেছেন?

---

[৭১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৯৩০

[৭২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৯০০, জঙ্গে জামালের পর্ব, হাসান সনদে আবু রাযীন থেকে বর্ণিত, তারিখুত তাবারিঃ ৫/ ৭৩

[৭৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৫৬৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৬৫৭

হজরত আলি এসব গুজবের প্রতিবাদ করার জন্য সেদিনই জোহরের নামাজের পর মানুষের সম্মুখে বক্তব্য দেন এবং খারেজিদের কঠোর সমালোচনা করেন। মসজিদে যে খারেজিরা উপস্থিত ছিল, তারা সহ্য করতে না পেরে হাঙ্গামা শুরু করে দিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কানে আঙুল দিয়ে হজরত আলির সম্মুখে এসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে এ আয়াত তেলাওয়াত করতে শুরু করে-

وَ لَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

আর নিশ্চয় অহি নাজিল করা হয়েছে আপনার কাছে এবং আপনার পূর্ববর্তীদের কাছে, যদি আপনি শিরিক করেন, তা হলে আপনার সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে আর আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বেন।[৭৪]

উত্তরে হজরত আলিও এ আয়াত তেলাওয়াত করেন-

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ[৭৫]

সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য, আর যারা অন্তর থেকে বিশ্বাস করে না, তারা যেন আপনাকে হালকা মনে না করে।[৭৬]

না'রায়ে তাহকিম বা 'ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর' এ স্লোগানের দাঁতভাঙ্গা জবাব

হজরত আলি রা. খুতবা প্রদানের জন্য দাঁড়ালে খারেজিরা 'ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর' বলে স্লোগান তুলে বলতে থাকে, 'আলি, তুমি আল্লাহর দীনের মধ্যে মানুষকে শরিক করেছ। তারপর আবার স্লোগান তোলে- 'ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর'।

---

[৭৪] সুরা যুমার, আয়াত ৬৫

[৭৫] সুরা রুম, আয়াত ৬০

[৭৬] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা নম্বর : ৩৭৯০০, ৩৭৯৩১; তারিখুত তাবারি : ৫/৭৪, সনদ হাসান।

হজরত আলি রা. উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই لا حكم إلا لله 'ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর'। তবে كلمة حق اريد بها الباطل 'এই সত্য কথা বলে একটা ভ্রান্ত উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে'। আল্লাহর আদেশ তোমাদের অপেক্ষা করছে।[৭৭]

শাসকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হজরত আলির বাণী

খারেজিরা শাসনব্যবস্থাও মানত না, শাসকের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করত না। তাদের মতে শাসক ও শাসনব্যবস্থা আল্লাহর শাসক হওয়া ও ইসলামি সমতার পরিপন্থি। হজরত আলি রা. তাদের এ ধারণার প্রতিবাদ করে বলেন, 'এরা বলে, কোনো শাসনব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। অথচ মানুষের জন্য শাসক থাকা আবশ্যক, সে ভালো হোক বা ফাসেক। যাতে তার শাসনের অধীনে থেকে মুমিন তার আমল করতে পারে এবং কাফের তার স্বার্থ পূরণ করতে পারে'।[৭৮]

লোকেরা বলতে লাগল, ভালো শাসকের কথা তো ঠিক আছে, ফাসেক শাসকের অর্থ কী?

তিনি বললেন, তার শাসনের কারণে তোমাদের রাস্তা তো খোলা থাকবে, বাজার তো চালু থাকবে'।[৭৯]

তারপর খারেজিরা হজরত আলির সাথে কিছুদিন কুফায় অবস্থান করে। সে সময় তারা হজরত আলিকে হজরত মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু হজরত আলি তা পরিষ্কার অস্বীকার করেন'।[৮০]

হজরত আলির সঙ্গে খারেজিদের দুর্ব্যবহার

একবার খারেজিদের সরদার হুরকুস বিন যুহাইর এবং যুরআ বিন বুর্জ হজরত আলির কাছে এলো। এসে হুরকুস বলল :

---

[৭৭] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা নম্বর : ৩৭৯৩০, তারিখুত তাবারি : ৫/৯১

[৭৮] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা নম্বর : ৩৭৯০৭

[৭৯] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা নম্বর : ৩৭৯৩১,

[৮০] আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি : ২/৩৩৭,

আপনি আপনার ভুল থেকে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নিন। আমাদের সঙ্গে শত্রুর দিকে অগ্রসর হোন, যাতে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ করতে পরি, যতক্ষণ আমরা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত না হই।

হজরত আলি বললেন, আমাদের এবং তাদের মধ্যে লিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালার আদেশ রয়েছে,

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا

আল্লাহর নামে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূরণ করো, যখন তোমরা অঙ্গীকার করে ফেলো।[৮১]

হুরকুস বলল, 'কিন্তু এ অঙ্গীকার তো গুনাহ, সুতরাং এর থেকে আপনার তাওবা করা উচিত'।

হজরত আলি বললেন, 'এটা কোনো গুনাহ নয়'।

যুরআ বিন বুরজ বলল, খবরদার আলি, আল্লাহর কসম, যদি তুমি আল্লাহর কিতাবের বিষয়ে বান্দাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার প্রদান করা থেকে ফিরে না আসো, তা হলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি তোমার সাথে লড়াই করব।

হজরত আলি রা. বললেন, 'বদবখত! আমার মনে হচ্ছে তুমি এমনভাবে মরবে যে, ধুলোঝড় তোমার দেহের অংশ উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

সে বলল, আমিও চাই, এমনই হোক।[৮২]

খারেজিদের আহ্বান ও সাধারণ মানুষের মানসিক প্রস্তুতি

খারেজিরা যখন দেখল, হজরত আলি রা. কোনোভাবেই তাদের চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শ এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সম্মত হচ্ছেন না, তখন তারা চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। একটি ন্যায়সঙ্গত শক্তিরূপে আবির্ভূত হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল শহর থেকে বেরিয়ে এমন একটি স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করা, যেখানে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব ও ক্ষমতা সবচেয়ে কম থাকবে। এতদিন পর্যন্ত খারেজিদের রীতিমতো কোনো আমিরও নির্ধারিত ছিল না। কেননা তারা নিজেরাই শাসক ও

---

[৮১] সুরা নাহল, আয়াত ৯১

[৮২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৫৭৭, ৫৭৮

শাসনব্যবস্থা অস্বীকার করে আসছিল। তাদের স্লোগান ছিল শাসনক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। কিন্তু এখন যেহেতু তাদের আন্দোলনকে আরো জোড়াল করার বিষয়টি সামনে এলো, তাই তারা বুঝতে পারল, দলের নীতিমালা প্রণয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একজন স্বাধীন আমির বা প্রধান থাকা প্রয়োজন।

এ প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে অনেক দেন-দরবারের পর আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাবকে খারেজিরা তাদের আমির নির্বাচন করল।

এটি ৩৭ হিজরির ১০ শাওয়ালের ঘটনা।[৮৩]

আমির নির্বাচনের পর খারেজি সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঘোষণা করে বলা হলো, 'আমাদের মূল লক্ষ্য হবে রহমান-রহিম আল্লাহর প্রতি দুনিয়ার মানুষের আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করা। ...মানুষ আজ প্রবৃত্তির আনুগত্য করছে, আল্লাহর কিতাবের আদেশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সুতরাং এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য ফরজ। এখন তাদের মস্তক লক্ষ করে তরবারি চালাও। ...যদি তোমরা সফল হয়ে যাও এবং আল্লাহর আনুগত্য আরম্ভ হয়, তা হলে এটাই তোমাদের লক্ষ্য। আল্লাহ তোমাদেরকে মহাপ্রতিদানে ভূষিত করবেন। আর যদি তোমরা মৃত্যুবরণ করো, তা হলে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের চেয়ে অধিক মূল্যবান পুরস্কার আর কী হতে পারে?'

তারপর সিদ্ধান্ত হলো, মাদায়েনের নিকটে 'চুখা' নদীর তীরে সেনানিবাস নির্মাণ করা হবে। এরপর আশপাশের শহর ও গ্রাম থেকে জনশক্তি সঞ্চিত করে উন্মুক্ত ময়দানে ক্ষমতাসীন দলের মোকাবেলা করা হবে।[৮৪]

কুফা থেকে খারেজিদের গোপনে যাত্রা

খারেজিদের অধিকাংশ সদস্য বহু বছর যাবৎ কুফার বিভিন্ন মহল্লায় বসবাস করছিল। সুতরাং হঠাৎ করে একসাথে সবাই বেরিয়ে গেলে সরকারি ধরপাকড়ের পাশাপাশি আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকেও বাধা আসার আশংকা ছিল। তাই তারা একজন দুজন করে শহর থেকে

---

[৮৩] আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি : ২/৩৫৯, ৩৬০,

[৮৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৫৮০, ৫৮১

বেরিয়ে যেতে লাগল। সেই সাথে তারা অন্যান্য শহরেও এ মর্মে চিঠি পাঠিয়ে দিল যে, সত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগদান করো।[৮৫]

হজরত আলি থেকে পৃথক হওয়ার সময় যে খারেজিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮ হাজার, বাড়তে বাড়তে তাদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ১৬ হাজারে।[৮৬] আসলে এটা এমন এক ফেতনা ছিল, যার সম্মুখে কেবল ওইসব লোকই অবিচল থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন, যাদের অন্তরে পূর্বসূরিদের ব্যাপারে গভীর আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। অন্যথায় সে যুগের বড় বড় আবেদ ও জাহেদরাও খারেজিদের প্রতি ঝুঁকে পড়ছিল।

একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন তাবেয়ি, হজরত আবুল আলিয়া জিয়াদি রহ. বলেন, আমার উপর আল্লাহ তায়ালার দুটি নেয়ামত এমন আছে, যার ব্যাপারে আমি বুঝতে পারি না যে, কোনটি বড়। একটি হলো, আল্লাহ আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দান করেছেন। দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহ তায়ালা খারেজি হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন।[৮৭]

খারেজিদের রক্তপাত

খারেজিরা 'চুখা' নদীর তীরে সামরিক ছাউনি স্থাপন করল। তারপর আশপাশের জনবসতির উপর হামলা ও লুটতরাজের তুফান বইয়ে দিল। একদিকে তারা এত বেশি দরবেশ ছিল যে, কারো একটি দানাও অনুমতি ছাড়া ধরত না। অন্যদিকে তারা এমন নির্ভীক ছিল যে, যে তাদের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মতবিরোধ করত, তার রক্ত প্রবাহিত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করত না।[৮৮]

খারেজিদের হাতে আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব রা. কে হত্যার নির্মম ঘটনা

বসরার নিকটবর্তী একটি গ্রামে হজরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রা. এর পুত্র হজরত আবদুল্লাহ রহ. বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন আলেম ও

---

[৮৫] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৫৮১

[৮৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৫৭৮

[৮৭] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস : ১৮৬৬৭,

[৮৮] তারিখুত তাবারি : ৫/৭৬, ১৮২, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা নম্বর : ৩৭৮৮৭,

মর্যাদবান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। খারেজিরা তাকে আটক করল এবং অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় জানতে চইল- কে তুমি?

তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসুলের সাহাবি হজরত খাব্বাবের পুত্র আবদুল্লাহ।

খারেজিদের সরদার বলল, মনে হচ্ছে আমরা আপনার মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছি?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, সত্যিই।

খারেজিরা বলল, ভয়ের কিছু নেই, আপনি শুধু আমাদেরকে আল্লাহর রাসুলের কোনো হাদিস শুনিয়ে দিন, যা আপনি আপনার পিতা থেকে শুনেছেন।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আমার পিতার মুখে এ হাদিস শুনেছি যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এমন একটা ফেতনা আসছে, যাতে বসে থাকা ব্যক্তি উত্তম হবে দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে এবং দাঁড়ানো ব্যক্তি উত্তম হবে সক্রিয় ব্যক্তির চেয়ে। আর সক্রিয় ব্যক্তি দোজখের আগুনে জ্বলবে। যখন সেই ফেতনায় লিপ্ত লোকদের সম্মুখে পড়বে, তখন আল্লাহর নিহত বান্দা হয়ো, হত্যাকারী হয়ো না।[৮৯]

এ হাদিস শুনে খারেজিরা বলতে লাগল, হ্যাঁ, আমরা এ হাদিসটিই জানতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা, হজরত আবু বকর ও উমরের ব্যাপারে আপনি কী বলেন?

তিনি উত্তরে তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশংসামূলক বাক্য উচ্চারণ করলেন।

তারা বলল, আচ্ছা, হজরত উসমান রা. এর শাসনের প্রথমদিনগুলো ও শেষদিনগুলো সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?

হজরত আবদুল্লাহ ইবনুল খাব্বাব রা. উত্তরে বললেন, তিনি শুরুতেও সত্যের উপর ছিলেন, এবং শেষেও।

খারেজিরা বলল, আচ্ছা, আলির ব্যাপারে আপনি কী বলেন?

---

[৮৯] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস : ১৮৫৭৮,

তিনি বললেন, হজরত আলি দীন সম্পর্কে অধিক অবগত, দীনের ব্যাপারে তিনি অধিক সতর্ক এবং অধিক দীন বাস্তবায়নকারী।

একথা শুনে খারেজিরা ক্ষেপে উঠল। বলতে লাগল, আরে! তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছ। তুমি বিভিন্ন ব্যক্তির নামকে মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছ আর তাদের কাজগুলো উপেক্ষা করেছ। আল্লাহর কসম, আমরা তোমাকে এমনভাবে হত্যা করব, যেভাবে হয়তো আজ পর্যন্ত কাউকে হত্যা করা হয়নি।[৯০]

তারপর এ হতভাগারা তাকে এবং তার স্ত্রীকে নদীর তীর ধরে নিয়ে যেতে লাগল। পথিমধ্যে দুটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। যথা :

প্রথম ঘটনা

প্রথম ঘটনা এই যে, পার্শ্ববর্তী কোনো অমুসলিমের একটি শূকর ওই খারেজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এক খারেজি তরবারির এক আঘাতে সেটাকে মেরে ফেলল। এই দৃশ্য দেখে তারই সঙ্গের অপর খারেজি ক্রোধে অস্থির হয়ে বলতে লাগল, তুমি অমুসলিম অধিবাসীর শূকর হত্যা করলে কেন?[৯১]

শূকরের মালিক এলো। খারেজিরা শূকরের মূল্য দিয়ে আপদ বিদায় করল।[৯২]

এ ঘটনা দেখে হজরত আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব রা. এর মনে তাদের ব্যাপারে কিছুটা মানবতাবোধের আশা জাগ্রত হলো। তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলব, এ শূকরের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কী?

খারেজিরা বলল, কী?

তিনি বললেন, আমার জীবন। আমি কখনো নামাজ কাজা করিনি। কখনো কোনো গুনাহ করিনি।[৯৩]

---

[৯০] আল কামিল ফিত তারিখ : ৩৭ হিজরি, খারেজিদের হত্যার আলোচনা।

[৯১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা নম্বর : ৩৭৮৯৩,

[৯২] তারিখুত তাবারি : ৫/৮২,

[৯৩] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা নম্বর : ৩৭২৩,

খারেজিরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকল। একটু দূরে যাওয়ার পর নদীর তীরে একটি খেজুর গাছ দেখা গেল। আল্লাহর রাসুলের প্রিয় সাহাবির প্রিয় পুত্রকে সেই গাছের সাথে বেধে দেওয়া হলো। এমন সময় সেই গাছ থেকে ঝরে পড়া একটি খেজুর মুখে নিল। আর এটা দেখে আরেক খারেজি ক্ষুব্ধ হয়ে বলতে লাগল, তুমি জিম্মির খেজুর কেন মুখে দিলে? মূল্য না দিয়ে তুমি এটা কী করে হালাল মনে করলে? শেষে বাধ্য হয়ে প্রথম লোকটি মুখ থেকে খেজুর বের করে ফেলে দিল।[৯৪]

এদিকে গাছের সাথে. বাধা হজরত আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব রা. এই দৃশ্য দেখে বলতে লাগল, 'সত্যিই যদি তোমরা এমন পরহেজগার হয়ে থাক, যেমনটি আমি দেখলাম, তা হলে তোমাদের থেকে আমার আর কোনো ভয় নেই।

কিন্তু খারেজিদের ইচ্ছা পরিবর্তন হলো না। তারা আরো অগ্রসর হয়ে হজরত আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব রা. কে ধরে নদীর তীরে শুইয়ে জানোয়ারের মতো জবাই করে দিল। ফিনকি দিয়ে তার রক্তের ধারা নদীর বুকে ছিটকে পড়ল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত সেখানে রক্তের একটি বৃত্তের মতো হয়ে থাকল।

এরপর তারা হজরত আবদুল্লাহ বিন খাব্বাবের স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আরে, আমি তো একজন নারী?

কিন্তু সেই পাষণ্ডদের বুকে এতটুকু দয়া হলো না। নির্মমভাবে পেট চিড়ে তারা তাকে হত্যা করে ফেলল।

হজরত আবদুল্লাহ ও তার স্ত্রীর বয়ে যাওয়া রক্তে নদীর তীর লাল হয়ে গেল। পাষণ্ডরা তাদের লাশ আগুনে পুড়িয়ে ফেলল।

এদিকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা আবদুল কায়েস গোত্রের এক খারেজি এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলো। সে খারেজিদের দল ছেড়ে গোপনে পালিয়ে গেল এবং মানুষকে এ ঘটনা জানিয়ে দিল।[৯৫]

---

[৯৪] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা নম্বর : ৩৭২৩,

[৯৫] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: হাদিস : ১৮৫৭৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাদিস : ৩৭৮৯৬, তারিখুত তাবারি, ৫/ ৮১-৮২, লূত বিন ইয়াহয়া থেকে বর্ণিত, আল

খারেজিদের প্রতি শেষ সতর্কবার্তা

হজরত আলি রা. তখন পর্যন্ত খারেজিদের বিরুদ্ধে কঠিন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া থেকে এজন্য বিরত ছিলেন যে, কারো দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের বৈধ কারণ হতে পারে না। হজরত আলিকে যখন খারেজিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, 'ততক্ষণ পর্যন্ত এমন পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, যতক্ষণ তারা রক্তপাত, লুটপাট ও অরাজকতায় লিপ্ত হবে'।[৯৬]

কিন্তু এখন যেহেতু মুসলমানদের রক্তে বাস্তবেই খারেজিরা তাদের হাত রাঙাতে শুরু করেছে, তাই এ পথ থেকে তাদেরকে ফেরানোর জন্য সশস্ত্র ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু হজরত আলি রা. যুদ্ধ ঘোষণা করার পূর্বে খারেজিদের কাছে পয়গাম পাঠিয়ে মুসলমানদের রক্তপাত ঘটানোর অপরাধে অপরাধীদেরকে তার হাতে তুলে দিতে বললেন, যাতে তাদের থেকে কিসাস গ্রহণ করা যায়। কিন্তু খারেজিরা এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলল, 'এ হত্যাকাণ্ডে আমরা সবাই জড়িত, সবাই কী করে কিসাস দেব?

হজরত আলি রা. আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সকলে মিলে তাকে হত্যা করেছ?

উত্তর এলো, হ্যাঁ, অবশ্যই।

হজরত আলি রা. সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আল্লাহু আকবার'।

এরপর তিনি খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চূড়ান্ত ফয়সালা করলেন।[৯৭]

কামিল ফিত তারিখ, হিজরী: ৩৭, খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আলোচনা, উসদুল গাবাহ, ২/ ১০১, আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব এর জীবনী।

[৯৬] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: হাদিস : ১৮৫৭৪

[৯৭] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: হাদিস : ১৮৫৭৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাদিস : ৩৭৯২৩, ৩৭৮৯৩

এখানে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এক আবদুল্লাহ বিন খাব্বাবের প্রাণের বদলায় হজরত আলি রা. গোটা খারেজি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন; অথচ হজরত উসমান রা. এর জীবনের বদলায় বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত হলেন না কেন? যদি এক ব্যক্তির বদলায় পুরো জামাতকে হত্যা করা জায়েজ হয়ে যায়, তাহলে হজরত উসমানের হত্যাকাণ্ডে জড়িত পুরো দল এ শাস্তির উপযুক্ত। আর যদি এক ব্যক্তির বদলায় পুরো দলকে হত্যা করা নাজায়েজ থাকে,

খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান

হজরত আলি রা. শামের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, যেভাবেই হোক সেখানে একটি ইসলামি শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, যা শরিয়ত বাস্তবায়নে কঠোর এবং আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও সঠিক পথের অনুসারী। সুতরাং তাদের থেকে মন্দ কিছুর আশঙ্কা নেই।

পক্ষান্তরে খারেজিদের ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা তারা নিরপরাধ মানুষের রক্তপাত ঘটিয়ে নিজেদের জন্য অবকাশের সুযোগ শেষ করে দিয়েছিল। বাহ্যিক ইবাদত ও সাধনার পাশাপাশি তাদের পাশবতা ও হিংস্রতা দ্বারা ইসলামের সুনাম-সুখ্যাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল।

অন্যদিকে খারেজিদের মধ্যে হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী অনেক অপরাধীও মিশে ছিল। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত তাদের

তাহলে আবদুল্লাহ বিন খাব্বাবের বদলায় খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন কেন?

এর উত্তর, হজরত আলি রা.-সহ অধিকাংশ ফকিহর মত হচ্ছে, এক ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডে জড়িত এবং প্রাণনাশি আক্রমণকারী সকল অপরাধী কেসাসের উপযুক্ত। কিন্তু হজরত উসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রাহকারী দল ও খারেজিদের বিষয়ের মধ্যে একটি মৌলিক ও স্পষ্ট পার্থক্য ছিল। তা হলো, হজরত উসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীরা বন্দি হওয়ার পূর্বেই অস্ত্রসমপর্ণ করেছিল। আর আল্লাহ তায়ালা ইরাশাদ করেছেন,

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

-সুরা মায়েদা, আয়াত ৩৪

সুতরাং আল্লাহ তায়ালার এ বাণী অনুযায়ী তারা বিদ্রোহীর সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং আদালতের বিচারে নিরাপত্তার অধিকার লাভ করেছিল। আর যেহেতু তাদের অধিকাংশ সদস্য প্রাণনাশি হামলায় জড়িত ছিল না, তাই তাদের থেকে কেসাস নেওয়াও জায়েজ ছিল না।

পক্ষান্তরে খারেজিদের বিষয়টি ছিল ভিন্ন। তারা সকলেই অস্ত্র হাতে নিয়েছিল এবং লড়াই করার জন্য আগ্রহী ছিল। অতএব, তাদের অবস্থাটা নিম্নোক্ত আয়াতের বিধানের আওতাভুক্ত হয়েছিল, যেখানে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۔

যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধে লড়াই করে, এবং পৃথিবীতে অনাচার সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলিতে চড়ানো হবে, অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে, অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে। -সুরা মায়েদা, আয়াত ৩৩

এ কারণেই খারেজিদের বিরুদ্ধে লড়াই করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রস্তুত করার পরিবেশ হয়ে ওঠেনি। তাই আদালতের বিচার অনুযায়ী তাদের থেকে কিসাস গ্রহণ করাটা শরিয়তপরিপন্থি হতো। কিন্তু এখন সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের রক্ত হালাল করে দিয়েছিল।

একটি সংশয় ও তার নিরসন

কেউ কেউ সন্দেহ করছিল যে, এমন আবেদ ও জাহেদদের বিরুদ্ধে লড়াই করা জায়েজ হয় কী করে? অন্যদিকে যারা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসন সহ্য করতে পারছিল না, তাদের ভাবনা ছিল, হজরত আলি এক শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কেন এভাবে উপেক্ষা করছেন? কেন তিনি দ্রুত শামে হামলা করছেন না?

হজরত আলি রা. তার বিভিন্ন ভাষণে এজাতীয় সকল সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করেছেন। খারেজিদের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'এরা অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিত করেছে, মানুষের জীবন-জীবিকার উপর আক্রমণ চালিয়েছে; সুতরাং এরা তোমাদের কাছের শত্রু। এদেরকে আপন অবস্থায় রেখে যদি তোমরা অন্য কোনো শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে যাও, তা হলে আশঙ্কা আছে, এরা তোমাদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবে'।[৯৮]

এমনিভাবে হজরত আলি রা. খারেজিদের বাহ্যিক দরবেশির আবরণ বিদীর্ণ করে বলেন, 'আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল আত্মপ্রকাশ করবে, যাদের তেলাওয়াতের সামনে তোমাদের তেলাওয়াত কিছুই হবে না, যাদের নামাজের সম্মুখে তোমাদের নামাজ সম্পূর্ণ মূল্যহীন হবে, যাদের রোজার সম্মুখে তোমাদের রোজা একেবারেই তুচ্ছ মনে হবে। এরা কুরআন তেলাওয়াতের সময় কুরআনকে মনে করবে নিজেদের সম্পর্কে অবতীর্ণ। অথচ কুরআন হবে তাদের বিরুদ্ধে দলিল। তারা ইসলাম থেকে ঠিক সেভাবেই বের হয়ে যাবে, যেভাবে বেরিয়ে যায় তির লক্ষ্যভেদ করে'।[৯৯]

---

[৯৮] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৭০৬, সনদ সহিহ, সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫১৬, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, ১০/৫৯২

[৯৯] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫০৫,

হজরত আলি রা. আরো বলেন, আল্লাহর কসম, খারেজিদের বিরুদ্ধে লড়াইকারী সৈনিকরা যদি জানতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান থেকে তাদের জন্য কী কী সুসংবাদের ওয়াদা করা হয়েছে, তা হলে তারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে সামান্য পরিমাণেও পিছপা হবে না। একথা বলে হজরত আলি রা. আল্লাহর নবী থেকে শ্রুত এমন একটি বিশেষ নিদর্শন উল্লেখ করেন, যার দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, হাদিসে বর্ণিত নিদর্শন ও ইঙ্গিতগুলো দ্বারা এই খারেজিরাই উদ্দেশ্য। হজরত আলি হাদিসের শব্দ উচ্চারণ করে বলে, 'তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি থাকবে, যার বাহু থাকবে বটে; কিন্তু কব্জি থাকবে না। বাহুর অগ্রভাগে ওলানের মতো একটা বস্তু থাকবে, যাতে সাদা পশম উদ্গত হবে'।

এ হাদিস শুনিয়ে হজরত আলি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলেন, আল্লাহর কসম, আমি আশা করি, এরাই সেই দল। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নামে এগিয়ে চলো।[১০০]

খারেজিদের সঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বিতর্ক

এদিকে দেখতে দেখতে খারেজিদের দলে প্রায় ২৪ হাজার লোকের সমাগম হয়ে গিয়েছিল। হজরত আলি তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাদের সেনানিবাসে যাওয়ার জন্য হজরত আলির কাছে অনুমতি চাইলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের চেষ্টায় যদি খারেজিদের কিছু মানুষও পৃথক হয়ে যায়, তা হলে অবশিষ্টদের পরাজিত করা সহজ হয়ে যাবে।

হজরত আলি আশঙ্কা প্রকাশ বললেন, ভয় হয়, যদি তারা তোমার কোনো ক্ষতি করে বসে?[১০১]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বললেন, ইনশাআল্লাহ এমন কখনোই হবে না।

---

[১০০] সহিহ মুসলিম, বর্ণনা: ২৫১৬

[১০১] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: হাদিস : ১৮৬৭৮, সনদ সহিহ, আবদুর রাজ্জাকা সিকাহ, ইকরিমাহ বিন আম্মার সদূক তবে ভুল করেন, আবু যামিল আল হানাফি সাদুক।

তারপর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তার সর্বোত্তম পোশাক ইয়েমেনি চাদর পরিধান করেন। তারপর উত্তপ্ত দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে একদম একাকী খারেজিদের তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে চারদিকে দেখা যাচ্ছিল সেজদার নিদর্শনে উজ্জ্বল ললাটগুলো। খারেজিরা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে স্বাগত জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল এবং তার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইল। তিনি বললেন, আমি আপনাদের সম্মুখে আল্লাহর রাসুলের সাহাবির অবস্থান তুলে ধরার জন্য এসেছি। কারণ, অহি তাদের উপস্থিতিতেই অবতীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং তারাই এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন।

একথা শুনে খারেজিদের মধ্যে ফিসফিসানি শুরু হলো। কেউ বলছিল, তাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া যাবে না। আবার কেউ বলছিল, তার কথা অবশ্যই শোনা উচিত। একটু পর সবাই খামুশ হয়ে গেল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আচ্ছা, আমাকে বলুন তো, আল্লাহর রাসুলের চাচাতো ভাই এবং প্রিয় জামাতা হজরত আলি রা. এর মধ্যে আপনারা কী কী ভুল দেখতে পাচ্ছেন?

খারেজিরা বলল, তার ভুল তিনটি।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, সেগুলো কী?

তারা বলল, প্রথম ভুল এই যে, সে আল্লাহর দীনের বিষয়ে মানুষকে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, ان الحكم الا لله। একমাত্র আল্লাহর শাসনই চলবে।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. জিজ্ঞেস করলেন, দ্বিতীয় ভুল কী?

তারা বলল, আলি হজরত আয়েশা ও হজরত মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে বটে; কিন্তু কাউকে বন্দি করার অনুমতি দেয়নি এবং গনিমতের সম্পদও কুড়ানোর অনুমতি দেয়নি। অথচ যদি এই দুই প্রতিপক্ষ কাফের হয়ে থাকে, তা হলে তো তাদের প্রাণের মতো তাদের সম্পদ লুট করাও হালাল ছিল। আর যদি তারা ঈমানদার হয়ে থাকে, তা হলে আলির জন্য তাদের রক্ত প্রবাহিত করাও নাজায়েজ ছিল।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আর কিছু?

তারা বলল, আলি নিজের নাম থেকে আমিরুল মুমিনিন শব্দ কেন কেটে দিল?[১০২] সে যদি আমিরুল মুমিনিন না হয়ে থাকে, তা হলে তো আমিরুল কাফিরিন-ই হবে।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. তাদের তিনটি অভিযোগ শান্তচিত্তে শোনার পর বললেন, আচ্ছা, যদি আমি আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত থেকে আপনাদের সম্মুখে এমন কিছু কথা উপস্থাপন করি, যেগুলোকে আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না, তা হলে কি আপনারা আপনাদের মত থেকে সরে আসবেন?

তারা বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. প্রথম অভিযোগের উত্তর হিসেবে বললেন, আপনারা বলেছেন, আল্লাহর দীনের বিষয়ে বান্দাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি দেওয়া ভুল হয়েছে। তা হলে আমাকে বলুন তো, স্বয়ং আল্লাহই তো ইহরাম অবস্থায় স্থলভাগের শিকার ধরা সম্পর্কে কুরআনে বলেছেন,

---

[১০২] সিফফিনের যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে হজরত আলির রা. এর নামের সাথে 'আমিরুল মুমিনিন' লেখা হয়েছিল। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. এর আপত্তির কারণে সেটি মুছে দেওয়া হয়েছিল। কেননা হজরত আলির জন্য 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধি ব্যবহার করা শামিদের মতের পরিপন্থি ছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. এর আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হজরত আলি রা. চুক্তিপত্র থেকে আমিরুল মুমিনিন শব্দ কেটে দিয়েছিলেন।
হজরত আলির তরফ থেকে এভাবে উপাধী কেটে দেওয়ার প্রমাণ ছিল হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি। হজরত আলির স্মরণ ছিল, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কাফেররা সন্ধিপত্র থেকে 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' শব্দ কেটে দিয়ে 'মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ' লিখতে বাধ্য করেছিল। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তিরক্ষার খাতিরে কাফেরদের এ অন্যায় দাবিও মেনে নিয়েছিলেন। সেদিন হজরত আলিই ছিলেন লিপিকার। আল্লাহর নবী তাকে বলেছিলেন, 'আলি, এই শব্দটি মুছে দাও। হে আল্লাহ, আপনি জানেন, আমি আপনার সত্য রাসুল। আলি, তুমি এটি মুছে এভাবে লিখে দাও- 'এটি সেই চুক্তিপত্র, যাতে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সন্ধি করেছেন'। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৩১৮৭, তারিখুত তাবারি : ৫/৫৩, সনদ সহিহ)
ঠিক একইভাবে শান্তিরক্ষার খাতিরে হজরত আলি রা. হজরত মুয়াবিয়া রা. র আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তিপত্র থেকে 'আমিরুল মুমিনিন' শব্দ কেটে দিলেন, তখন খারেজিরা এভাবে অভিযোগ করে বসল যে, আলি ইবনে আবি তালেব তো নিজেই 'আমিরুল মুমিনিনে'র পদ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ

হে ঈমানদারগণ, ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকার ধরো না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জেনে-বুঝে শিকার হত্যা করে, তা হলে তার বদলা হবে নিহত প্রাণীর অনুরূপ, যার সিদ্ধান্ত করবে তোমাদের থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি (অর্থাৎ বদলাস্বরূপ কী এবং কতটুকু পরিমাণ দিতে হবে, তার সিদ্ধান্ত দেবে)।[১০৩]

এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَاۤ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۔

যদি তোমরা তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কা করো, তা হলে স্বামীর স্বজন থেকে একজন এবং স্ত্রীর স্বজন থেকে একজন সালিস প্রেরণ করো। এ দুই সালিস যদি চায় তা হলে আল্লাহ তায়ালা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঐক্য করে দেবেন।[১০৪]

এরপর হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এবার আমি আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে প্রশ্ন করি, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা এবং তাদের মধ্যে সন্ধি ও শান্তি রক্ষার গুরুত্ব বেশি, না একটি খরগোশের জীবনের গুরুত্ব বেশি, যার মূল্য চার দিরহাম হয়ে থাকে?

খারেজিরা বলল, আল্লাহর কসম, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা এবং তাদের মধ্যে সন্ধি ও শান্তি রক্ষার গুরুত্বই বেশি।

এভাবে প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের জীবন রক্ষার জন্য হজরত আলি রা. হজরত মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত সালিস নিযুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করে কোনো ভুল করেননি। তাই ইবনে আব্বাস রা. খারেজিদের থেকে মৌখিক সত্যায়ন আদায়ের জন্য প্রশ্ন করলেন, 'এবার বলুন, আমি কি আপনাদের প্রথম অভিযোগ দূর করতে পেরেছি?

---

[১০৩] সুরা মায়িদা, আয়াত ৯৫

[১০৪] সুরা নিসা, আয়াত ৩৫

তারা বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই পেরেছেন।

এরপর ইবনে আব্বাস রা. বললেন, বাকি রইল এ অভিযোগ যে, হজরত আলি রা. যুদ্ধ তো করেছেন; কিন্তু কাউকে বন্দি করেননি এবং গনিমত হিসেবে কারো সম্পদ লুট করেননি। আচ্ছা আপনারা বলুন তো, আপনারা কি আপনাদের সম্মানিত মাতা হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. কে বন্দি করবেন? তার ব্যাপারে সেসব বিষয় কি হালাল মনে করবেন, যা অন্য কোনো মহিলার ব্যাপারে মনে করেন? যদি আপনারা এমন মনে করে থাকেন, তা হলে তো আপনারা কাফের। কেননা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মায়েদেরকে।[১০৫]

আর যদি আপনারা বলেন, আমরা হজরত আয়েশাকে মা বলেই মানি না, তা হলেও আপনারা কুফুরিতে লিপ্ত হবেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা নিজে ইরশাদ করেছেন,

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ ۔

নবী তো ঈমানদারদের নিকট তাদের জীবনের চেয়েও অধিক উত্তম এবং নবীর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।[১০৬]

সুতরাং এখন আপনারা দুটি ভ্রান্তির মধ্যে আটকে পড়েছেন। যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন।

খারেজিরা নির্বাক হয়ে হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর এ অবাক-করা আলোচনা শুনছিল। হজরত ইবনে আব্বাস রা. আবার তাদের প্রশ্ন করলেন, আমি কি আপনাদের দ্বিতীয় অভিযোগও দূর করতে পেরেছি?

তারা বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই পেরেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, এখন বাকি রইল, সন্ধিপত্র থেকে হজরত আলি রা. এর নিজের নাম থেকে 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধি কেটে দেওয়ার অভিযোগ। তো লক্ষ করুন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু

---

[১০৫] সুরা নিসা, আয়াত ২৩
[১০৬] সুরা আহযাব, আয়াত ৬

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার সময় কুরাইশকে পারস্পরিক লিখিত চুক্তির দিকে আহ্বান জানালেন। তারপর সেই চুক্তিপত্রে এভাবে লিখতে বললেন- 'এটি সেই চুক্তিপত্র, যা করেছেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।' তখন কুরাইশরা বলতে লাগল, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসুল বলে মেনেই নিতাম, তা হলে কখনোই আপনাকে আল্লাহর ঘরে যেতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধও করতাম না। সুতরাং আপনি চুক্তিতে 'মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ' লিখতে বলুন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আলি, এখানে 'মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ' লিখে দাও।

তা হলে এবার আপনারা চিন্তা করুন, আল্লাহর নবী তো হজরত আলির চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ (আল্লাহর নবী যদি প্রতিপক্ষের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তিপত্র থেকে রাসুল পদের উপাধি মুছে দিতে পারেন, তা হলে হজরত আলি রা. খেলাফতের পদের উপাধি মুছে দিয়ে কী এমন গুনাহ করেছেন)!

এ দৃষ্টান্ত পেশ করে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. প্রশ্ন করেন, এবার বলুন, আমি আপনাদের তৃতীয় অভিযোগও দূর করতে পেরেছি?

খারেজিরা বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই পেরেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর এই প্রচেষ্টার ফলে অধিকাংশ খারেজি অনুতপ্ত হয়ে পড়েছিল। দেখতে দেখতে অল্প সময়ের মধ্যে তাদের সিংহভাগ মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল এবং ২০ হাজার সদস্য (যাদের অধিকাংশ পরে যোগ দিয়েছিল) সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। শুধু চার হাজার সদস্য পেছনে রয়ে গেল।[১০৭]

নিহরুওয়ানের যুদ্ধ

এরপর নিহরুওয়ানের খারেজি শিবিরে কেবল ওইসব খারেজিই রয়ে গিয়েছিল, যারা তাদের আকিদা-বিশ্বাসের জন্য জীবন দিতে ও জীবন নিতে প্রস্তুত ছিল। তারা তাদের নেতা আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব রাসেবির

---

[১০৭] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: হাদিস : ১৮৬৭৮, বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।

নেতৃত্বে তাঁবু থেকে বেরিয়ে নদীর উপর দিয়ে নির্মিত 'দিযাজান' নামক সেতুর কাছে এলো।[১০৮] খারেজিরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে, আর কোনো সংলাপ হবে না। এবার তরবারিই উভয় দলের ভাগ্যের ফয়সালা করবে।[১০৯] কিন্তু তা সত্ত্বেও হজরত আলি রা. একের পর এক তাদের কাছে দূত ও বার্তাবাহক পাঠিয়ে তাদেরকে বুঝানোর পূর্ণ চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই তারা কোনো কথা মানতে সম্মত হলো না। এমনকি শেষ পর্যন্ত হজরত আলি রা. এর দূতকেই তারা হত্যা করে ফেলল। তখন হজরত আলি তার বাহিনীকে আক্রমণ করার অনুমতি প্রদান করেন।[১১০]

উভয় দল যখন মুখোমুখি হয়, তখন আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব চিৎকার করে বলে, বর্শা ছুড়ে মারো, তরবারি উঁচু করো'।

এদিকে হজরত আলি রা. এর অশ্বারোহী বাহিনী বর্শা তাক করে খারেজিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খারেজিরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে লড়াই করে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের শক্তি ভেঙ্গে পড়ে। প্রায় সকল খারেজি সেখানেই নিহত হয়। হজরত আলির সঙ্গীদের থেকে কেবল দুজন শহিদ হন।[১১১]

নিহত খারেজিদের মধ্যে অনেকেই হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে মদিনায় গিয়ে হাঙ্গামা করেছিল। এদের কেউ কেউ ওই বিদ্রোহী ফেতনার মূল হোতা বলে গণ্য হতো। যেমনঃ হুরকুস বিন যুহাইর। ফলে এ যুদ্ধের মাধ্যমে হজরত আলি এই সৌভাগ্যও অর্জন করেন যে, তার তরবারি শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকেই নিহরুওয়ানের প্রান্তরে এমন বহু হতভাগার হিসাব শেষ করে দিয়েছিল, যারা হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

---

[১০৮] আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি, হাদিস : ৭৫১৭
ইমাম নববি রহ. ইমাম নাসায়ি রহ. এর বর্ণনার উদ্ধৃতিতে উক্ত সেতুর নাম دبرجان বলে উল্লেখ করেছেন। (দ্রষ্টব্য : শরহু সাহিহি মুসলিম লিন নাবাবি : ৭/১৭২); অথচ নাসায়ি শরিফে নামটি ديزجان লেখা আছে। এখন সঠিক কোনটি তা আল্লাহই ভালো জানেন।

[১০৯] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, বর্ণনা: ৩৭৮৯৮,

[১১০] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, বর্ণনা: ৩৭৯২৭

[১১১] সহিহ মুসলিম, বর্ণনা: ২৫১৬

অদ্ভুত আকৃতির ব্যক্তির অনুসন্ধান

যুদ্ধের হইচই থেমে যাওয়া মাত্র হজরত আলি রা. ঘোষণা করে দিলেন, 'হে লোকসকল, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন একটি দলের সংবাদ দিয়েছিলেন, যারা দীন থেকে সেভাবেই বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তির লক্ষ্যভেদ করে বেরিয়ে যায়। আর এ দলের একটি নিদর্শন বলেছেন এই যে, এদের মধ্যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ লোক থাকবে, যার হাতের অগ্রভাগ ওলানের মতো স্ফীত থাকবে। তোমরা তাকে খুঁজে বের করো। নিশ্চয় সে এদের মধ্যেই আছে'।[১১২]

হজরত আলি আরো বললেন, 'আল্লাহর নবী বলেছিলেন, এই লোকটা আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেই নিহত হবে'।[১১৩]

লোকেরা ওইরকম লোক তালাশ করল। কিন্তু কাউকে পেল না। তখন কতিপয় অজ্ঞ মুখের উপর বলে ফেলল, 'ইবনে আবু তালেব আমাদেরকে আমাদের ভাইদের ব্যাপারে ধোঁকা দিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের মেরেই ফেললাম'।[১১৪]

এ কথা শুনে হজরত আলি রা. কাঁদতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা আবার তাকে খোঁজো। আল্লাহর কসম, আমিও মিথ্যা বলিনি, আমাকেও মিথ্যা বলা হয়নি।'

লোকেরা আবার তালাশ করল; কিন্তু এমন কাউকে পাওয়া গেল না। অবশেষে হজরত আলি তার সাদা খচ্চরটি আনতে বললেন এবং নিজে সেই ব্যক্তিকে খোঁজ করতে লাগলেন'।[১১৫]

দেখা গেল, নদীর তীরে একটি গর্তের মধ্যে খেজুর গাছের নিচে লাশের স্তূপ পড়ে আছে। হজরত আলি রা. সেখানে গিয়ে নিজহাতে এক এক করে লাশ উলটে দেখতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে সেই অদ্ভুত আকৃতির ব্যক্তির লাশ বেরিয়ে এলো। তাকে দেখেই হজরত আলি

---

[১১২] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৬৭২,
[১১৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ: ১০/ ৬০৪
[১১৪] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, বর্ণনা: ৩৭৯১৪
[১১৫] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ: ১০/ ৬০৪

রা. চিৎকার করে বলে উঠলেন 'আল্লাহু আকবার'। তারপর বললেন, 'আল্লাহ এবং তার প্রিয় রাসুল সত্য বলেছেন'।[১১৬]

মানুষের মন থেকে সব সংশয় দূর হলো। সবাই এই লড়াইয়ের বিনিময়ে সাওয়াব ও প্রতিদানের ব্যাপারে নিশ্চিত হলো।[১১৭]

জঙ্গে জামাল, সিফফিন ও নিহরুওয়ানে লড়াইকারীদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য

জঙ্গে জামাল ও সিফফিনের বিপরীতে উক্ত যুদ্ধে হজরত আলি রা. স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমাদের নিহতরা জান্নাতি এবং তাদের নিহতরা জাহান্নামি হবে'।[১১৮]

পক্ষান্তরে সিফফিনের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন,

قتلانا وقتلاهم في الجنة

আমাদের নিহতরাও জান্নাতি, তাদের নিহতরাও জান্নাতি।[১১৯]

খারেজিদের বিরুদ্ধে উক্ত যুদ্ধটি হয়েছিল ৩৮ হিজরিতে।[১২০] সময়টি ছিল শীতের মৌসুম।[১২১] সহিহ বর্ণনা অনুযায়ী এ যুদ্ধের পর হজরত আলি রা. কুফায় ফিরে যান এবং ঘোষণা করে দেন যে, এ বছর আর কোনো অভিযান চালানো হবে না।[১২২]

---

[১১৬] আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানি, হাদিস : ১৫৩৭-৭৬৬৬

[১১৭] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, বর্ণনা: ৩৭৯১৪, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৬০২, সনদ সহিহ, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ: ১০/ ৬০২-৬০৪

[১১৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ: ১০/ ৬০৪

[১১৯] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, বর্ণনা: ৩৭৮৮০, সনদ হাসান।

[১২০] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৬৭

[১২১] وذالك في يوم شات (সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি, হাদিস : ৮৫১৭)
খ্রিষ্টাব্দ হিসেবে এ যুদ্ধের তারিখ ছিল ৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দ।

[১২২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, বর্ণনা: ৩৭৯১৪, সনদ সহিহ।
নোট : কোনো কোনো দুর্বল বর্ণনায় আছে, নিহরুওয়ানের যুদ্ধের পর হজরত আলি রা. শামে আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গীরা তাতে সম্মত হয়নি। কিন্তু উল্লিখিত সহিহ বর্ণনার আলোকে জানা গেল যে, খারেজিদের পরাজিত করার পরও হজরত আলির মনে শামিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোনো আগ্রহ ছিল না। সুতরাং উপরোক্ত দুর্বল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

হজরত আলি রা. এর ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতা

হজরত আলি রা. এর চিন্তা ও মানসিকতার ভারসাম্য এত উন্নত ছিল যে, খারেজিদের মতো রক্তপিপাসু দুশমনকেও তিনি কাফের বা মুনাফিক আখ্যা দেননি। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, এরা কি মুশরিক ছিল?

তিনি বললেন, শিরক থেকেই তো এরা পলায়ন করে এসেছিল।

আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তা হলে কি এদেরকে মুনাফিক মনে করা হবে?

তিনি বললেন, মুনাফিক তো খুব কমই আল্লাহর কথা স্মরণ করে (আর খারেজিরা তো জিকির ও ইবাদতের ক্ষেত্রে ছিল বিরল ব্যক্তি)।

আবার প্রশ্ন করা হলো, তা হলে এদেরকে কী মনে করা হবে?

তিনি বললেন, এরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছিল।[১২৩]

একইভাবে একবার কেউ খারেজিদের আলোচনাপ্রসঙ্গে তাদেরকে গালমন্দ করল। হজরত আলি রা. বললেন, 'এজাতীয় লোকদের গালি দিয়ো না। তবে হ্যাঁ, যদি তারা ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তা হলে তাদের সাথে লড়াই করো'।[১২৪]

ইরাক ও শাম উভয় অংশের অধিবাসীরাই ঈমানদার ও দীনদার

খারেজিদের বিরুদ্ধে হজরত আলি রা. এর পক্ষ থেকে উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করাটা মূলত তার সত্য ও বৈধ খলিফা হওয়ার একটি বড় প্রমাণ ছিল। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না, যতদিন পর্যন্ত দুজন মুসলমানের দুটি বিশাল বাহিনী পরস্পরে যুদ্ধ না করবে। উক্ত উভয় দলের অবস্থান একই পর্যায়ের হবে। এদের মধ্য থেকে একটি ভ্রান্ত দলের সৃষ্টি হবে, উক্ত দুই দলের মধ্যে যেটি সত্যের অধিক নিকটবর্তী, সেটি তাদেরকে হত্যা করবে'।[১২৫]

---

[১২৩] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, বর্ণনা: ৩৭৯৪২, সনদ হাসান।

[১২৪] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, বর্ণনা: ৩৭৯১৬

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, খারেজিদের বিদ্রোহকে ইজতিহাদি ভুল বলা যাবে না। বরং তাদের বিদ্রোহ ছিল স্পষ্ট ভ্রান্তি। কেননা ইজতিহাদি ভুল এমন মানুষদের বেলায় প্রযোজ্য হয়, যাদেরকে গোটা উম্মাহ ফকিহ ও মুজতাহিদের মর্যাদা প্রদান করে। আর

এ বর্ণনাটি একদিকে যেমন হজরত আলি ইবনে আবি তালেব রা. এর দলের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিতর্কিত বিষয়ে তাদের ইজতিহাদ সঠিক হওয়ার প্রমাণ বহন করে, তেমনি এর দ্বারা হজরত মুয়াবিয়া রা. ও তার দলের ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী হওয়াও প্রমাণিত হয়। কেননা বর্ণনায় উভয় দলকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ দীনদার হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য হজরত আলি রা. কে 'সত্যের অধিক নিকটবর্তী' বলে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থ এই দাঁড়াল যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দলও দীনদার ছিল।

এ হাদিস থেকে এও প্রকাশ পায় যে, হজরত আলি এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. এর উদ্দেশ্য একই ছিল। অর্থাৎ সত্য ও সঠিক বিষয়কে সমুন্নত করা। অবশ্য ফিকহি ও ইজতিহাদি মতবিরোধ এবং সন্ত্রাসীদের প্রোপাগান্ডার কারণে তারা উভয়ে একমত হতে পারেননি।

হজরত তালহা, হজরত যুবাইর, হজরত আয়েশা, হজরত মুয়াবিয়া রা. নিঃসন্দেহে এ স্তরের ব্যক্তি ছিলেন। পক্ষান্তরে খারেজিরা ছিল সম্পূর্ণ বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন এবং বক্র মেজাজের মানুষ।

১২৫

تمرق مارقة عند فئة المسلمين يقتلها اولى الطائفتين بالحق. (صحيح مسلم: ح: ٢٥٠٧.
سنن ابی داؤد، ح: ٤٦٦٧)

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة. تمرق بينهما مارقة. يقتلها اولى الطائفتين بالحق. (مصنف عبد الرزاق، ح: ١٨٦٥٨. ط المجلس العلمی باکستان)

মুহাদ্দিসগণ এসব হাদিসকে সিফফিনের লড়াই এবং খারেজিদের লড়াই শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন। ব্যাখ্যাকারগণ এর মর্ম এই বর্ণনা করেছেন যে, সিফফিনের যুদ্ধে উভয় দল ঈমানদার ছিল এবং উভয় দলই মুজতাহিদ ছিল। অবশ্য সেই ইজতিহাদে সঠিক ও ভুলের পার্থক্য অবশ্যই ছিল।

আকিদা-বিশ্বাস সংশোধন

খারেজিদের দমন করার পর হজরত আলি রা. কুফায় আগমন করেন। তারপর জীবনের অবশিষ্ট দুটি বছর তিনি সেখানেই কাটান। এ সময় তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল উম্মাহর ঈমান ও বিশ্বাস, ইলম ও চর্চা এবং আখলাক ও চরিত্র বিনির্মাণ করা।

এক্ষেত্রে হজরত আলি রা. সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন ওই সকল অজ্ঞ বন্ধুর প্রতি, যারা আবদুল্লাহ বিন সাবার ষড়যন্ত্রে প্রভাবিত হয়ে সিরাতে মুসতাকিম থেকে সরে যাচ্ছিল। এরা হজরত আলির ব্যাপারে অতিরঞ্জন কথাবার্তা বলত। হজরত আলিকে গোটা মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং নবীদের মতো নিষ্পাপ মনে করত। এমনকি কেউ কেউ তো তাকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করতে শুরু করেছিল। ইবনে সাবা ব্যাপকভাবে প্রচার করে দিয়েছিল, হজরত আলি আল্লাহর রাসুলের স্থলাভিষিক্ত। পরবর্তীতে এটাই শিয়াদের বারো ইমামের আকিদায় পরিণত হয়েছে। এ আকিদা অনুযায়ী হজরত আলিই নবীর স্থলাভিষিক্ত, উত্তরাধিকার ও বৈধ শাসক ছিলেন। হজরত আলির পরে নেতৃত্ব ও শাসন পরিচালনা তার বংশধরদের মধ্যেই হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং অন্যান্য খলিফা সকলেই ছিলেন ক্ষমতা দখলকারী।

আল্লাহর নবীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার আকিদা খণ্ডন

হজরত আলি রা. এ ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডন করে একবার ইরশাদ করেন, 'লোকসকল, আল্লাহর নবী এই শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আমাকে কোনো অসিয়ত করে যাননি। বরং আমরাই স্বেচ্ছায় হজরত আবু বকরকে খলিফা বানিয়েছি। তিনি সঠিক পথে চলেছেন এবং দীনের উপর অবিচল ছিলেন। তারপর তিনি নিজের মত অনুসারে হজরত উমর ফারুক রা. কে খলিফা নিযুক্ত করেছেন। তিনিও দীনের উপর অবিচল থেকে সরল পথে

চলেছেন। ফলে ইসলামের ভূয়সী কল্যাণ ও ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। কিন্তু তারপর এমন এমন লোক এসেছে, যারা দুনিয়ার স্বার্থ অন্বেষণকারী ছিল'।[১২৬]

আরেকবার তিনি ইরশাদ করেন, 'একদা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন, তোমার একটি বিষয় ঈসা ইবনে মারয়ামের মতো। ইহুদিরা ঈসার সঙ্গে এত বিদ্বেষ পোষণ করেছে যে, তার মায়ের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে। অন্যদিকে খ্রিষ্টানরা তাকে এত ভক্তি করেছে যে, যে মর্যাদা তার ছিল না, তা তাকে প্রদান করেছে (অর্থাৎ তাকে খোদার পুত্র বলেছে)।

এ হাদিস শুনিয়ে হজরত আলি রা. বলেন, হে লোকেরা, মনোযোগ দিয়ে শোন, আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কারণে দুই ধরনের মানুষ গোমরাহ হবে। প্রথমত, যারা ভক্তি ও প্রশংসা করে আমার এমন এমন গুণ ও স্তুতি বর্ণনা করবে, যা আমার জন্য সঠিক নয়। আর দ্বিতীয়ত, যারা শত্রুতাবশত আমার নামে নানা রকম অভিযোগ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

মনে রেখো, আমি নবীও নই, আমার কাছে অহিও আসে না। আমি তো শুধু আমার সাধ্যমতো কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী আমল করি। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য বজায় রেখে আমি তোমাদেরকে যে আদেশ করব, তা পালন করা তোমাদের জন্য জরুরি। তোমাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক'।[১২৭]

হজরত আলির কাছে বিশেষ ইলমের আকিদা খণ্ডন

অজ্ঞ ভক্তদের মধ্যে এ ধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, হজরত আলির কাছে অহি থেকে অর্জিত এমন কিছু ইলম আছে, যা দুনিয়াতে আর কাউকে দেওয়া হয়নি। হজরত আলি এ আকিদাও খণ্ডন করে বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমার কাছে কুরআন ও হাদিসের এই কপি ছাড়া কিছুই নেই, যা আমি তোমাদের পড়ে শোনাই'।[১২৮]

---

[১২৬] দালাইলুন নুবুওয়াহ লিল বাইহাকি : ৭/ ২২৩

[১২৭] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৩৭৭

[১২৮] والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم الا كتاب الله وهذه الصحيفة. (مسند احمد، ح: ٧٨٢ باسناد صحيح)

হজরত আবু বকর ও উমরের সাথে বিরোধের আকিদা খণ্ডন

সাবায়িরা প্রচার করে দিয়েছিল, হজরত আলি রা. ছিলেন হজরত আবু বকর ও উমরের বিরোধী। হজরত আলি এ ভ্রান্ত আকিদা সম্পর্কে তার অন্তরের ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করে বলেন, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঐসকল মহান ব্যক্তি সম্পর্কে আমার অন্তরে ভালো ধারণা ছাড়া আর কিছু পোষণ করা থেকে'।[১২৯]

শুধু তা-ই নয়, তিনি আরো বলেন, 'খবরদার, আমি যদি জানতে পারি যে, হজরত আবু বকর ও উমরের চেয়ে কেউ আমাকে অধিক মর্যাদা প্রদান করছে, তা হলে আমি তাকে সেই পরিমাণ চাবুক লাগাবো, যা লাগানো হয় মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীকে (অর্থাৎ আশি চাবুক, যা মিথ্যা অপবাদের নির্ধারিত শাস্তি)।[১৩০]

আবদুল্লাহ বিন সাবার বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ

মন্দ আকিদা প্রচার করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল আবদুল্লাহ বিন সাবার। কিন্তু এই ধূর্ত লোকটি কোথাও নিজের কোনো প্রমাণ রাখত না। একবার হজরত আলি সাক্ষী পেয়ে গেলেন যে, সে হজরত আবু বকর ও উমর রা. কে গালমন্দ করছে। তিনি তাকে ডেকে এনে হত্যা করে ফেলতে চাইলেন। কিন্তু একান্ত ঘনিষ্ঠরা ক্ষমা করে দেওয়ার পরামর্শ দিল। হজরত আলি বললেন, 'ঠিক আছে, তবে আমি যেখানে থাকবো, সে যেন সেখানে না থাকতে পারে'।[১৩১]

আবদুল্লাহ বিন সাবার গোমর ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। তাই সে চাইল, কোনো দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পূর্বে কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলবে। বিভিন্ন ইঙ্গিত থেকে জানা যায়, সে তার কিছু মুরিদকে এই পরিমাণ বিভ্রান্ত করেছিল যে, তারা হজরত আলিকে খোদা, সৃষ্টিকর্তা সর্বময়ক্ষমতার অধিকারী জ্ঞান করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং এ আকিদার ঘোষণা দিয়ে নিহত হয়ে যাওয়াকে শ্রেষ্ঠ শাহাদাত মনে করতে শুরু করেছিল।

এরই ধারাবাহিকতায় একদিন হজরত আলি মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করছিলেন। হঠাৎ আবদুল্লাহ বিন সাবা দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে

---

[১২৯] লিসানুল মিযান: ৩/ ২৯০

[১৩০] لا اجد احدا يفضلنى على ابى بكر وعمر الا جلدته حد المفترى. (تاريخ دمشق: ٣٨٣/٣٠)

[১৩১] তারিখে দিমাশক : ২৯/ ৯, আবদুল্লাহ বিন সাবার জীবনী।

লাগল, হে মহান নেতা, আপনি দাব্বাতুল আরদ (অর্থাৎ কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শনস্বরূপ প্রকাশিত এক বিশেষ প্রাণী)।

হজরত আলি রা. কোনো উত্তর দিলেন না। তখন সে আবার বলল, হুজুর, আপনি বাদশাহ।

এবার হজরত আলি বিরক্ত হয়ে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো।

কিন্তু আবদুল্লাহ বিন সাবা থামল না। সে চিৎকার করে বলতেই থাকল, আপনিই সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন। আপনিই রিজিক বণ্টন করেন।

হজরত আলি আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি আদেশ করলেন, একে ধরে হত্যা করো। কিন্তু ওই মজলিসে উপস্থিত ইবনে সাবার মুরিদরা হাঙ্গামা করতে শুরু করল। তখন হজরত আলির একান্ত সঙ্গীরা বললেন, আপনি যদি একে এই শহরের জনবহুল পরিবেশে হত্যা করেন, তা হলে তার ভক্তরা বিদ্রোহ করে বসবে'।

এ কথা শুনে হজরত আলি বললেন, লোকসকল, তোমরা কি দেখছ না, এই কালো কৃষ্ণাঙ্গ লোকটাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হচ্ছি। কেননা সে আল্লাহ এবং তার প্রিয় রাসুলের নামে মিথ্যাচার করেছে। যদি আমার আশঙ্কা না হতো যে, একটা চক্র তার কিসাসের দাবি নিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে, তা হলে আমি এজাতীয় লোকদের (লাশের) স্তূপ করে ফেলতাম'।

এই ঘোষণা ও বক্তব্যের পর হজরত আলি রা. আবদুল্লাহ ইবনে সাবাকে শহর থেকে বহিষ্কার করার আদেশ দেন। তাই তাকে মাদায়েন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[১৩২]

প্রকাশ্যে কুফুরিতে লিপ্ত সাবায়িদের মৃত্যুদণ্ড

এই ঘটনার কিছুদিন পর ইবনে সাবার কিছু সাঙ্গপাঙ্গ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকে। হজরত আলি রা. তাদের ডেকে কঠোর ভাষায় শাসন করেন। শেষে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের নাশ হোক, তোমরা চাওটা কী?

তারা বলল, আপনি আমাদের প্রভু। আপনি আমাদের স্রষ্টা ও রিজিকদাতা।

---

[১৩২] সনদ হাসান, তারিখে দিমাশক : ২৯/ ৭-৫, আবদুল্লাহ বিন সাবার জীবনী।

হজরত আলি বললেন, চুপ করো। আমি আলি ইবনে আবু তালেব। আমার মাতা ও পিতা দুজনই পরিচিত। আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই।

কিন্তু ইবনে সাবার চেলারা কিছুই শুনল না। তারা একই কথা আওড়াতে লাগল।

হজরত আলি বললেন, তোমাদের নাশ হোক। আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমাদের মতোই পানাহার করি। আমি যদি আল্লাহর আনুগত্য করি, তা হলে তিনি চাইলে আমাকে সাওয়াব দান করবেন। আর যদি তার অবাধ্য হই, তা হলে আমি তার আজাবের ভয় করি। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ফিরে আসো।

কিন্তু এসব উপদেশ কোনো কাজেই এলো না। হজরত আলি রা. তাদেরকে আরো দুইদিন সময় দিলেন। কিন্তু তারা তাতেও ফিরল না। তখন তিনি বললেন, এবার আমি তোমাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট উপায়ে হত্যা করব।

এ কথা বলে তিনি কুফার জামে মসজিদ ও তার বাসভবনের মাঝে একটি গভীর গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালানোর আদেশ দেন। তারপর ওই মুরতাদদেরকে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়।[১৩৩]

এভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে হজরত আলি রা. চেয়েছিলেন বান্দাকে খোদা ও উপাস্য বানিয়ে দেওয়ার এই জঘন্য ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিতে। এটি ছিল তার ইজতিহাদি সিদ্ধান্ত এবং এক্ষেত্রে তিনি আপন স্থানে সঠিক ছিলেন।[১৩৪]

---

[১৩৩] তারিখে দিমাশক : ২৯/ ৭-৫, আবদুল্লাহ বিন সাবার জীবনী, সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৯২২, কিতাবু ইসতিতাবাতিল মুরতাদ্দীন,

قال ابن حجر فى شرحه: "ان عليا حرق قوما هم السبئية اتباع عبد الله بن سبا وكانوا يزعمون ان عليا ربهم." (فتح البارى: ١/٢٩١، ٢٩٢)

[১৩৪] হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. র ইজতিহাদ অনুযায়ী শাস্তির উক্ত পদ্ধতি সঠিক ছিল না। কেননা আল্লাহর নবী ইরশাদ করেছেন-

لا تعذبوا بعذاب الله.

তোমরা আল্লাহর শাস্তি দ্বারা শাস্তি দিয়ো না। -সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৯২২

এমনিভাবে একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় কাফেরকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণে তাদেরকে শুধু হত্যার আদেশ দেন

শিরকি ও বিদআতি প্রথার মূলোৎপাটন

হজরত আলি রা. শিরক ও বিদআত এবং দৃষ্টিভঙ্গির বক্রতার যত পথ হতে পারে, সব বন্ধ করার জন্য ওয়াজ-নসিহত ও উপদেশ প্রদানের ধারা চালু করেন। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

- কতিপয় অজ্ঞ লোক নতুন করে কবর উঁচু করার প্রথা চালু করেছিল। হজরত আলি শিরক ও বিদআতের শেকড় উপড়ে ফেলার জন্য এ প্রথা নিষিদ্ধ করেন।

- এমনিভাবে একবার জানা গেল কিছু লোক পৌত্তলিক হয়ে গেছে; অথচ তারা মুসলমান বলে দাবি করত এবং মুসলমানদের যাবতীয় অধিকার ভোগ করত। কিন্তু গোপনে, নিজেদের ঘরে তারা মূর্তিপূজা করত।

  হজরত আলি রা. এ খবর জানতে পেরে আবুল হাইয়াজ আসাদি রহ. এবং আরো কতিপয় সঙ্গীকে এ বিষয়ে তদারকি করার আদেশ দিয়ে বলেন, 'আমি তোমাদের হাতে সেই কাজ ন্যস্ত করছি, যা আল্লাহর রাসুল আমার হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। তা হলো, যেকোনো মূর্তি দেখলে ভেঙ্গে ফেলবে। যেকেনো উঁচু কবর দেখলে মাটির সমান করে দেবে'।[১৩৫]

  এভাবে মূর্তি-প্রতিমা গুঁড়িয়ে দিয়ে এবং উঁচু কবর সমান করে শিরকের সকল দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করা হলো।

- একইভাবে যার মূর্তিপূজা করত, তাদেরকেও বন্দি করা হলো। যখন তারা তাওবা করে ফিরে আসতে চাইল না, তখন তাদেরকে হত্যা করা হলো।[১৩৬]

এবং বলেন, 'আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া আল্লাহর জন্য শোভা পায়'। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩০১৬)
তবে আল্লামা আইনি রহ. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, হজরত আবু বকর, উমরসহ কয়েকজন সাহাবির মত হজরত আলির মতোই ছিল। এর ভিত্তিতে আল্লামা আইনি বলেছেন, উপরের হাদিসে আল্লাহর নবীর নিষেধাজ্ঞাটি 'তানযিহি' বলে ধরা হবে। (উমদাতুল কারি : ১৪/২৬৪) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এর অভিমত এটাই ছিল। (ফাতহুল বারি : ১২/২৭১)

[১৩৫] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২২৮৭।

[১৩৬] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা নম্বর : ২৯০০৩, ৩৩১৫৩

আপনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

হজরত আলি রা. এর বাহিনীতে এবং তার আশপাশে সমবেত-হওয়া নেতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ইরাক ও পারস্যের অধিবাসী, যদিও তাদের মধ্যে নেককার, বীর, পরোপকারী ব্যক্তিরাও ছিল; কিন্তু শামের বাসিন্দাদের সাথে লাগাতার যুদ্ধের কারণে তারা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তাদের অনেকেই নিজ অঞ্চলের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বও এড়িয়ে চলতে শুরু করেছিল।

এর বিপরীতে কিছু মানুষ ছিল সীমাহীন কঠোর মেজাজের। হজরত আলির যেসব কাজে কিছুটা সহনশীলতা ও রক্ষণশীলতা থাকত, এরা তাকে বেদীনি এবং মুনাফিকি বলে ব্যক্ত করত। এই কট্টর মানসিকতার কারণেই মূলত খারেজি ও সাবায়িরা মাথাচাড়া দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

হজরত আলির কিছু ভাষণ ও বাণী থেকে এমন লোকদের প্রতি চরম ঘৃণা ও অনীহা প্রকাশ পায়, যারা মুখে বড় বড় কথা বলে নবী-পরিবারের প্রতি সীমাহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করত, কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা আনুগত্য দেখাতে এবং হজরত আলির কর্মপন্থার উপর ভরসা করতে প্রস্তুত ছিল না। হজরত আলি চাইলে তাদের উপর কঠোরতা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি শরিয়তের প্রতি লক্ষ রেখে কিছুই বলেননি। তিনি বলতেন, আমি খুব ভালো করে জানি, কীভাবে তোমাদের সোজা করতে হয়। কিন্তু আল্লাহর কসম, তোমাদেরকে সোজা করতে গিয়ে আমি নিজেকে নষ্ট করতে চাই না'।[১৩৭]

তিনি আরো বলতেন, 'মানুষ তাদের শাসকের জুলুমের ভয় করে। আর আমার অবস্থা হলো, আমি আমার জনগণের জুলুমের ভয় করি'।[১৩৮]

১৩৭

وانى لعالم بما يصلحكم ويقيم اودكم، ولكنى لا أرى اصلاحكم بافساد نفسى. (نهج البلاغة: ١/٥٤، المطبعة الادبية، بيروت)

১৩৮

الامم تخاف ظلم رعاتها واصبحت اخاف ظلم رعيتى. (نهج البلاغة: ١/٩١، المطبعة الادبية، بيروت ١٨٨٥ع)

৩৯ হিজরিতে যখন শামের লোকেরা সীমান্তে আক্রমণ করেছিল, তখন হজরত আলি রা. মানুষকে সীমান্ত রক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেটি তার সে সময়কার অনুভূতির স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি বহন করে। সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'হে কুফাবাসী, তোমরা যখন শুনতে পাও, শামের কোনো বাহিনী আক্রমণ করে তোমাদের কোনো শহরের পথ বন্ধ করে দিয়েছে, তখন ভয়ে তোমরা ঠিক সেভাবেই নিজের ঘরে মাথা লুকিয়ে থাকো, যেভাবে গুইসাপ বিপদের সময় তার গর্তে লুকিয়ে থাকে। সত্যিই সেই ব্যক্তি ধোঁকায় পড়ে আছে, যাকে তোমরা ধোঁকা দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের মাধ্যমে সফলতা পেতে চায়, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোনো ব্যক্তি ভাঙ্গা তির দিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে চায়। তোমাদের মধ্যে এমন স্বাধীন ব্যক্তি নেই, যে কারো আহাজারি শুনবে। এমন নির্ভরযোগ্য ভাইও নেই, যার সাহায্যের প্রতি ভরসা করা যায়'।[১৩৯]

মতবিরোধকে ঘৃণা

হজরত আলি রা. এর তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, উম্মাহ আবার একতাবদ্ধ এবং এক মত ও পথের দিশারি হয়ে যাক। মুসলমানরা সব ধরনের মতপার্থক্য থেকে সুরক্ষিত থাকুক। একারণে তিনি চেষ্টা করতেন, যথাসম্ভব এমন কথা বলতে, যাতে সকলেই একমত হতে পারে। একান্ত নিরুপায় ও অপারগ না হলে তিনি মতবিরোধ করতেন না। বরং অন্যদেরকে তাদের ইজতিহাদি মতের উপর চলার সুযোগ দিতেন।

পূর্ববর্তী তিন খলিফার অনুসরণকে তিনি মুক্তির উপায় মনে করতেন। ফিকহ ও ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের লক্ষ করে হজরত আলি বলতেন, 'তোমরা আগে যেমন ফয়সালা করতে, সেভাবেই করতে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ একটি বিষয়ের উপর একমত না হবে কিংবা আমি আমার পূর্ববর্তী বন্ধুদের মতো মৃত্যুবরণ না করবো'।[১৪০]

---

[১৩৯] তারিখুত তাবারি, ৫/১৩৪; ৩৯; হিজরি সন।

[১৪০]

عن عبيدة عن على رضـ اقضوا كما كنتم تقضون. فانى اكره الاختلاف. حتى يكون للناس جماعة او اموت كما مات اصحابى. (صحيح البخارى، ح: ٣٧٠٧. كتاب المناقب. باب مناقب على رضـ)

দেশকে সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ ও বিজয়াভিযান

সাধারণত ঐতিহাসিকদের বক্তব্য থেকে মনে হয়, হজরত আলি রা. এর গোটা শাসনামলটি ছিল দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং ফেতনা-ফাসাদে ভরপুর। সর্বদিকে বিরাজমান ছিল নিরাপত্তাহীনতা আর ভয়। অথচ এটি সম্পূর্ণ সঠিক চিত্র নয়। একথা সত্য যে, হজরত আলির যুগে মুসলিমবিশ্ব অভ্যন্তরীণভাবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার শিকার হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ অবস্থা ছিল শান্ত ও নিরাপদ।

হজরত আলি রা. এর যুগে বড় হঙ্গামা হয়েছে মোট তিনটি। যার প্রত্যেকটিতেই হজরত আলি নিজে অংশগ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফফিন, জঙ্গে নিহরুওয়ান।

জঙ্গে জামাল ছিল একটি সাময়িক হাঙ্গামা। এ যুদ্ধের সফরে হয়তো দেড়-দুই মাস ব্যয় হয়েছিল। কেননা লড়াইটা ছিল দুর্ঘটনাবশত। ফলে তা একদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সিফফিনের অভিযানে মোট চার মাস সময় ব্যয় হয়েছিল। আর নিহরুওয়ানের অভিযানে ব্যয় হয়েছিল কয়েকদিন। এ যুদ্ধে সময় লেগেছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

মোটকথা, উপরোক্ত তিন অভিযানের সময় ছাড়া হজরত আলির যুগে সাধারণ অবস্থা স্বাভাবিক নিয়মেই চলেছিল। এমন ছিল না যে, দস্যুরা দিনরাত কাফেলা লুট করছে, বহিরাগত হামলাকারীরা সর্বদা সীমান্ত দখল করছে, দেশের মানুষ ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

পূর্ববর্তী খোলাফায়ে রাশেদিনের মতো হজরত আলির যুগেও সীমান্তপ্রহরা হয়েছে, তাগুতি কুফুরি শক্তিগুলোর আক্রমণ প্রতিহত করা হয়েছে, বিজিত এলাকাগুলোতে জেগে-ওঠা বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে।

সেই সাথে ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের ধারাও অব্যাহত ছিল। এটা ভিন্ন কথা যে, অন্যান্য ঘটনার হইচইয়ের কারণে এ ইতিবাচক দিকগুলো দৃষ্টিগোচর হয়নি।

ইসলামি সাম্রাজ্য দুটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পরও হজরত আলি রা. ইয়েমেন, হিজাজ, ইরাক, ইরান, খোরাসান ও পূর্বদিকের বিশাল এলাকাজুড়ে শাসন পরিচালনা করেছেন এবং নিজস্ব ভাবমূর্তি ও গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছেন।[১৪১]

হজরত আলি রা. এর অধীন প্রাদেশিক গভর্নর

শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে হজরত আলি রা. কয়েকজন মহান ব্যক্তির সহযোগিতা দ্বারা বেশ উপকৃত হয়েছেন। তারা হলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এবং তারই আপন ভাই হজরত উবাইদুল্লাহ ও হজরত কুসাম বিন আব্বাস রা.।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. ছিলেন কুফার গর্ভনর।

হজরত উবাইদুল্লাহ রা. ছিলেন ইয়েমেনের গভর্নর।

হজরত কুসাম রা. ছিলেন হিজাজের গভর্নর।

এ ছাড়া খোরাসানের বিশাল এলাকার দায়িত্ব ছিল হজরত আবদুর রহমান বিন আবজা রা. এর হাতে।[১৪২]

এরা ছাড়াও বহু নামি-দামি সাহাবি ও অসংখ্য তাবেয়ি হজরত আলির অধীনে থেকে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

---

[১৪১] এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, কোনো লেখক যাচাই-বাছাই ছাড়াই লিখে দিয়েছে যে, হজরত আলি রা. এর শাসনামলের শেষদিকে তার হাতে কেবল কুফা ও তার আশপাশের এলাকা ছিল। অন্য সব হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।
অথচ এটা সর্বজনস্বীকৃত ইতিহাসের বাস্তবতা পরিপন্থি দাবি। কেননা শাম ও মিসর হাতছাড়া হলেও হিজাজ, ইয়েমেন, ইরাক, আলজাযিরা, ইরান, খোরাসান ও বেলুচিস্তান ছিল হজরত আলির হাতে। আর এগুলোই ছিল তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ এলাকা। হাদিস ও ইতিহাসের গ্রন্থাদির দিকে লক্ষ করলে, বিশেষ করে প্রাদেশিক গভর্নরদের তালিকার প্রতি লক্ষ করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটাই সত্য। এ কথা অস্বীকারের কোনো দলিল নেই। এ বিষয়ক দলিল-প্রমাণ যথাস্থানে আসবে।

[১৪২] তারিখুত তাবারি : ৫/১৩২

পারস্য, কেরমান ও পার্বত্য অঞ্চলের অভিযান

হজরত আলির জন্য জীবন উৎসর্গকারীদের মধ্যে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বৈমাত্রেয় ভাই জিয়াদের নামও ছিল। শামবাসীদের সাথে হজরত আলির মতবিরোধ চলাকালে একবার পারস্য ও কেরমানের লোকেরা খারাজ পরিশোধ বন্ধ করে দিল। তখন হজরত আলির আদেশে জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান ৪ হাজার সৈনিক নিয়ে এদের বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়ে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনেন। একইভাবে পার্বত্য এলাকার কতিপয় গোত্র চুক্তির পরিপন্থি কাজ করেছিল এবং খারাজ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তখন হজরত আলির আদেশে বসরার শাসক হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. গিয়ে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন।[১৪৩]

মার্ভের অভিযান

জঙ্গে জামালের চার মাস পরে (৩৬ হিজরিতে) মার্ভের পারস্য বংশোদ্ভূত শাসক 'মাহওয়াইহ' হজরত আলি রা. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার বিশ্বস্ততার কথা জানায় এবং তার এলাকার শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব প্রার্থনা করে। হজরত আলি রা. তখন সেই এলাকার গ্রাম্য সরদার ও দস্যুদের নামে চিঠি লিখে মাহওয়াইহকে পাঠিয়ে দেন। সে চিঠিতে লেখা ছিল, মাহওয়াইহকে ইসলামি খেলাফতের পক্ষ থেকে তাদের শাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

কিছুদিন পর মার্ভের লোকেরা বিদ্রোহ করে। তখন হজরত আলি রা. খুলাইদ বিন কুর্‌রা (ইবনে তুরাইফ ইয়ারবুই)-কে ওই এলাকায় পাঠান। সে গিয়ে সেখানকার বিদ্রোহ দমন করে এবং লোকদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে।[১৪৪]

নিশাপুরের অভিযান

হজরত আলি রা. জঙ্গে সিফফিন থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পর (৩৭ হিজরিতে) অগ্নিপূজকরা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। কেননা কিসরার বংশের এক শাহজাদি কাবুল থেকে নিশাপুরে এসেছিল। নিশাপুর ছিল খোরাসানের গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর। অগ্নিপূজকরা

---

[১৪৩] তারিখুত তাবারি : ৫/১৩৭-১৩৮

[১৪৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৫৮

শাহজাদির সঙ্গে নিশাপুরের আশপাশে একত্রিত হলো। হজরত আলির সেনাপতি খুলাইদ বিন কা'স তৎক্ষণাৎ গিয়ে এদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন এবং শাহজাদিকে বন্দি করে আনেন।[১৪৫]

বন্দি শাহজাদির প্রতি সম্মানপ্রদর্শন

বন্দি করার পর শাহজাদিকে কোনো রকম কষ্ট দেওয়া ছাড়া কুফায় নিয়ে আসা হয়। হজরত আলি রা. বলেন, তুমি কি আমার পুত্র হাসানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত?

শাহজাদির রাজকীয় মনোভাবপূর্ণ উত্তর ছিল, 'আমি কোনো অধীনস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই না'।

হজরত আলি রা. হজরত হাসানের গুণাবলি বর্ণনা করেন। কিন্তু শাহজাদি বলল, 'আমি কেবল আপনার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত আছি'।

হজরত আলি রা. তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, 'আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি'।

কিন্তু শাহজাদি অন্যকারো সঙ্গে বিবাহ বসতে রাজি হলো না। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে এক পারসিক উঠে বলল, আমিরুল মুমিনিন, আমি এ মেয়ের আত্মীয়। সুতরাং একে আমার সঙ্গে বিবাহ করিয়ে দিন।

হজরত আলি রা. বলেন, তার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তার হাতে।

তারপর সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে শাহজাদিকে এই বলে মুক্ত করে দেন যে, 'তোমার যেখানে খুশি যেতে পার এবং যার সঙ্গে ইচ্ছা বিবাহ বসতে পারো, কেউ তোমার গায়ে একটি আঁচড়ও দেবে না'।[১৪৬]

মুশরিকদের বিরুদ্ধে হজরত আলি রা. এর পতাকাতলে ইবনে মাসউদ রা. এর শাগরিদদের জিহাদে অংশগ্রহণ

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর শাগরিদরা ছিল হজরত আলি রা. এর প্রতি বিশ্বস্ত ও আত্মত্যাগী। তারা শামিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে

---

[১৪৫] আল আখবারুত তিওয়াল, পৃষ্ঠা : ১৫৩, ১৫৪

[১৪৬] আল আখবারুত তিওয়াল, পৃষ্ঠা : ১৫৩-১৫৪

চাচ্ছিল না। বরং অন্য কোনো রণাঙ্গনে তাদের বিশ্বস্ততা ও বীরত্বের স্বাক্ষর রাখতে চাচ্ছিল। তাই তাদের দলনেতা হজরত আবিদা সুলমানি রা. হজরত আলি রা. এর কাছে আরজ করলেন, আমিরুল মুমিনিন, আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আমরা স্বীকার করি। তবু শামিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমাদের সংশয় আছে। অন্যদিকে আপনার জন্য এবং গোটা মুসলিমজাতির জন্য মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই না করেও কোনো উপায় নেই। সুতরাং আপনি আমাদেরকে কাফেরদের সীমান্তে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি।

হজরত আলি রা. হজরত রবি বিন খুসাইম রা. কে আমির বানিয়ে এ দলটিকে কাযবিন ও রায় এলাকার সীমান্তে পাঠিয়ে দেন। এ বাহিনী পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে পতাকা তৈরি করা হয়েছিল।[১৪৭]

মুরতাদ বা ইসলাম বর্জনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ

তৎকালীন মুসলিমবিশ্বের কোনো এক এলাকার লোকেরা মুরতাদ হয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। হজরত আলি হজরত মা'কিল বিন কায়েস রহ. কে তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি তুমুল লড়াই করে মুরতাদদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাদের বহু মানুষকে বন্দি করে নিয়ে আসেন।[১৪৮]

বেলুচিস্তান ও সিন্ধুতে নতুন অভিযান

৩৯ হিজরির শুরুর দিকে হজরত আলির পক্ষ থেকে বেলুচিস্তান ও সিন্ধুপ্রদেশ অভিমুখে পুনরায় অভিযান পরিচালনা করেন। কেননা হজরত উমর রা. এর যুগে মাকরান পর্যন্ত পদানত হয়েছিল। এরপরের এলাকাটি ছিল 'কান্দাবিল'। এখানে খাদ্য ও পানীয়ের সংকট ও অন্যান্য সমস্যা থাকার কারণে হজরত উমর রা. নতুন অভিযান বন্ধ রেখেছিলেন।[১৪৯]

---

[১৪৭] আল আখবারুত তিওয়াল, পৃষ্ঠা : ১৬৫
বিভিন্ন ইঙ্গিত থেকে মনে হয়, এটি জঙ্গে সিফফিনের পরের ঘটনা। কেননা হজরত আবিদা সুলমানি এবং ইবনে মাসউদ রা. এর অন্যান্য শাগরিদ জঙ্গে সিফফিনে উপস্থিত ছিলেন এবং দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি করানোর চেষ্টা করেছেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৫০৫)

[১৪৮] শরহু মাআনিল আসার লিত তাহাবি, হাদিস : ৫১১৪, কিতাবুস সিয়ার।

[১৪৯] উয়ূনুল আখয়ার লিবনি কুতাইবাহ: ২/ ২১৭, তারিখুত তাবারি : ৪/ ১৮২

হজরত আলি রা. তার শাসনামলে কিছুদিন বিরতির পর এখানে পুনরায় বাহিনী প্রেরণ করেন।

কান্দাবিল ও কিকানের অভিযান

হজরত আলি রা. এর আদেশে হারেস বিন মুররা আল আবদি রা. মাকরান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কান্দাবিলের সীমানায় প্রবেশ করেন। তারপর কিকানের পার্বত্য অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে এগিয়ে যান। একপর্যায়ে তিনি বিজয় লাভ করেন। সে অভিযান থেকে তিনি কুফায় যে গনিমতের সম্পদ প্রেরণ করেছিলেন, তা পরিমাণে এত অধিক ছিল যে, একদিনেই এক হাজার গোলাম বণ্টন করা হয়েছিল।

হজরত হারেস যখন উক্ত অভিযান শেষে ফিরে আসছিলেন, তখন শত্রুরা একটি ঘাঁটিতে ওত পেতে বসে ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে তারা তাকে ঘিরে ফেলে। তারপর তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে যান।[১৫০]

অভ্যন্তরীণ যুদ্ধসমূহে খ্রিষ্টানদের কূটচাল

হজরত উসমান গনি রা. র শাহাদাত থেকে শুরু করে, হজরত আলি রা. র যুগ পর্যন্ত বহু ফেতনার পেছনে হাত ছিল স্থানীয় খ্রিষ্টানদের। এদের অধিকাংশের বসবাস ছিল ইরাক ও শামের সেই সীমান্তে, যা আরবভূমির সাথে মিলিত হয়েছে। এদের কিছু লোক বহির্বিশ্বের খ্রিষ্টান শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামি খেলাফত ও মুসলিম ঐক্যের বিপরীতে উত্থিত যে কোনো আন্দোলনে অংশ নিত এবং এজাতীয় যে কোনো দলের মদদে এগিয়ে আসত।

---

[১৫০] তারিখে খলীফা বিন খাইয়্যাত, পৃষ্ঠা : ১৯১, ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৪১৭
আমাদের এক সুহৃদ বন্ধু জনাব আদনানুল হক (সৌদিপ্রবাসী) ভূগোল বিষয়ের প্রতি বেশ আগ্রহী। তার গবেষণা অনুযায়ী 'কিকান' ও 'কান্দাবিল' দ্বারা মূলত উদ্দেশ্য বেলুচিস্তানের ঐ এলাকা, যা সিন্ধুপ্রদেশের সাথে মিলিত। এখান থেকেই শুরু হয়েছে 'ক্ষীরথার' পর্বতমালা এবং তা সিন্ধুর সীমান্তের সাথে গিয়ে মিশেছে। তৎকালীন যুগে এই বিশাল পার্বত্য অঞ্চলকে বলা হতো 'কিকান'। পরে এ অঞ্চলটি 'কান্দাহার' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। আর 'কান্দাবিল'-এর বর্তমান নাম 'ঝালমাগসী'। বিস্তারিত তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন :
www.balochistan.gov

খির্‌রিত বিন রাশেদের চক্রান্ত

এ ক্ষেত্রে খির্‌রিত বিন রাশেদের আলোচনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই লোক ছিল বনু নাজিয়া গোত্রের সদস্য। জঙ্গে জামাল থেকে নিহরুওয়ান পর্যন্ত সে হজরত আলির পক্ষেই ছিল। কিন্তু এরপর ৩৮ হিজরিতে সে হঠাৎ একদিন হজরত আলি সম্পর্কে বেদীনি ও জাতিকে বিকিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে বিদ্রোহ করে বসে।

আসলে সে ছিল মুসাইলামা কাজ্জাবের মতো বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। প্রত্যেকের সাথ তার মনোভাব অনুযায়ী কথা বলত। খারেজিদের বলত, মীমাংসার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে হজরত আলি একটি নাজায়েজ কাজ করেছেন। অন্যদিকে মুসলমানদের বলত, আমি হজরত আলির সিদ্ধান্ত মান্য করি। এমনিভাবে একদিকে হজরত উসমান রা. এর শহিদ ও মজলুম হওয়ার কথাও স্বীকার করত। অন্যদিকে যারা খেলাফতের সাথে বিদ্রোহ করে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিত, তাদেরকেও শাবাশ বলত। এমনকি যারা মুরতাদ হয়ে যেত, তাদেরও মনোবল বৃদ্ধি করত।[১৫১]

খির্‌রিত বিন রাশেদের বিরুদ্ধে অভিযান

এরপর হজরত আলি ও খির্‌রিত বিন রাশেদের মাঝে দীর্ঘ পত্রবিনিময় চলতে থাকে। কিন্তু তাতে কোনো ফল আসে না। এদিকে ইরাক ও উপসাগরীয় অঞ্চলের খ্রিষ্টানজগত তার পৃষ্ঠপোষক হয়ে যায়। তার নিজের গোত্র বনু নাজিয়া আগে খ্রিষ্টবাদ বর্জন করে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। তারা আবার খ্রিষ্টান হয়ে যায়। আহওয়াজের অনারব গোত্রগুলোও তার আশপাশে সমবেত হয়ে যায়। তা ছাড়াও চোর-ডাকাতদের বিরাট সংখ্যক সদস্য তার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়।[১৫২]

অবশেষে হজরত আলি রা. হজরত মা'কিল বিন সিনান রা. কে এক শক্তিশালী বাহিনী দিয়ে খির্‌রিতকে নির্মূল করার জন্য প্রেরণ করেন।[১৫৩]

এ অভিযানে হজরত আবু তুফাইল রা.-ও ছিলেন।[১৫৪] তিনি এ ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'আমি সেই বাহিনীতে ছিলাম, যাকে হজরত

---

[১৫১] তারিখুত তাবারি : ৫/১২৫
[১৫২] তারিখুত তাবারি : ৫/১২২-১২৬
[১৫৩] তারিখুত তাবারি : ৫/১৩২

আলি রা. বনু নাজিয়ার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। আমরা যখন ওই গোত্রের কাছে পৌঁছলাম, তখন দেখলাম তারা তিনটি দলে বিভক্ত। আমাদের আমির একটি দলকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা?

তারা বলল, আমরা আগে খ্রিষ্টান ছিলাম। পরে মুসলমান হয়েছি এবং এখনো ইসলামের উপর অবিচল আছি।

আমির বললেন, তোমরা এক পাশে সরে যাও।

তারপর দ্বিতীয় দলটি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা?

তারা বলল, আমরা আগেও খ্রিষ্টান ছিলাম, এখনো খ্রিষ্টান আছি।

আমির তৃতীয় দলটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা?

তারা বলল, আমরা আগে খ্রিষ্টান ছিলাম। পরে মুসলমান হয়েছিলাম। কিন্তু আমরা দেখলাম, খ্রিষ্টবাদের চেয়ে উত্তম আর কোনো ধর্ম নেই। তাই আমরা আবার খ্রিষ্টান হয়ে গেছি।

আমির বললেন, তোমরা আবার ইসলাম গ্রহণ করো।

কিন্তু তারা অস্বীকার করে। এরপর আমির ফিরে এসে তার সঙ্গী মুজাহিদদের বলেন, আমি তিনবার আমার মাথায় হাত রাখব। (যখন তৃতীয়বার হাত রাখব) তখন তোমরা আক্রমণ করবে।

মুসলমানরা তেমনই করেছিল। সে যুদ্ধে বনু নাজিয়া গোত্রের যোদ্ধাদের হত্যা করা হয়। নারী ও শিশুদের বন্দি করা হয়।[১৫৫]

এ যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী। শত্রুদের সরদার খির্‌রিত পালিয়ে আত্মগোপন করেছিল। আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।[১৫৬]

---

[১৫৪] তার নাম ছিল আমের বিন ওয়াসেলা। তিনি সকল সাহাবির মৃত্যুর পর হিজরি ১০০ সনে কিংবা ১১০ সনে ইনতেকাল করেন।

[১৫৫] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ২৯০০৮, আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, হাদিস : ১৬৮৯৫

এ বর্ণনার পরে ইমাম বাইহাকি ইমাম শাফেয়ি রহ. এর এ বাণী উল্লেখ করেছেন-

قد قاتل من لم يزل على النصرانية ومن ارتد

যারা খ্রিষ্টবাদের উপর অবিচল ছিল এবং যারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেছিল, হজরত আলি উভয় দলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছেন।

[১৫৬] তারিখুত তাবারি : ৫/১৩২

শাহাদাতের হৃদয়বিদারক ঘটনা

দেখতে দেখতে হজরত আলি রা. ৬৩ বছর বয়সে উপনীত হলেন। মুসলিমবিশ্বের শাসনভার তিনি যে অবস্থায় হাতে নিয়েছিলেন, তা ছিল তার জন্য ফিকহি প্রজ্ঞা, চিন্তার দৃঢ়তা, উন্নত মনোবল, আল্লাহর উপর ভরসা এবং ইখলাসের অনেক বড় পরীক্ষা। কিন্তু আল্লাহপ্রদত্ত তাওফিকে হজরত আলি এ সকল পরীক্ষায় অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সতর্কতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন।

৪০ হিজরির দিনগুলো দ্রুতগতিতে কেটে যাচ্ছিল। হজরত আলি অনুভব করছিলেন, তার সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনো সমাজে বিশৃঙ্খলার বীজ রয়ে গেছে। এমনকি তার অনুসারীদের মধ্যেই অনেকে শরিয়তের উপর তার অবিচলতা, বারবার ব্যক্তিস্বার্থের বিসর্জন এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের জন্য তার উদারতার কারণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এজাতীয় লোক ইরাকি যেমন ছিল, পারস্যেও ছিল। এরা মূলত কায়সার ও কিসরার মতো জাগতিক জাকজমকতার অধিকারী শাসকদেরকেই ভয় পেত। হজরত আলির সাদাসিধে চালচলন ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন তাদের দৃষ্টিতে ছিল দোষণীয়।

হজরত আলি রা. আরো অনুভব করছিলেন যে, অভ্যন্তরীণ শত্রুরা সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে আছে। যেকোনো সময় তারা তার উপর প্রাণনাশি হামলা চালাতে পারে।

এমন সময় বনু মুরাদের এক ব্যক্তি হজরত আলি রা. কে অবগত করে বলেন, 'নিজের জন্য পাহারার ব্যবস্থা করুন। কেননা বনু মুরাদের কিছু লোক আপনাকে হত্যার সুযোগ খুঁজছে।

হজরত আলি রা. অত্যন্ত নির্বিকার ও নিশ্চিন্তভাবে তাকে বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের সাথে দুজন নিরাপত্তাদানকারী ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে। তারা তাকে সবধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু যখন

তাকদিরের লিখন এসে পড়ে, তখন তারা সরে যায়। নিঃসন্দেহে মৃত্যু নিজেই একটি শক্তিশালী ঢাল'।[১৫৭]

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও শাহাদাতের তামান্না

আগে থেকেই হজরত আলি রা. ছিলেন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। শেষদিনগুলোতে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে আরো বেশি নিরাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। জীবনের শেষদিনগুলোতে খুতবার মধ্যে তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমি এই লোকদের দ্বারা বিরক্ত হয়ে গেছি, এরাও আমার দ্বারা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। আমি এদের আচরণে অতিষ্ঠ, এরা আমার আচরণে অতিষ্ঠ। আপনি এদের থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে শান্তি দান করুন, আর এদেরকে আমার থেকে মুক্ত করে শান্তি দান করুন।'

তারপর তিনি স্বীয় দাড়িতে হাত রেখে বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা ব্যক্তিকে কেউ বাধা দিতে পারবে না, যখন সে আমার দাড়ি

রক্তরঞ্জিত করে দেবে'।[১৫৮]

এর কিছুদিন পর হজরত আলি রা. এর পরামর্শদাতারা সিদ্ধান্ত দিল যে, হজরত আলি রা. তার পরবর্তী খলিফা নির্বাচন করে দিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'না, বরং আল্লাহর নবী যেভাবে (কোনো নিয়মতান্ত্রিক প্রতিনিধি নিযুক্ত করা ছাড়াই উম্মাহকে) রেখে গেছেন, আমিও তোমাদেরকে সেভাবে রেখে যাব'।

কিন্তু তার সঙ্গীরা আশঙ্কা করছিলেন, এভাবে বিশৃঙ্খলা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই তারা আরজ করলেন, 'এই অবস্থা রেখে আপনি যদি আপনার প্রভুর কাছে যান, তা হলে কী উত্তর দেবেন?

তিনি বললেন, এটাই বলব যে, হে আমার প্রভু, আপনি যতদিন ভালো মনে করেছেন, আমাকে তাদের মাঝে রেখেছেন। তারপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন আপনিই তাদের দায়িত্বশীল। ইচ্ছা করলে তাদেরকে শুধরে দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে বিপথগামী হতে দিতে পারেন'।[১৫৯]

---

[১৫৭] তবাকাতে ইবনে সা'দ ৩/ ৩৪,

[১৫৮] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস : ১৮৬৭০, সনদ সহিহ।

[১৫৯] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১০৭৮, সনদ সহিহ।

হত্যা-ষড়যন্ত্রে খারেজিরা

নিহরুওয়ানের যুদ্ধে হজরত আলি রা. খারেজিদের সামরিক শক্তি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কিন্তু খারেজি চিন্তা-চেতনার বহু মানুষ তখনো মুসলিম সমাজে বিরাজমান ছিল, যারা হজরত আলি ও হজরত মুয়াবিয়া রা.-সহ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদাধিকারী সাহাবিদের চরম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত। তাদের ধারণা এই সাহাবিরাই সমস্ত গৃহযুদ্ধ ও গণ্ডগোলের মূল হোতা। সুতরাং তাদেরকে হত্যা করলেই মুসলমানদের সুরক্ষা নিশ্চিত হতে পারে। এই চিন্তা থেকে খারেজিদের তিন সদস্য—আবদুর রহমান বিন মুলজিম মুরাদি, বারক বিন আবদুল্লাহ তামিমি এবং আমর বিন বকর—সিদ্ধান্ত নিল, বর্তমান ইসলামি রাজনীতির তিন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে একই সময়ে হত্যা করে ফেলবে।

এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য তারা নিজ নিজ তরবারিতে বিষ মিশ্রিত করে এবং ১৭ রমজান তিন মহান ব্যক্তির উপর আক্রমণের দিনক্ষণ ধার্য করে। সেমতে-

- হজরত আলি রা. কে শহিদ করার উদ্দেশ্যে আবদুর রহমান বিন মুলজিম কুফার উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়।
- হজরত মুয়াবিয়ার উপর আক্রমণ করার জন্য বারক বিন আবদুল্লাহ শামের দিকে চলে যায়।
- আর হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে শহিদ করার জন্য আমর বিন বকর মিসরের উদ্দেশে যাত্রা করে।[১৬০]

  তারপর ঠিকই ১৭ রমজানের ভোর রাতে প্রত্যেকে নিজ লক্ষ্যে হামলা চালায়। কিন্তু ফল হয় তিন রকম। যথা :
- শামে হজরত মুয়াবিয়া রা. আহত হন; কিন্তু বেঁচে যান। হামলাকারী বারক বিন আবদুল্লাহকে আটক করে হত্যা করা হয়।
- অন্যদিকে মিসরে হজরত আমর ইবনুল আস রা. অসুস্থতার কারণে সেদিন ফজরের নামাজের ইমামতির জন্য হজরত খারেজা বিন হুযাফা রা. কে পাঠিয়েছিলেন। আমর বিন বকরের বিষাক্ত তরবারির

---

[১৬০] তারিখুত তাবারি : ৫/ ৪৩, মুসা বিন উসমান থেকে বর্ণিত।

আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সেখানেই হত্যাকারীকে আটক করে হত্যা করা হয়।[১৬১]

- আর হজরত আলির ঘটনা নিম্নরূপ।

আবদুর রহমান বিন মুলজিম ও শাবিব বিন বাজরা

আবদুর রহমান বিন মুলজিমের দায়িত্ব ছিল খলিফাতুল মুসলিমিনের উপর আক্রমণ করা। ব্যক্তিগতভাবে আবদুর রহমান বিন মুলজিম ছিল অত্যন্ত ইবাদতগুজার ও পরহেজগার। পবিত্র কুরআনের হাফেজ ও কারিও ছিল সে। কিন্তু পরে সে পথভ্রষ্ট হয়ে খারেজি আন্দোলনের নেতায় পরিণত হয়েছিল।[১৬২]

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হজরত আলি রা. কে হত্যার সংকল্প নিয়ে সে সোজা কুফায় গিয়ে পৌঁছে। সেখানে আরেক খারেজি শাবিব বিন বাজরাকেও সঙ্গী বানিয়ে নেয়। ১৭ রমজানের রাতটি ছিল জুমার রাত। তারা দুজনই হজরত আলি রা. এর অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকল।[১৬৩]

প্রাণনাশি হামলা ও শাহাদাত

আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. সেহরি শেষ করে ফজরের নামাজের জন্য অন্ধকারের ভেতর দিয়ে মসজিদে আগমন করলেন। জানুয়ারি মাস চলছিল। কুফায় তখন প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি মানুষকে ফজরের নামাজের জন্য ডাক দিতে দিতে আসছিলেন। তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল আসসালাত.. আসসালাত..।

ধীরে ধীরে তিনি যখন মসজিদের বারান্দায় পৌঁছলেন, তখন আবদুর রহমান ও শাবিব তরবারি উত্তোলন করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর মুখে উচ্চারণ করল তাহকিমের স্লোগান 'ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ'।

---

[১৬১] তারিখুত তাবারি : ৫/ ১৪১

[১৬২] আল ওয়াফী বিল ওফায়াত: ১৮/ ১৭২

নোট : আবদুর রহমান বিন মুলজিম মুরাদি ছিল ইয়েমেনি গোত্র হিময়ার-এর শাখা গোত্র বনু মুরাদের সদস্য।

[১৬৩] তারিখুত তাবারি : ৫/ ১৪৩,

واخرج الحاكم فيه بعض المرويات باسناده قال: ذكر مقتل امير المؤمنين على رضى الله عنه. ١٥٤/٣

তারপর চিৎকার করে বলল, শাসনক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর, এই আলি, তোমারও নয়, তোমার সাথিদেরও নয়'।

এই বলে প্রথমে শাবিব তরবারি চালাল। কিন্তু হজরত আলি বেঁচে গেলেন। ইত্যবসরে অপর দিক থেকে আবদুর রহমান প্রবলবেগে হজরত আলির মস্তক লক্ষ করে আক্রমণ চালাল। সঙ্গে সঙ্গে তরবারি কপালে গেঁথে গেল। হজরত আলি রক্তরঞ্জিত হয়ে পড়লেন।

আহত অবস্থায় হজরত আলি চিৎকার করে বললেন, সে যেন পালাতে না পারে।

চারদিক থেকে লোকজন ছুটে এলো। আবদুর রহমান বিন মুলজিম ও শাবিব একযোগে সকলের উপর হামলা করতে লাগল, যাতে পলায়নের পথ করে নিতে পারে। শাবিব পালাতে সক্ষম হয়। কিন্তু আবদুর রহমানকে আটক করা হয়।

হজরত আলি রা. তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কীসে তোমাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করল?'

সে এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অহঙ্কার করে বলল, 'হাজার মূল্যের তরবারি ক্রয় করে, তাতে হাজার মূল্যের বিষ মিশিয়েছি। ৪০ দিন পর্যন্ত সেটি ধার দিয়েছি আর দোয়া করেছি, উম্মাহর সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি যেন এর আঘাতে নিহত হয়। যদি পুরো শহরের মানুষও এর আক্রমণের নিচে আসত, তবু আল্লাহর কসম, একজনও বাঁচতে পারত না।[১৬৪]

হামলাকারীর সঙ্গেও উত্তম ব্যবহারের তাগিদ

লোকেরা এই হতভাগা ইবনে মুলজিমকে প্রাণে শেষ করে দিতে চাচ্ছিল; কিন্তু হজরত আলি বিষয়টি স্থগিত করার আদেশ দিয়ে বলেন, 'তার জন্য সুন্দর পানাহারের ব্যবস্থা করো। আরামদায়ক বিছানা দাও। সুন্দরভাবে কারাগারে রাখো। যদি আমি সেরে উঠি, তা হলে তাকে ক্ষমাও করতে পারি, অথবা বদলাও নিতে পারি। আর যদি আমি মরে যাই, তা হলে তোমরা শুধু তরবারির এক আঘাতে হত্যা করবে। তার লাশ বিকৃত

---

[১৬৪] তারিখুত তাবারি : ৫/ ১৪৪-১৪৫

করবে না। আগামীকাল আমি আল্লাহর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করব'।[১৬৫]

বিষাক্ত তরবারির আঘাতে হজরত আলির পুরো শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ল। বাঁচার কোনো আশা রইল না।

অন্তিম উপদেশ

শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে হজরত আলি রা. তার বংশধরদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। যথা :

- হে হাসান, আমি তোমাকে এবং আমার সকল সন্তানকে সর্বদা আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি।
- মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর অটল অবিচল থাকবে। আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। বিক্ষিপ্ত হবে না।
- আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে।
- এতিমদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করবে।
- প্রতিবেশীদের প্রতি লক্ষ রাখবে।
- পবিত্র কুরআনের উপর আমল করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকবে।
- নামাজের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করবে। কেননা এটাই ছিল তোমাদের প্রিয়নবীর শেষ উপদেশ।
- আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মালের বিনিময়ে জিহাদ করতে থাকবে।
- জাকাত আদায় করবে। কেননা এটা আল্লাহর ক্রোধ শীতল করে দেয়।
- আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের প্রতি লক্ষ রাখবে। কেননা আল্লাহর নবী তাদের ব্যাপারে এমনই আদেশ করে গেছেন।
- দরিদ্র, অসহায়, গোলাম ও দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে।
- মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলবে।

---

[১৬৫] আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি: ১৬৭৫৯, তাহযিবুল আসার লিত তাবারানি, ৫/৭৫, তারিখুত তাবারি : ৪/ ৭৯, মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৪৬৯১

- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।
- নেক কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। পক্ষান্তরে গুনাহ ও শত্রুতার কাজে কেউ কারো সঙ্গে থাকবে না।[১৬৬]

শেষসময় হজরত আলি রা. এর সঙ্গীরা তাকে প্রশ্ন করল, যদি আপনি শহিদ হয়ে যান, তা হলে কি আমরা হাসানের হাতে বাইয়াত হবো?

উত্তরে হজরত আলি বললেন, আমি এর আদেশও করব না, আবার নিষেধও করব না।[১৬৭]

শাহাদাত ও দাফন

এরপর তিনি অবিরাম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করতে থাকেন। এক সময় তার পবিত্র আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায়। তখনো ১৭ রমজানের সূর্য উদিত হয়নি। ভোরের আলো ফোটার পূর্বেই ঈমান ও বিশ্বাস, ইলম ও প্রজ্ঞা, জিহাদ ও রাজনীতি এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার এই আলোকোজ্জ্বল সূর্য পৃথিবীকে আঁধার করে দিয়ে চলে যায়।

رضی الله عنه ورضوا عنه

জানাজার নামাজ পড়িয়েছেন সুযোগ্য পুত্র হজরত হাসান রা.।[১৬৮] জানাজা শেষে 'দারুল ইমারাহ' তথা আমিরদের বাসভবনের ভেতরেই তাকে দাফন করা হয়। কেননা শঙ্কা ছিল, সুযোগ পেলে খারেজিরা লাশের অবমাননা করতে পারে।[১৬৯]

খেলাফতের মোট সময় হয়েছিল ৪ বছর ৯ মাস।[১৭০]

---

[১৬৬] তারিখুত তাবারি : ৫/ ১৪৭-১৪৮

[১৬৭] لا آمركم ولا أنهاكم. (তারিখুত তাবারি : ৫/ ১৪৬-১৪৭, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/ ১৫)

[১৬৮] তারিখুত তাবারি : ৫/ ১৫১-১৫২

[১৬৯] তারিখে খলীফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯৯

[১৭০] তারিখুত তাবারি : ৫/ ১৫২

হজরত আলি রা. এর জীবনাদর্শের কয়েকটি আলোকিত দিক

হজরত আলি রা. এর মহান ব্যক্তিসত্তা ছিল অসংখ্য গুণের আধার। তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণটি ছিল, আল্লাহর নবীর প্রতিটি সুন্নাতের উপর তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমল করতেন।

এ ছাড়া জনগণের সেবা-যত্নের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা এবং দুনিয়াবিমুখতা ও আল্লাহভীতির ক্ষেত্রে তিনি তার পূর্ববর্তী তিন মহান খলিফার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতেন। সর্বাবস্থায় তার ভরসা থাকত মহান আল্লাহর উপর।

তিনি অধিক পরিমাণে রোজা রাখতেন এবং কুরআন তেলাওয়াত ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় ব্যস্ততা। নিম্নে তার মহান জীবনাদর্শ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

- একবার হজরত মুয়াবিয়া রা. এর আদেশে এক ব্যক্তি হজরত আলি রা. এর মহান জীবনাদর্শের চিত্র আঁকতে গিয়ে বলেন, 'হজরত আলির দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। কথা বলতেন দ্বিধাহীনভাবে এবং পরিষ্কার ভাষায়। দুনিয়া ও তার রংচংয়ের প্রতি তার কোনো আসক্তি ছিল না।

  রাতের আঁধারে তিনি ধ্যানমগ্ন হতেন। আল্লাহর কসম, রাতের ইবাদতে তার চোখের জল কোনো বাধা মানত না।

  অধিকাংশ সময় তিনি চিন্তামগ্ন থাকতেন। নিজের দুই হাত ওলটপালট করে নিজের সাথে কথা বলতেন।

  তার পোশাক ছিল সাধারণ ও পুরাতন। চলতেন সাধারণ মানুষের মতো নিঃসঙ্কোচে। কিন্তু তারপরও তার প্রভাবের কারণে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা বলার সাহস হতো না।

তিনি মুচকি হাসলে তার দাঁতগুলো শুভ্র মুক্তোর দানার মতো জ্বলজ্বল করত।

দীনদার মানুষদের তিনি খুব সম্মান করতেন। গরিবদের ভালোবাসতেন; কিন্তু কোনো প্রভাবশালী লোকও কোনো অন্যায় বিষয়ে তার সমর্থনের আশা করতে পারত না। আবার কোনো অতি দুর্বল মানুষও তার ইনসাফ থেকে নিরাশ হতো না।

আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তার রাতের কয়েকটি দৃশ্য দেখেছি। রাত্রি যখন তার কালো চাদরে সবকিছু ঢেকে ফেলত, আকাশের তারকারাজি ডুবতে শুরু করত, তখন হজরত আলি রা. মসজিদের মিহরাবে বসে নিজ হাতে স্বীয় দাড়ি ধরে একজন ব্যথায় কাতর মানুষের মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। তার অস্থিরতা দেখে মনে হচ্ছিল, কোনো সাপ বা বিচ্ছু তাকে দংশন করেছে। আজও আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার করুণ আর্তনাদ। তিনি বলছিলেন, 'হে দুনিয়া, তুই আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছিস? আমার থেকেও কি তুই কিছু আশা করছিস? লাভ নেই। যা, অন্য কাউকে গিয়ে ধোঁকা দে। আমি তো তোকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছি। সুতরাং এরপর তোর সাথে সম্পর্কের কোনো সুযোগ নেই।

তোর জীবন তো খুবই সামান্য সময়ের। ... তুই যে সফলতা দিবি, তা নিতান্তই তুচ্ছ। অথচ তোর চক্রান্ত বড় ভয়ানক।

হায়, সফরের পাথেয় কত অল্প! অথচ সফর কত দীর্ঘ আর পথ কতই না বিপদসঙ্কুল!!

এ বর্ণনা শুনে হজরত মুয়াবিয়া রা. জারজার হয়ে কেঁদেছিলেন।[১৭১]

- একবার হজরত আলির কাছে তারই এক গভর্নর উপস্থিত হলো। যখন খাবার সময় হলো, হজরত আলি একটি মাটির বাসন চেয়ে আনলেন, যাতে কেবল ছাতু রাখা ছিল। হজরত আলি তাতে সামান্য পানি মিশিয়ে নিজেও আহার করলেন, গভর্নরকেও খেতে দিলেন।

---

[১৭১] সফওয়াতুস সফওয়াহ, কৃত: ইবনুল জাওযি : ১/ ১২২

এতে ওই গভর্নর বেশ হতবাক হয়ে বলল, 'আমিরুল মুমিনিন, আপনি ইরাকে থেকেও এই খাবার খান, অথচ এখানকার সাধারণ মানুষের খাবারের মানও এর চেয়ে অনেক উন্নত?

তিনি বললেন, আমি চাই না, আমার পেটে একমাত্র হালাল খাবার ছাড়া আর কিছু প্রবেশ করুক।[১৭২]

ইলমের অঙ্গনে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা

হজরত আলি রা. এর ইলমি মর্যাদা তো ছিল সর্বস্বীকৃত। বড় বড় সাহাবি তার ফতোয়ার উপর আস্থা রাখতেন। নিম্নে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা ধরা হলো।

- কেউ একজন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর কাছে মোজার উপর মাসেহের মাসআলা জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, হজরত আলির কাছে জিজ্ঞেস করো। তিনি এ মাসআলা আমার চেয়ে ভালো জানেন। কেননা তিনি আল্লাহর নবীর সাথে সফরে যেতেন।[১৭৩]
- হজরত উমর রা. নিজে অনেক বড়মাপের ফকিহ ছিলেন। তবু তিনি বলতেন, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বিচারক আলি।[১৭৪]
- হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সঙ্গে হজরত আলি রা. এর রাজনৈতিক বিরোধ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফতোয়ার ব্যাপারে তিনি হজরত আলির উপরই ভরসা করতেন। একদিন এক ব্যক্তি এসে হজরত মুয়াবিয়ার কাছে একটি মাসাআলা জানতে চাইল। তিনি বললেন, আলির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। সে ভালো জানে।[১৭৫]

বাচনভঙ্গি ও উপস্থাপনার কৌশল

যেকোনো কঠিন বিষয়কে তিনি উদাহরণ ও গল্পের মাধ্যমে বুঝাতেন। আরবি কাব্য ও গল্পের একটি বিরাট ভাণ্ডার তার মুখস্থ ছিল। নিম্নে এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

---

[১৭২] হিলয়াতুল আওলিয়া, ১/ ৮২,
[১৭৩] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৯৪৬, মুসনাদে আলি রাযি.
[১৭৪] "اقضانا على" (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৪৮১, কিতাবুত তাফসীর)
[১৭৫] ফাজাইলুস সাহাবাহ, কৃতঃ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ. হাদিস : ১১৫৩,

হজরত আলি রা. পূর্ববর্তী খলিফাদের অত্যন্ত আদবের সঙ্গে স্মরণ করতেন। তাদের বিরহের কারণে তিনি ভীষণ দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ করতেন। একবার তিনি জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় কিছু লোক হট্টগোল শুরু করল। হজরত আলি ঘরে চলে গেলেন। তখন সাথিদের বললেন, 'আসলে আমাকে সেদিনই খেয়ে ফেলা হয়েছে, যেদিন সাদা ষাঁড়কে খেয়ে ফেলা হয়েছে'।

উপস্থিত লোকদের বিস্ময় কাটিয়ে একটু পর তিনি বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বললেন, এক জঙ্গলে থাকত তিনটি ষাঁড়। একটি সাদা, একটি লাল আর একটি কালো। তিনজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব ও ঐক্য ছিল।

ওই জঙ্গলের এক বাঘ ষাঁড়গুলোর উপর আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু তিনজন মিলে বাঘকে তাড়া করে ফিরত। অবশেষে একদিন লাল ও কালো ষাঁড় দুটিকে বলল, দেখো, এ বনে আমাদের ঝগড়ার মূল কারণ এই সাদা ষাঁড়। সুতরাং তোমরা মাঝখানে এসো না এবং আমাকে তার সাথে বোঝাপড়া করতে দাও। আমি তাকে খেয়ে ফেলি। তারপর আমি এবং তোমরা এ বনে এক হয়ে থাকব। কেননা আমার এবং তোমাদের বর্ণ তো প্রায় কাছাকাছি।

এ কৌশল করে বাঘ সাদা ষাঁড়টির উপর আক্রমণ করে তাকে মেরে ফেলল।

কিছুদিন পর সে অবশিষ্ট দুই ষাঁড়ের উপর আক্রমণের চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তারা দুজন মিলে বাঘকে তাড়িয়ে দিল।

তারপর একদিন বাঘ লাল ষাঁড়টিকে বলল, এই বনে ঝগড়ার মূল কারণ এই কালো ষাঁড়। সুতরাং তুমি তার সঙ্গ ছেড়ে দাও। যাতে আমি তাকে খেয়ে ফেলতে পারি। তারপর আমি এবং তুমি একসাথে এখানে থাকব। কেননা আমার এবং তোমার গায়ের বর্ণ তো একই।

এভাবে বুঝানোর কারণে লাল ষাঁড়টি কালো ষাঁড়ের সঙ্গ ছেড়ে দিল। তখন বাঘ তাকে হামলে খেল। তারপর যতদিন আল্লাহ চাইলেন, ওই বাঘ আরামে কাটাল। কিন্তু একদিন সে লাল ষাঁড়টির উপরও আক্রমণ করতে এলো। লাল ষাঁড়টি বলল, 'তুমি আমাকেও খাবে?

বাঘ বলল, হ্যাঁ।

লাল ষাঁড় বলল, ঠিক আছে, তবে আমাকে তিন বার একটি ঘোষণা করতে দাও।

বাঘ বলল, ঠিক আছে, করো।

লাল ষাঁড় চিৎকার করে বলতে লাগল, সবাই শোনো, আমাকে আসলে সেদিনই খেয়ে ফেলা হয়েছে, যেদিন সাদা ষাঁড়কে খেয়ে ফেলা হয়েছে'।

এ গল্প শুনিয়ে হজরত আলি রা. বললেন, 'তোমরা শুনে নাও, আমি তো সেদিন থেকেই দুর্বল হয়ে গেছি, যেদিন হজরত উসমান রা. কে শহিদ করা হয়েছিল'।[১৭৬]

হজরত হাসান রা. শোকাবহ ভাষণ ও স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ

হজরত আলি রা. এর শাহাদাতের পরদিন হজরত হাসান রা. লোকদের মজলিসে একটি ভাষণ দেন। তাতে বলেন, 'হে লোকসকল, গতকাল তোমাদের থেকে এমন এক ব্যক্তি বিদায় নিয়েছেন, যিনি ইলমের অঙ্গনে অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন। তার পরবর্তীরা কেউ তার স্তরে পৌঁছতে পারবে না। ...নিঃসন্দেহে আল্লাহর নবী যখনই পতাকা দিয়ে তাকে কোনো অভিযানে পাঠিয়েছেন, তিনি বিজয় নিয়েই ফিরে এসেছেন। তিনি দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নিয়েছেন, তার কাছে সোনাও ছিল না, রুপাও ছিল না। তবে ৭০০ দিরহাম ছিল, যা তিনি ঘরের খাদেমদের জন্য আলাদা করে রেখেছিলেন।[১৭৭]

কথিত আছে, হজরত আলি রা. নিজেই হজরত হাসান রা. কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ কথার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। সিরাত ও ইতিহাসের সমস্ত কিতাব এটাই বলছে যে, হজরত আলি রা. এ সিদ্ধান্ত উম্মতের উপর ছেড়ে গিয়েছিলেন।

আলি রা. এর শাহাদাতের পর মুয়াবিয়া রা. এর অভিব্যক্তি

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে যখন হজরত আলি রা. এর শাহাদাতের সংবাদ পৌছে, তখন তিনি নিজের অজান্তেই বলে ওঠেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

---

[১৭৬] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, বর্ণনা: ৩৭৯৩৩

[১৭৭] ফাজাইলুস সাহাবাহ, কৃত: ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ. হাদিস : ৯২২, সনদ সহিহ।

তারপর বলেন, আজ মানুষ ইলম ও মর্যাদার অনেক কিছু হারাল।

তার স্ত্রী বললেন, আপনি তো তার সাথে যুদ্ধ করতেন। কিন্তু এখন দেখি কাঁদছেন আবার।

তিনি বললেন, তুমি কী বুঝবে, আজ ইলম ও মর্যাদার কত বড় সম্পদ হারিয়ে গেল।[১৭৮]

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত আলি রা. এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন। সুতরাং ইসলামের এই চতুর্থ খলিফা সম্পর্কে তার মনোভাব সে-রকম ছিল না, যে-রকম ছিল শামের ওইসব কট্টরপন্থি লোকের, যারা হজরত মুয়াবিয়ার পরে মারওয়ানি বা নাসেবি নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

জরুরি জ্ঞাতব্য

হজরত আলি রা. সম্পর্কে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সমবেদনামূলক এজাতীয় কথাবার্তাকে অনেকেই দ্বিমুখী পলিসি ও রাজনৈতিক বক্তব্য মনে করে; অথচ এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, এটি নিছক কোনো রাজনীতিকের বিষয় নয়; বরং সাহাবায়ে কেরামের বিষয়। সুতরাং তাদের ইখলাস ও আল্লাহমুখিতার উপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে, যা পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত।

সুতরাং হজরত আলি রা. এর শাহাদাত সম্পর্কে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মন্তব্য যদি আমরা তার সেই মহান চরিত্রের দৃষ্টিতে দেখি, যা ছিল সাহাবায়ে কেরামের অনন্য বৈশিষ্ট্য, তা হলে একে অস্বাভাবিক কোনো বিষয় মনে হবে না। বস্তুত হজরত আলির সঙ্গে হজরত মুয়াবিয়ার যে মতপার্থক্য হয়েছিল, তার পেছনে মূলত ঐসমস্ত ভুল সংবাদ ও মিথ্যাসাক্ষ্যের ভূমিকাই সক্রিয় ছিল, যা প্রচার করেছিল তৎকালীন শামের দাঙ্গাবাজরা। যেসব সংবাদ আজও দুর্বল সনদে ইতিহাসের কিতাবে

১৭৮

ويلك ما تدرى ما ذا ذهب من علمه وفضله. (تاريخ دمشق: ٥٨٣/٤٢) اسناده ضعيف، لكن فى باب المناقب سعة.

বিদ্যমান আছে এবং নাসেবি ভদ্র মহোদয়গণ আজও চোখ বন্ধ করে সেগুলোকে হৃদয়ের গভীর থেকে বিশ্বাস করে যাচ্ছেন।

এখানে আরো স্মরণ রাখতে হবে যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর অবস্থান ছিল শামবাসীদের একজন রাজনৈতিক অভিভাবকের মতো। আর রাজনীতির অঙ্গনে যেসব বিষয় সামনে আসে, তা ভীষণ নাজুক, জটিল ও ঝামেলাপূর্ণ হয়ে থাকে। যেমন,

- মানুষ বহু চিন্তাভাবনা করে একদিক থেকে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; কিন্তু অন্যদিক থেকে তার ফল নেতিবাচক হয়ে প্রকাশিত হয়।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদরা তাদের সিদ্ধান্তে পূর্ণ স্বাধীনতা পায় না। বরং নিত্য সৃষ্ট নতুন সমস্য, বিশেষত গোলযোগপূর্ণ সময়ের প্রেক্ষাপট ইত্যাদি রাজনীতিবিদকে প্রতি কদমে সিদ্ধান্তের পরিসীমা সংকীর্ণ করে দিতে থাকে। ফলে সে জনমতের প্রতি লক্ষ রাখতে বাধ্য হয়ে যায়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তাকে সাধারণ মানুষের আবেগ-উদ্দীপনা এবং চাটুকারদের মতামতের কাছেও হেরে যেতে হয়।
- অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতিবিদকে তার ব্যক্তিগত অভিমত ও মনের ইচ্ছাকে একদিকে সরিয়ে রাখতে হয়।
- এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শামের জনসাধারণ ও সৈনিকরা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ইশারাকেও আদেশের মতো মান্য করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে হজরত মুয়াবিয়া রা. তার আশপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি, আমিরদের মতামত ও সাধারণ্যের আবেগ ও চাহিদাকে পরিপূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারতেন না। তদুপরি হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের ব্যথা-বেদনা এবং হজরত আলি রা. এর ব্যাপারে প্রদত্ত মিথ্যাসাক্ষ্য স্বয়ং মুয়াবিয়া রা. কেও এক অন্যরকম আবেগ ও ক্ষোভে বিহ্বল করে তুলেছিল। ভুল বোঝাবুঝির ঘোলাটে পরিবেশ, দাঙ্গাবাজদের গোপন ষড়যন্ত্র এবং কট্টরপন্থিদের প্রান্তিক দাবি তাকে আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

এ সকল দিক সামনে রেখে বিবেচনা করলে, একদিকে হজরত আলি রা. এর সঙ্গে হজরত মুয়াবিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, আবার অন্যদিকে

হজরত আলির মর্যাদা ও গুণাবলি স্বীকার করা কখনোই দুর্বোধ্য বিষয় নয়। তিনি যা কিছু করেছেন, দীন ও ঈমানের দাবি মনে করে এবং কিসাসের কুরআনি বিধান বাস্তবায়নের জন্যই করেছেন। এটা ভিন্ন কথা যে, এই ইজতিহাদে তার ভুল হয়ে গেছে।

একটি সংশয় ও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এর কলমে তার সমাধান

হাদিসের কিতাবে ফাজায়েল ও মানাকিবের অধ্যায়গুলোর প্রতি লক্ষ করলে মনে হবে, অন্যান্য সকল সাহাবি এমনকি হজরত আবু বকর ও উমর রা. এর ফাজায়েলের বর্ণনার চেয়েও হজরত আলির মানাকিবের বর্ণনার সংখ্যা বেশি। যার ফলে কেউ কেউ এ ভুল ধারণার শিকার হয় যে, হজরত আলি মনে হয় হজরত আবু বকর ও উমরের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

আসল ব্যাপার এই যে, হজরত আবু বকর ও উমরের ফাজায়েল সংক্রান্ত বর্ণনার সংখ্যা কম এবং হজরত আলির ফাজায়েল সংক্রান্ত বর্ণনার সংখ্যা বেশি হওয়ার একটি বিশেষ কারণ ছিল। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এ সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন, 'সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কারো সম্পর্কে শক্তিশালী সনদে এত হাদিস বর্ণিত হয়নি, যতটা বর্ণিত হয়েছে হজরত আলি রা. সম্পর্কে। এর সম্ভাব্য কারণ এই যে, হজরত আলি ছিলেন সর্বশেষ খলিফায়ে রাশেদ। তার শাসনামলে অনেক মতপার্থক্য শুরু হয়েছিল। ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত লোকেরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেছিল। হজরত আলি রা. এর বিরোধীদের খণ্ডন করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম তাদের স্মরণে থাকা হজরত আলির মানাকিব অধিক পরিমাণে প্রচার করেছেন। ফলে মানুষ দুই ভাগ হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে বিদআতি কম ছিল। তারপর হজরত আলির সঙ্গে তো যা হবার তা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আরেকটি দল সৃষ্টি হয়েছে, যারা হজরত আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তারপর বিষয়টা আরো জটিল হয়ে গেল। বিরোধীরা হজরত আলির নামে বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে লাগল। মিম্বারে দাঁড়িয়ে হজরত আলির নামে অভিশাপ দেওয়াটাকে প্রথা বানিয়ে ফেলল। আর খারেজিরা এই সুযোগে তাদের বিদ্বেষ মেটানোর জন্য বিরোধীদের সঙ্গ দিল। এমনকি হজরত

আলিকে তারা কাফের বলতে লাগল এবং হজরত উসমান রা. এর ব্যাপারেও একই হুকুম আরোপ করতে থাকল।

সুতরাং হজরত আলি রা. এর বিষয়ে লোকদের তিনটি দল হয়ে গেল। আহলে সুন্নাত, খারেজি বিদআতি এবং ওইসব বিদআতি, যারা হজরত আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ বনু উমাইয়া এবং তাদের অনুসারী (-দের থেকে নাসেবি দল)। সুতরাং আহলে সুন্নাত হজরত আলির ফাজায়েল প্রচার করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। একারণেই হজরত আলির ফাজায়েল বর্ণনাকারীর সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। কেননা হজরত আলি রা. এর বিরোধীর সংখ্যাও বেশি ছিল। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে চার খলিফার প্রত্যেকের ফাজায়েল এত অধিক যে, যদি ইনসাফের মানদণ্ডে তা উল্লেখ করা হয়, তা হলে আহলে সুন্নাতের আকিদার বাইরে আর কিছু প্রমাণিত হবে না।[১৭৯]

হজরত আলি রা. কি ব্যর্থ শাসক ছিলেন?

এক শ্রেণির লোক মনে করে হজরত আলি রা. এর শাসনামলটি ছিল ব্যর্থতার যুগ। তিনি তার লক্ষ বাস্তবায়নে অকৃতকার্য হয়েছেন। কেননা তিনি হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের থেকে কিসাস নিতে পারেননি এবং উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি। কিন্তু এ ধারণা নিতান্তই স্থূল বিবেচনার ফল। বস্তুত হজরত আলি রা. এর সম্মুখে কেবল হজরত উসমান রা. এর কিসাসের বিষয়টিই ছিল না; বরং তার লক্ষ্য ছিল পরিপূর্ণ শরিয়তের বাস্তবায়ন এবং খেলাফতে রাশেদার ঐতিহ্য ধরে

لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي وكأن السبب في ذلك انه تأخر ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه فكان ذلك سببا لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على من خالفه فكان الناس طائفتين لكن المبتدعة قليلة جدا ثم كان من أمر علي ما كان فنجمت طائفة أخرى حاربوه

ثم اشتد الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنة ووافقهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى كفروه مضموما ذلك منهم إلى عثمان

فصار الناس في حق علي ثلاثة أهل السنة والمبتدعة من الخوارج والمحاربين له من بني أمية واتباعهم فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف ذلك وإلا فالذي في نفس الأمر ان لكل من الأربعة من الفضائل إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلا (فتح الباري: ٧/٧١)

রাখা, যা বিনষ্ট করার জন্য চক্রান্তকারীরা কোমর বেঁধে নেমেছিল। আর দুর্ভাগ্যবশত শামের লোকেরা এবং বহু ইরাকি এদের জালে ফেঁসে গিয়েছিল। এভাবেই সাবায়িরা তাদের ষড়যন্ত্রে সফল হয়ে যায়।

কিন্তু তাদের কুটিল ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও হজরত আলি রা. সর্বোত্তম রাজনৈকি কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে, সব ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মূলোৎপাটন করেছেন। সেই সাথে অত্যন্ত দূরদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সঙ্গে ইসলামের সকল দুশমনের মোকাবেলা করেছেন এবং ধীরে ধীরে তাদের দুর্বল করে দিয়েছেন। নিহরুওয়ানের যুদ্ধে সাবায়ি ফেতনার সহিংস শাখা খারেজি মতবাদকে রক্ত দিয়ে ধৌত করে হজরত আলি এমন বহু হতভাগাকে শেষঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, যারা বেঁচে থাকলে হয়তো গোটা উম্মাহকে আবার কোনো ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে নিয়ে আছড়ে ফেলত।

এ কথা সত্য যে, হজরত আলি রা. এর যুগে হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদেরকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি; কিন্তু তাই বলে একথা বলা সম্পূর্ণ ভুল যে, তিনি কিসাসের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে হত্যাকারীদের তার আশপাশে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। সত্যিকারার্থে হজরত উসমান রা. এর হত্যাকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণকারী একজনের ব্যাপারেও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় না যে, সে হজরত আলি রা. এর বাহিনীতে ছিল।

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলাকারী বিদ্রোহীদের মোট ৫টি ধরন ছিল। যথা :

১. কিছু লোক ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবার মতো পর্দার অন্তরালে বিচরণকারী, যাদের বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য বা প্রমাণ ছিল না। আর প্রমাণ ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি কী করে জারি করা যায়?

২. কিছু মানুষ হজরত আমর ইবনুল হামিক রা. এর মতো ভুলবশত হত্যাকারী বলে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

৩. কিছু হত্যাকারীকে ঘটনাস্থলেই মেরে ফেলা হয়েছিল। যেমনঃ সুদান বিন হুমরান, কুলসুম বিন তুজাইব এবং কুতাইরা।[১৮০]

---

[১৮০] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৮৯-৪৯২ পর্যন্ত।

৪. কিছু হত্যাকারী জীবিত ছিল বটে; কিন্তু পলাতক ছিল। তারা শাম ও মিসরের সীমান্তবর্তী এলাকায় পাহাড়ে আত্মগোপন করে ছিল। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে কোনো তথ্য কারো জানা ছিল না। সেখানে হজরত আলির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও ছিল না। বরং অল্প সময়ের মধ্যেই হজরত মুয়াবিয়া মিসরকে তার ক্ষমতার অধীনে নিয়ে নিয়েছিলেন। তাই মিসরে বসবাসরত হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের বিষয়টিও হজরত আলির হাতে ছিল না।[১৮১]

হয়তো কিছু হত্যাকারী কুফা ও বসরায়ও ছিল; কিন্তু তাদের আলোচনা কোথাও পাওয়া যায় না। হয়তোবা তাদের কেউ কেউ হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর সঙ্গে বসরার যুদ্ধে নিহত হয়ে তাদের শাস্তি তারা পেয়ে গিয়েছিল।[১৮২] আর কিছু অপরাধী খারেজিদের দলে মিশে গিয়ে নিহরুওয়ানের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

মোটকথা, কোনো দুর্বল বর্ণনাতেও এমন কথা নেই যে, হজরত আলি রা. এর বাহিনীতে কিংবা তার গোটা শাসনাধীন অঞ্চলে এমন কোনো অপরাধী বসবাস করত, যে কিনা সরাসরি হজরত উসমান রা. এর উপর প্রাণনাশি হামলা চালিয়েছিল।

৫. পঞ্চম প্রকার ছিল সাধারণ দাঙ্গাবাজ। এদের মধ্যে সাবায়িরাও ছিল এবং অন্যান্য অজ্ঞ লোকও ছিল। এরা সরাসরি হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল না; তবে কট্টর মনোভাব কিংবা নির্বুদ্ধিতার কারণে হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জড়িত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে হজরত আলি রা. এর হাতে বাইয়াত হয়ে শরিয়তের দৃষ্টিতে নিরাপত্তার অধিকারী হয়েছিল। শামিরা এ-জাতীয় সকলকে কিসাসের উপযুক্ত মনে করত। তাই এই কারণে তারা হজরত আলিকে নানাভাবে অভিযুক্ত করতে থাকে। অথচ তাদেরকে সঙ্গে রাখার

---

[১৮১] মিসরি দলের মধ্যে কিনানা বিন শুরাকা ছিল হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/৭৩,) মিসর দখলের পর (সম্ভবত হিজরি ৩৮ সনে) হজরত মুয়াবিয়ার আদেশে ফিলিস্তিনের গভর্নর তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। (তারিখে দিমাশক : ৫০/২৫৯, ২৬০, আল ইসাবাহ : ৫/৪৮৬, আল ই'লাম লিয যিরিকলি: ৫/২৩৪)

[১৮২] শুধু হুরকুস বিন যুহাইর পালাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু পরে নিহরুওয়ানের যুদ্ধে সেও নিহত হয়েছিল।

কারণে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে হজরত আলির উপর কোনো অভিযোগ বা আপত্তি ছিল না।

রাজনৈতিক কৌশল ও সতর্কতার ভিত্তিতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হজরত আলি রা. অবশ্যই সাবায়িদেরকে পর্দার আড়ালে রেখেছিলেন সত্য; তবে নিহরুওয়ানের যুদ্ধে তাদের সামরিক শক্তি গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে তাদের ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনার আবরণ বিদীর্ণ করে দিয়েছিলেন। ইবনে সাবা-সহ সমস্ত ভ্রান্ত আকিদার লোকের ব্যাপারে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এবং বারবার তাদেরকে নিবৃত থাকতে বলেছিলেন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এজাতীয় ধর্মহীন নাস্তিকদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তেও পরিণত করেছিলেন।

একজন শাসকের প্রকৃত সফলতা কী?

তবু এখানে প্রশ্ন থেকে যেতে পারে যে, হজরত আলি রা. সাবায়ি ও খারেজিদেরকে সমূলে উৎখাত করতে পারলেন না কেন এবং পরবর্তীতেও কেন এদের অন্যায় কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকল?

আসলে হজরত আলি রা. বা যেকোনো শাসকের পক্ষ থেকে এজাতীয় কাজের আশা করা একটি অসম্ভব বিষয়ের আশা পোষণ করার সমতুল্য। কেননা সাবায়ি কিংবা খারেজি, এগুলো হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গিগত ফেতনার বিভিন্ন রূপ। আর এজাতীয় ফেতনা যুগের সাথে সাথে পরিবর্তন হতে থাকে। দুনিয়ার প্রতিটি জনপদে প্রতিটি যুগে এজাতীয় সংগঠন বা আন্দোলন চলে এসেছে। এর থেকে স্থায়ীভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া তেমনই দুষ্কর, যেমন গম থেকে ঘুণপোকা দূর করা দুষ্কর। যেখানে ফসলের মাঠ থাকে, সেখানে কিছু না কিছু পোকা-মাকড় অবশ্যই থাকে। অনেক সময় একটা সীমা পর্যন্ত এদেরকে সহ্য করতে হয়। যেখানে শীতল ছায়া থাকে, সেখানে অদূরেই প্রখর রোদও থাকে। তার চেয়েও ধ্রুব সত্য হলো, গোলাপ এত কোমল ও এত মায়াবী হওয়া সত্ত্বেও কাঁটাযুক্ত ডালেই জন্ম লাভ করে।

একজন শাসকের জন্য প্রকৃত সফলতা এই যে, তিনি সর্বাবস্থায় আইন ও সংবিধানের অনুগামী থাকবেন। রাষ্ট্রীয় শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সদাসচেষ্ট থাকবেন। দেশের জনগণের অধিকার আদায় করতে

থাকবেন এবং যারা তার বিরোধিতা করবে, তাদের ব্যাপারেও সীমালঙ্ঘন করবেন না।

হজরত আলি রা. শরিয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে রাজনীতি ও যুদ্ধের অঙ্গনে যে সফলতা অর্জন করেছিলেন তা কোনো অর্থেই কম ছিল না। কিন্তু এ সফলতার পরিধি আরো বিস্তৃত করার জন্য যেসব ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণ শরিয়ত, রাসুলের আদর্শ ও ইসলামি আইনের বাইরে গিয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা কল্যাণকর বলে মনে করত, হজরত আলি রা. সেখানে তাদের মত গ্রহণ না করে শরিয়তের অনুসরণকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। শরিয়তের বিধান কিংবা এর গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের দৃষ্টিতে বিষয়টি বহু নিম্নস্তরের রাজনীতি হলেও একজন আদর্শ শাসকের জন্য এটাই মূলত সফলতার সোপান। প্রকৃত সত্য তো এই যে, শরিয়ত ও আইনের প্রতি গুরুত্ব বজায় রাখা এবং কতিপয় বিজয়াভিযান থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও হজরত আলি রা. যে পরিমাণ সফলতা অর্জন করেছিলেন, কোনো শ্রেষ্ঠ শাসকও ওই রকম দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে তার চেয়ে বেশি সফলতা লাভ করতে পারত না।

সুতরাং কেউ যদি বলে, তিনি উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তা হলে আমরা বলব ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্বও তার ছিল না। বরং এর দায়িত্ব ছিল ওইসব লোকের ঘাড়ে, যারা ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়েছিল। হজরত আলির উপর যতটুকু চেষ্টা করার দায়িত্ব ছিল, তা তিনি যথাযথভাবেই পালন করেছেন। উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি বটে; কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ভিত্তি তথা সঠিক আকিদা-বিশ্বাস ও শরিয়ত বাস্তবায়নের কাজ তিনি ঠিকই করেছেন। একদিকে তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও দুঃসাহসিকতার সঙ্গে ইসলামের বিরুদ্ধে চালানো সকল দৃষ্টিভঙ্গি ও আকিদাগত যুদ্ধের মোকাবেলা করেছেন, অন্যদিকে শামের ভাইদের সাথে রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে তিনি পথভ্রষ্ট হতে দেননি। একটি সংখ্যালঘু দল ছাড়া গোটা মুসলিমবিশ্বে উম্মাহর আকিদা ও মতাদর্শ সেটাই ছিল, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিশিষ্ট সাহাবিগণ শিক্ষা দিয়েছিলেন।

দীনি বিষয়ের ক্ষেত্রে হজরত আলি রা. মাপকাঠি বানিয়েছিলেন পূর্ববর্তী খলিফাগণকে। তাদেরকেই তিনি তার আদর্শ বলে আখ্যায়িত

উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বাইরে গিয়ে দল গঠন

উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিপরীতে ইরাক ও শামে ছিল কিছু কট্টরপন্থি লোকের অবস্থান। শামে বসবাসকারী এই শ্রেণিটি হজরত আলি ও তার পক্ষের অন্যান্য দলপতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। অন্যদিকে ইরাকে বসবাসকারী এ শ্রেণিটি শামের সাহাবায়ে কেরামকে পথভ্রষ্ট ও ধর্মহীন বলে আখ্যায়িত করত। কেউ কেউ একধাপ এগিয়ে পূর্ববর্তী তিন খলিফাকেই নিন্দার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল। আর মূলত এই প্রান্তিক ধারণা-বিশ্বাসই ছিল দলাদলির ভিত্তি।

প্রথম দিকে হজরত আলির অনুসারী গোটা দলটিকে 'শিয়ানে আলি' বা আলির সমর্থক বলে অভিহিত করা হতো। কিন্তু এরা কোনো পৃথক দল ছিল না। বরং এরা ছিল হজরত আলি রা. এর অনুসারী একটি রাজনৈতিক দল। হাদিস শরিফে হজরত আলির ফাজায়েল ও মানাকিবসংবলিত বর্ণনার আধিক্য দেখে এদের কারো ধারণা ছিল, হজরত আলি ও উসমানের মধ্যে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দেওয়া কঠিন। কেউ বলত, হজরত আলির মানাকিব অধিক। সুতরাং তিনি হজরত উসমান রা. এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অন্যদিকে একটি বিরাট সংখ্যক দল হজরত আলির জন্য জীবন উৎসর্গকারী হওয়া সত্ত্বেও হজরত উসমানকে হজরত আলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত। উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের অভিমত এটিই।

হজরত আলির অনুসারীদের অধিকাংশই এই সঠিক আকিদা পোষণ করত। কেননা হজরত আলি রা. সর্বদা কথায় ও কাজে তাদেরকে এরই শিক্ষা প্রদান করতেন। এর সাথে নিরপেক্ষ সাহাবায়ে কেরামের মত এটাই ছিল।

হজরত আলির রাজনৈতিক সহযোগী সাহাবি ও তাবেয়িদেরকে যেমনিভাবে শিয়ানে আলি বলা হতো, তেমনিভাবে হজরত উসমান রা. এর কিসাসের দাবিদার সাহাবি ও তাবেয়িদেরকে বলা হতো 'শিয়ানে

উসমান' বা 'উসমানি' বা 'শিয়ানে মুয়াবিয়া'। আর হজরত আলির অনুসারীদের থেকে সাহাবি-তাবেয়িদের ঈমান ও তাকওয়া ছিল সন্দেহের উর্ধ্বে, তেমনিভাবে হজরত উসমান রা. এর অনুসারী সাহাবি ও তাবেয়িগণ ছিলেন কুরআন ও হাদিসসম্মত আকিদা লালনকারী ও তদনুযায়ী জীবন যাপনকারী।[১৮৫]

হজরত আলি ও উসমানের অধিকাংশ অনুসারী পরবর্তীতেও আকিদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে একইভাবে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করে গেছেন। সেই সাথে পূর্বের মতবিরোধকে তারা একটি সমীচীন ব্যাখ্যায় রেখে একে অপরকে যথাযথ সম্মান করেছেন। উভয় দলেরই এই ন্যায়পন্থি ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের সঙ্গে নিরপেক্ষ একটি শ্রেণি 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত' নামে পরিচিতি লাভ করল।

কিন্তু কিছু মানুষ এই সরল বিশ্বাসের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ধীরে ধীরে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে দূরে চলে গেল। বলাবাহুল্য, সিরাতে মুসতাকিম থেকে প্রাথমিক বিচ্যুতি দেখতে খুব সাধারণই মনে হয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে এক সময় তা বিরাট গোমরাহিতে রূপান্তরিত হয়। ইতিহাস বলে, হজরত আলি ও উসমানের অনুসারীদের মধ্য থেকে কট্টরপন্থি লোকদের পরিণতি এমনই হয়েছিল।

হজরত আলির অনুসারীদের মধ্যে ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসী লোকদের একটি মুষ্টিমেয় দলও মিশ্রিত ছিল, যারা আবদুল্লাহ বিন সাবার জাদুর শিকার হয়েছিল। এদের থেকে নিজেদেরকে পৃথক করার জন্য সহিহ আকিদার অধিকারী হজরত আলির অনুসারীদেরকে 'শিয়া মুখলিসিন' 'শিয়া মুতাকাদ্দিমিন' বা 'শিয়া উলা' বলা হতে লাগল। এদের মধ্যে বহু বিশিষ্ট সাহাবি, তাবেয়ি এবং অসংখ্য তাবেতাবেয়ি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৮৫

قال الامام ابن تيمية: "واتهم طائفة من الشيعة الأولى بتفضيل على على عثمان ولم يتهم أحد من الشيعة الأولى بتفضيل على علي أبي بكر وعمر بل كانت عامة الشيعة الأولى الذين يحبون عليا يفضلون عليه أبا بكر وعمر لكن كان فيهم كائفة ترجحه على عثمان وكان الناس في الفتنة صاروا شيعتين شيعة عثمانية وشيعة علوة وليس كل من قاتل مع على كان يفضله على عثمان بل كان كثير منهم يفضل عثمان عليه كما هو قول سائر أهل السنة" (منهاج السنة: ١/١٨٥)

এরা হজরত হাসানের আদেশে হজরত মুয়াবিয়ার হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। এভাবে মুসলমানরা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এরা মূলত ইলমি ও ইসলাহি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তাই আলেম মুহাদ্দিসদের মধ্যে এদের অনেক বড় একটি সংখ্যা পাওয়া যায়।

কট্টর শিয়াপন্থিদের তিন দল

সংখ্যালঘু কট্টরপন্থি দলটি ধীরে ধীরে উম্মাহর সাধারণ ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এদের মধ্যে মোট তিন শ্রেণির লোক ছিল। যথা :

১. সাধারণ কট্টরপন্থি

এরা হজরত আলি রা. কে সকল সাহাবি থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করত। কিন্তু কোনো সাহাবির ব্যাপারে নিন্দা বা অভিসম্পাৎ করত না। এদেরকে 'তাফযিলিয়া' বলা হতো। শিয়াদের যায়দি মতাদর্শীরা এদের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল।

২. গোমরাহ বা বিপথগামী

এরা হজরত আলি রা. কে শ্রেষ্ঠ দাবি করত এবং হজরত আবু বকর, উমর ও উসমান রা. কে জালেম, লুটেরা ও কাফের বলত। মূলত এরা ছিল ইবনে সাবার শিষ্য। তাই এদেরকে সাবাইয়্যা বা সাবায়ি বলা হতো। এরা সাহাবিদের প্রতি 'তিবরা' তথা বিদ্বেষ পোষণ করত। তাই তাদেরকে 'তিবরাইয়্যাহ' বা 'তিবরায়ি' (তথা 'বিদ্বেষী')-ও বলা হতো। পরবর্তীতে আত্মপ্রকাশ করা শিয়া মতবাদ, যেমন : 'ইসনা আশারিয়্যাহ', 'ইসমাইলিয়্যাহ' ইত্যাদি এই শ্রেণির সাথেই সম্পৃক্ত ছিল।

৩. চরম বিদ্বেষী

এরা হজরত আলি রা. কে খালেক (সৃষ্টিকর্তা) ও রাযেক (অন্নদাতা) দাবি করত। এরা ছিল আবদুল্লাহ বিন সাবার বিশেষ ভক্ত-অনুরক্ত। এদেরকে বলা হতো 'শিয়া গুলাত' বা চরমপন্থি শিয়া। উন্মাদ ও বিবস্ত্র ফকির শ্রেণির রাফেজিরা এ দলের সাথেই সম্পৃক্ত।

পথভ্রষ্ট শিয়াদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল, 'শিয়া মুখলিসিন' বা হজরত আলির ন্যায়পন্থি অনুসারীরা নিরপেক্ষ সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলে নিজেদের পৃথক পরিচয় ও প্রতীক হিসেবে আহলে সুন্নাত ওয়াল

জামাআত উপাধি গ্রহণ করলেন। তাফযিলি শিয়া বা হজরত আলিকে সকল সাহাবির উপর প্রাধান্যদানকারী দলটিও এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[১৮৬]

মারওয়ানি ও নাসেবিদের পরিচয়

উসমানি দল বা হজরত উসমান রা. এর পক্ষাবলম্বনকারী দলেও কিছু কট্টরপন্থি লোক উম্মাহর মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হজরত উসমান রা. এর কিসাস আদায়ের আন্দোলন বিরোধী কিংবা এর সাথে জড়িত নয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ঈমানকে সন্দেহপূর্ণ মনে করতে শুরু করল। এমনকি এক্ষেত্রে হজরত আলি এবং তার পক্ষাবলম্বনকারী বিশিষ্ট সাহাবিদেরও তারা বাদ দিল না। আর যেহেতু হজরত আলিকে জালেম ও অযোগ্য প্রমাণ করার জন্য মিথ্যা প্রোপাগান্ডার প্রয়োজন ছিল, তাই হজরত আলির সমালোচনা এবং বনু হাশিমের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাও এই দলের বৈশিষ্ট্য হয়ে গেল। একপর্যায়ে এ দলটিকে নাসেবি বা মারওয়ানি বলা শুরু হলো।[১৮৭]

উমাইয়া ও হাশিমি বংশের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পরস্পর সম্মান প্রদর্শন এবং হাদিয়া আদান-প্রদান, আত্মীয়তা স্থাপন ও দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে পক্ষপাত ও কট্টর মানসিকতার উক্ত পরিবেশকে সংশোধন করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু যেমনিভাবে ইরাকের কট্টরপন্থি দলের লোকেরা বনু উমাইয়ার ঘোর বিরোধী ছিল, ঠিক তেমনিভাবে শামের নাসেবি সম্প্রদায় হজরত আলি এবং তার অনুসারীদের প্রতি চরম বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল।[১৮৮]

---

[১৮৬] মুখতাসারুত তুহফাতিল ইসনা আশারিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ৩-১০

[১৮৭] যেমনিভাবে হজরত আলি রা. আশতার নাখায়ির মতো চরমপন্থিদের তার দলে রেখে তাদেরকে সহ্য করছিলেন, একইভাবে হজরত আলিকে জালেম ও লুটেরা ধারণাকারী কট্টরপন্থিদেরকেও হজরত মুয়াবিয়া রা. তার দলে স্থান দিয়ে সহ্য করছিলেন।

[১৮৮] শিয়া বা রাফেজিদের সম্পর্কে প্রায় সবারই জানা আছে যে, এরা একটি পৃথক দল। কিন্তু নাসেবিদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অনেক সময় বিজ্ঞজনেরাও জানে না। যার ফলে নাসেবিদের শিয়া বিরোধী লেখনী পড়ে তাদের ভক্ত হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় তাদেরকেই সাহাবায়ে কেরামের প্রকৃত আশেক ও শ্রেষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক বলে ধারণা করে।

এর ফল এই হয় যে, পরবর্তীতে এজাতীয় অজ্ঞ লোকেরাই নাসেবি আলেমদের লেখা ও ভাষণে বনু হাশেম ও হজরত আলির পক্ষাবলম্বী বিশিষ্ট সাহাবিদের প্রকাশ্য সমালোচনার বিষাক্ত তথ্যও তারা গিলে বসে।

নাসেবি সম্প্রদায়ের পরিচয় ও ইসলামি সমাজে তাদের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তৃত হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. রচিত 'মিনহাজুস সুন্নাহ' অধ্যয়ন করা অত্যন্ত উপকারী।

'মিনহাজুস সুন্নাহ' মূলত রাফেজিদের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছিল। ফলে এতে নাসেবিদের আলোচনা যেখানেই এসেছে, তা প্রাসঙ্গিক। সাধারণত রাফেজিদের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ হিসেবে নাসেবিদের উদ্ধৃতি আনা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ গ্রন্থ দ্বারা নাসেবিদের সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ধারণা লাভ করা যায়। নিম্নে 'মিনহাজুস সুন্নাহ'র এ বিষয়ক কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হলো।

১. ورعية معاوية شيعة عثمان وفيهم النواصب المبغضون لعلي فتكون شيعة عثمان

হজরত মুয়াবিয়া রা. র অধীনস্থ লোকেরা ছিল উসমানি দল। এদের মধ্যে হজরত আলির রা. এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী নাসেবিও ছিল। সুতরাং তারা ছিল উসমানের অনুসারী দল। (মিনহাজুস সুন্নাহ : ৫/২৬৬)

২. فتبين أن هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة عثمان

সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নাসেবি মতবাদের দিকে সম্বন্ধকৃত এই লোকগুলো ছিল হজরত উসমানের অনুসারী দলের অন্তর্ভুক্ত। (মিনহাজুস সুন্নাহ : ৩/৩৯০)

৩. النواصب الذين يفسقونه إنه كان ظالما طالبا للدنيا وانه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف وقتل على ذلك ألوفا من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه

নাসেবি হলো তারা, যারা হজরত আলিকে ফাসেক দাবি করে। তারা বলে, তিনি ছিলেন অত্যাচারী এবং দুনিয়ার অন্বেষী। তিনি নিজের জন্য খেলাফত চেয়েছেন এবং এর জন্য তরবারি চালনা করেছেন। হাজার হাজার মুসলমানকে এর জন্য তিনি মেরে ফেলেছেন। কিন্তু একপর্যায়ে গিয়ে তিনি শাসনক্ষমতা সামলাতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। তার সঙ্গীরা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার বিরোধী হয়ে গেছে এবং তার উপর বিজয়ী হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেছে। (মিনহাজুস সুন্নাহ : ২/৫৯)

৪. وقد صنف لهم في ذلك مصنفات مثل كتاب المروانية الذي صنفه الجاحظ وطائفة وضعوا لمعاوية فضائل ورووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلها كذب ولهم في ذلك حجج طويلة

'নাসেবিদের জন্য কয়েকটি কিতাব লেখা হয়েছে। যেমন জাহেয এর রচিত 'কিতাবুল মারওয়ানিয়্যাহ'। আর একটি দল হজরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে মনগড়া ফাজায়েল বানিয়েছে এবং এ বিষয়ে আল্লাহর নবী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছে। সবগুলো মিথ্যা। এ অধ্যায়ে নাসেবিদের সম্পর্কে দীর্ঘ দলিল-প্রমাণ রয়েছে'। (মিনহাজুস সুন্নাহ : ৪/৪০০)

এটি একটি স্পষ্ট কথা যে, দুটি দলের মধ্যে যখন রাজনৈতিক বিরোধ হয়, তখন উভয় পক্ষের কট্টরপন্থি লোকেরা বিরোধী দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে নেতিবাচক কথাবার্তা ছড়াতে থাকে। যেকোনোভাবে বিরোধী দলের বদনাম করে নিজের দলের ভিত মজবুত করতে চেষ্টা করে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কেউ নিজেই মনগড়া কথাবার্তা বানায়। আবার কেউ বড় ইখলাস ও একাগ্রতার সঙ্গে সেগুলো প্রচার করতে থাকে। বহু মানুষ এসব ভিত্তিহীন কথায় বিশ্বাসী হয়ে বসে থাকে। এমন মানুষ খুবই কম হয়ে থাকে, যারা রাজনৈতিক মতবিরোধকে তার পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে এবং সত্য ব্যতীত কোনো কথা গ্রহণ করে না।

ইরাক ও শামের অধিবাসীদের মতানৈক্য বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই চরমপন্থি লোকেরাই মূলত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এ প্রেক্ষাপটে শিয়া ও মারওয়ানি রাবিদের প্রচারিত বহু মনগড়া ও অতিরঞ্জন কথাবার্তা পরবর্তী প্রজন্মের বর্ণনার ভাণ্ডারে যুক্ত হয়ে যায়।

শায়েখ সালেহ বিন আবদুল আজিজ রহ. 'আকিদাতুত তহাবিয়্যাহ'র ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে নাসেবি মতবাদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

النواصب هم الذين يناصبون العِدَاءَ للصحابة عقيدةً، فهؤلاء هم ضد الشيعة: يعني مَنْ مَدَحَهُ الشيعة هم يناصبونه، تجد أنَّهم مَدَحُوا علياً فهم يناصبون علياً العداء ويتولون معاوية ويتولون يزيد بن معاوية ضد الحسين،

নাসেবি হচ্ছে তারা, যারা সাহাবায়ে কেরামকে শত্রুতার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছে। সুতরাং এরা শিয়াদের বিপরীত। অর্থাৎ শিয়ারা যার প্রশংসা করে, নাসেবিরা তাকে সমালোচনার টার্গেট বানায়। আপনারা দেখবেন, শিয়ারা হজরত আলির প্রশংসা করে। কিন্তু নাসেবিরা হজরত আলিকে শত্রুতার লক্ষ্যস্থল বানায়। নাসেবিরা হজরত হুসাইন রা. এর প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করার জন্য হজরত মুয়াবিয়া ও ইয়াজিদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। (ইতহাফুস সায়িল বিমা ফিত তাহাবিয়্যাতি মিনাল মাসাইল: ৪৫/১৪)

মাওলানা আবদুর রশিদ নুমানি রহ. উপমহাদেশে নাসেবি মতবাদের পতাকাবাহী মাহমুদ আহমাদ আব্বাসীর চিন্তাধারা খণ্ডন করে যে গবেষণাধর্মী কাজ করেছেন, তা বেশ স্পষ্টভাবে নাসেবি মতবাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়। এ ছাড়া এ বিষয়ে সুধী পাঠকবৃন্দের জন্য মাওলানার রচিত নিম্নোক্ত কিতাব ৩টি অবশ্যই অধ্যয়ন করা উচিত। যথা :

১. '*হাদেসায়ে কারবালা কা পসেমানজার*' (কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার প্রেক্ষাপট)।

২. '*ইয়াজিদ কী শাখছিয়্যাত আহলে সুন্নাত কে নজর মেঁ*' (আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে ইয়াজিদের ব্যক্তিত্ব)।

৩. '*নাসেবিয়্যাত তাহকীক কে ভেস মেঁ*' (বিশ্লেষণের দর্পণে নাসেবি মতবাদ)।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বানোয়াট বা অতিরঞ্জন বর্ণনার প্রচার-প্রসারে কট্টরপন্থি শিয়াদের ভূমিকাই বেশি ছিল, যারা রাফেজি মতবাদের সীমারেখার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু একটা সীমা পর্যন্ত একই কাজ মারওয়ানি দলও করছে। এ কারণেই জারহ ও তা'দিলের ইমামগণ শিয়া মতাদর্শী রাবিদের একটা বড় দলকে যেভাবে যয়িফ, মাতরুক ও কাজ্জাব আখ্যায়িত করেছেন, ঠিক সেভাবে মারওয়ানি বা নাসেবিদের থেকেও বহু রাবিকে অগ্রহণযোগ্য ও সমালোচিত বলে গণ্য করেছেন।[১৮৯]

---

[১৮৯] শিয়া মতাদর্শী রাবিদের মধ্যে অনেক এমন আছে, যাদেরকে কাজ্জাব ও মাতরুক বলা হয়েছে। যেমন,

১. আম্মারাহ ইবনে জুওয়াইন, (তাকরীবুত তাহযিব, জীবনী: ৪৮৪)
২. ইবরাহীম ইবনুল হাকাম, (মীযানুল ই'তিদাল: ১/ ২৭)
৩. আবদুর রহমান বিন মালিক বিন মিগওয়াল, (মীযানুল ই'তিদাল: ২/ ৫৮৪)
৪. উমর ইবনে শিমার জু'ফী (মীযানুল ই'তিদাল: ৩/ ২৬৮)
৫. ইসা ইবনে মিহরান (মীযানুল ই'তিদাল: ৩/ ৩২৪)

এমনিভাবে নাসেবি রাবিদের সম্পর্কেও বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে। নিম্নে তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো:

১. উসমান বিন খালিদ বিন উমর আল উমাবি : মাতরুক, (তাকরীবুত তাহযিব, জীবনী: ৪৪৬৪)
২. সাঈদ বিন মাসলামাহ আল উমাবি, যয়িফ, (আয যুআফা ওয়াল মাতরূকুন লিন নাসায়ি : ১/ ৫৩)
৩. সালত বিন দিনার আল আযদি: মতরুক, (তাকরীবুত তাহযিব, জীবনী: ২৯৪৭)
৪. আওয়ানা ইবনুল হাকাম, সে ছিল উসমানী বংশধর। ফলে সে বনী উমাইয়্যাহর জন্য মনগড়া হাদিস বানাত। (লিযানুল মীযান, ৪/ ৩৮৬)

তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর নাসেবি রাবিদের মধ্যে কতিপয় এমন লোকও ছিল, যাদেরকে নাসেবি মতাদর্শী হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়েছে।

১. খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল কিসরি : সদুক, কিন্তু সে নাসেবি, (মীযানুল ই'তিদাল: ৩/ ৬৩৩)
২. আবদুল্লাহ বিন শাকিক বিসরি : সিকাহ, তবে তার মধ্যে নাসেবি মতোবাদের প্রভাব রয়েছে। (মীযানুল ই'তিদাল: ২/ ৪৩৯)
৩. আবু কালাবাহ আল বিসরি: সিকাহ, আজলি বলেছেন, তার মধ্যে কিছুটা নাসেবি চিন্তাধারা রয়েছে। (তাকরীবুত তাহযিব, জীবনী: ৩৩৩৩)

শিয়া মতাদর্শী রাবিদের মধ্যে সদুক ও সিকাহ রাবিও আছেন। তবে সামগ্রিক বিচারে লক্ষ করলে দেখা যাবে, বানোয়াট বর্ণনা প্রচারের হার নাসেবিদের তুলনায় শিয়া (রাফেজি)-দের মধ্যে বহুগুণে বেশি।

দলাদলির সূচনা কীভাবে হয়েছিল? হাফেজ জাহাবি রহ. এর বিশ্লেষণ

তৎকালীন যুগে দলাদলির সূচনা কীভাবে হয়েছিল, তার কারণ বর্ণনা করে হাফেজ জাহাবি রহ. বলেন, 'হজরত মুয়াবিয়া রা. তার পেছনে অধিকাংশ মানুষ এমন রেখে গিয়েছিলেন, যারা তাকে ভালোবাসত এবং এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করত। তারা হজরত মুয়াবিয়াকে অন্যান্য সাহাবির উপর প্রাধান্য দিত। এর কারণ হয়তো এই ছিল যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. দয়া ও অনুগ্রহ এবং উদারতা ও দানশীলতার সঙ্গে তাদের উপর শাসন পরিচালনা করেছিলেন। অথবা এর কারণ ছিল, এরা শামে হজরত মুয়াবিয়ার ভালোবাসায় সিক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল। একইভাবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মও ওই একই পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের একটি ক্ষুদ্র দল ছিল। তবে তাবেয়ি ও গণ্যমান্য লোকদের এক বিরাট দল ছিল।

এরা হজরত মুয়াবিয়ার পক্ষ নিয়ে ইরাকিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। বস্তুত ইরাকিদের সাথে বিরোধিতার মানসিকতা নিয়েই তারা বড় হয়েছিল। আমরা আবেগের অনুকরণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এমনিভাবে হজরত আলির বাহিনী ও অধীনস্থদের ক্রমবিকাশ হয়েছিল হজরত আলির ভালোবাসা, তার পক্ষে লড়াই করা, তার বিরোধীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার চেতনা নিয়ে। এদের কেউ কেউ শিয়া মতবাদ নিয়ে সীমালঙ্ঘনও করেছিল। হে আল্লাহ, ওইসব লোকের কী অবস্থা হবে, যারা একটি দেশে লালিত-পালিত হয়েছে এবং তারা (নিজ নিজ দেশে হজরত আলি কিংবা হজরত মুয়াবিয়ার সাথে) ভালোবাসায় সীমালঙ্ঘনকারী ছাড়া কাউকে দেখেনি? এমতাবস্থায় ইনসাফ ও ভারসাম্যের পরিবেশ কী করে সৃষ্টি হতে পারে?

আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করছি যে, তিনি আমাদেরকে এমন যুগে সৃষ্টি করেছেন, যখন সত্য সুপ্রকাশিত এবং সাহাবায়ে কেরামের বিবদমান দুই পক্ষের অবস্থান স্পষ্ট। এখন আমরা উভয় পক্ষের প্রত্যেকের দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে জানি এবং (প্রকৃত অবস্থা) আমরা অবলোকন করতে পেরেছি। তাই আমরা তাদেরকে অপারগ মনে করছি এবং (তাদের জন্য) ইসতিগফার করছি। আমরা মধ্যপন্থা ও ভারসাম্য পছন্দ করি।

পাশাপাশি বিদ্রোহীদের কর্মকাণ্ডকেও আমরা একটি সমীচীন ব্যাখ্যায় ধরে নিব কিংবা এমন একটি ভুল বলে আখ্যায়িত করব, যা ইনশআল্লাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আমরা তাদের সম্পর্কে তেমনই বলব, যেমনটা আল্লাহ আমাদের শিখিয়েছেন-

> رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
>
> হে আমাদের প্রভু, ক্ষমা করুন আমাদেরকে এবং তাদেরকেও যারা ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়েছেন। আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য আমাদের অন্তরসমূহে কোনো বক্রতা রাখবেন না।[১৯০]

এরই সাথে আমরা ওইসব লোকের প্রতিও সন্তুষ্ট, যারা উক্ত উভয় পক্ষ থেকে পৃথক হয়ে ছিলেন। যেমন, হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হজরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা, হজরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-সহ অনেকেই।

তবে যেসব খারেজি দীন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, আমরা তাদের থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্তি ঘোষণা করছি, যারা হজরত আলি রা. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং সাহাবায়ে কেরামের উপরোক্ত দুই পক্ষকে কাফের বলেছিল'।[১৯১]

রাবি ও রেওয়ায়েত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাফেজি ও নাসেবিদের অদ্ভুত নিয়ম

হাদিসশাস্ত্রের ব্যক্তি ও বর্ণনা গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রেও রাফেজি বা নাসেবিদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও পন্থা রয়েছে, যার ভিত্তি কেবল কট্টর মানসিকতার উপর। রাফেজিদের পন্থায় বর্ণনা গ্রহণ করার মূল মাপকাঠি হচ্ছে 'রাফজ' তথা সাহাবা-বিদ্বেষ। কোনো রাবি যদি প্রথম তিন খলিফার সমালোচনা করে, তা হলে সে তাদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। এবার ইলম, স্মৃতিশক্তি, বিশ্বস্ততা ও সততায় সে যতই নীচু স্তরের হোক

---

[১৯০] সুরা হাশর, আয়াত ১০

[১৯১] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/১২৮,

না কেন। এমনকি যদি সে কাজ্জাব ও দাজ্জাল হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও কোনো অসুবিধা নেই।

অন্যদিকে নাসেবিদের দৃষ্টিতে কোনো রাবি গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রধান মাপকাঠি নাসেবি চিন্তা-চেতনার অধিকারী হওয়া। সুতরাং যদি কোনো রাবি থেকে ইয়াজিদ, মারওয়ান কিংবা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রমুখের বিরুদ্ধে কোনো কথা পাওয়া যায়, তা হলে সে তাদের নিকট অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এমনকি সে বুখারি ও মুসলিমের রাবি হলেও তারা তাকে যয়িফ, কাজ্জাব, শিয়া এবং রাফেজি প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। পক্ষান্তরে কোনো যয়িফ ও মাতরুক এমনকি আবু মিখনাফের মতো কাজ্জাবও যদি কোথাও ইয়াজিদ ও হাজ্জাজ সম্পর্কে কিংবা হজরত হাসান-হুসাইন ও হজরত আলি রা. এর বিরুদ্ধে কিছু বর্ণনা করে, তা হলে এরা তাকে অনাকাঙ্ক্ষিত গনিমত মনে করে তার উপর লুটিয়ে পড়ে। তারপর সেটিকে বুখারি-মুসলিমের বর্ণনার উপরেও প্রাধান্য দেওয়ার জন্য কোমর বেঁধে নামে।

আলহামদু লিল্লাহ, জমহুর তথা উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ বাড়াবাড়ি বা প্রান্তিকতার এই উভয় পন্থা পরিহার করে ন্যায়সঙ্গত নিয়মের আলোকে রাবি বা বর্ণনাকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করে থাকেন।

আবদুল্লাহ বিন সাবার পরিণতি কী হয়েছিল?

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সম্পর্কে একটি ধারণা এই যে, সে ওইসব মুলহিদ বা নাস্তিকের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা হজরত আলি রা. কে খালেক (সৃষ্টিকর্তা) ও রাযেক (অন্নদাতা) বলে দাবি করত। হজরত আলি তাদেরকে জীবিত জ্বালিয়ে ফেলেছিলেন। সহিহ বুখারি ও সুনানে আবু দাউদে এমনটিই বর্ণিত আছে।[১৯২] কিন্তু সহিহ বুখারি ও সুনানে আবু দাউদের ওই বর্ণনায় আবদুল্লাহ বিন সাবার নাম উল্লেখ নেই। শুধু এতটুকু আছে যে, হজরত আলি রা. কিছু জিন্দিককে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। এর উপর ধারণা করে কেউ কেউ বলেন, ইবনে সাবা তাদের মধ্যেই ছিল।

[১৯২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৯২২, কিতাবু ইসতিতাবাতিল মুরতাদ্দীন, সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪৩১৫, কিতাবুল হুদুদ, লিযানুল মীযান, ৩/ ২৮৯

অন্যদিকে শিয়া মতাদর্শীদের এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, ইবনে সাবা হজরত আলি রা. এর মৃত্যুর সময়ও জীবিত ছিল। তখন সে মাদায়েনে অবস্থান করছিল (তাকে দেশান্তর করে সেখানেই পাঠানো হয়েছিল)। হজরত আলির শাহাদাতের সংবাদ যে দিয়েছিল, ইবনে সাবা তাকে বলেছিল,

كذبت ان جئتنا بدماغه بسبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلا ما صدقناك لعلمنا انه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الارض.

তুমি মিথ্যা বলছ। যদি তুমি সত্তরটি থলেতে তার মগজ নিয়ে আসো, এবং তার হত্যার ব্যাপারে সত্তরজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী দাঁড় করাও, তবু আমি তোমাকে বিশ্বাস করব না। কেননা আমরা জানি, সে মরেওনি, নিহতও হয়নি। পুরো দুনিয়া দখল না করে সে মরবে না'।[১৯৩]

ধারণা করা হয়, আবদুল্লাহ বিন সাবা হজরত আলি রা. এর মৃত্যু পর্যন্ত জীবিত ছিল। কিন্তু যেহেতু সে পর্দার আড়ালে থেকে ষড়যন্ত্র করত, তাই কেউ জানতে পারেনি যে, কবে এবং কোথায় তার মৃত্যু হয়েছে। এ কারণেই ইতিহাস তার পরিণতি সম্পর্কে নীরব।

---

[১৯৩] ফিরাকুস শিআ, কৃত : হাসান বিন মুসা নাওবাখতী (মৃত্যু : ৩১০ হিজরি) পৃষ্ঠা : ২৩
ইবনে সাবার এই দাবির পেছনে ইহুদিদের সেই আকিদার ছাপ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, যাতে বলা হয়েছে, 'একদিন মাসিহে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে এবং সে তার অনুসারীদের জন্য গোটা পৃথিবী জয় করবে'।

ইতিহাসের শিক্ষা

১. হজরত উসমান রা. এর জীবনে আমরা একজন দয়াশীল, খোদাভীরু ও প্রজাহিতৈষী শাসকের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। সুতরাং পরকালের চিন্তায় চিন্তিত যেকোনো শাসক ও দলপতির জন্য তার জীবনাদর্শ অধ্যয়ন করা উচিত।

২. জীবনযাপন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হজরত উসমান রা. পূর্ববর্তী নিয়মের পরিবর্তে 'আযিমত' তথা শরিয়তের বিধানের চূড়ান্ত স্তর ও 'রুখসত' তথা উদার বৈধতার উপর আমল করেছেন। বৈধতা ও অবৈধতার সীমারেখা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এর ফলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই ন্যায়ানুগ পন্থা সামনে এসে গেছে, যার উপর কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্ চলতে পারবে।

৩. বিরোধী দলকে মেনে নিয়ে হজরত উসমান রা. ইসলামি রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ বিধানের বাস্তব প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। কার্যক্ষেত্রে তিনি শিখিয়ে গেছেন যে, বিরোধী দল যতক্ষণ পর্যন্ত সশস্ত্র হয়ে বিদ্রোহ না করবে; বরং শুধু রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক ও সমালোচনা ও অভিযোগের পর্যায়ে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে সুযোগ দেওয়া উচিত। প্রতিশোধের লক্ষস্থল বানানো উচিত নয়।

৪. একজন জনপ্রিয় শাসক হয়েও হজরত উসমান রা. উন্মুক্ত বৈঠকে বসে বিরোধীদের অন্তঃসারশূন্য আপত্তি ও অভিযোগের এক এক করে জবাব দিয়েছেন। বস্তুত একজন সফল ও প্রজাহিতৈষী শাসকের আদর্শ এমনই হয়ে থাকে।

৫. শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়েও হজরত উসমান রা. রাজনৈতিক বিরোধী মুসলমানদের রক্তে তার হাত রাঙাতে চাননি। তিনি নিজেকে এবং সকল মুসলমানকে এই অভিশপ্ত কাজ থেকে এবং পবিত্র শহর মদিনার অবমাননা থেকে দূরে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এমনকি এ আদর্শ বাস্তবায়নের পথে নিজের জীবনেরও পরোয়া করেননি।

অথচ বহুযুগ থেকে শক্তি ও ক্ষমতা হাতে পেয়ে লাগামহীনভাবে সাধারণ মুসলমানদের রক্তে হাত রাঙানো শাসকদের সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। এহেন প্রেক্ষাপটে সাহাবায়ে কেরামের সিরাতের এ অধ্যায়টি বিশেষ ভাবনার বিষয়।

৬. হজরত আলি রা.-ও সমাজে বিরোধী দলের অবস্থানের সুযোগ রেখেছেন। তবে শর্ত এই যে, তাদের নিরাপদ ও শান্তিকামী হতে হবে এবং ফেতনা-ফাসাদ থেকে দূরে থাকতে হবে।

এই শর্তের ভিত্তিতেই তিনি বিদ্রোহীদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। খারেজিদেরকেও সুযোগ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন তারা রক্তপাত ঘটাতে শুরু করে, তখন তিনি তাদের ব্যাপারে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৭. জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিন ছিল মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের দুটি প্রাথমিক ঘটনা, যা একইসাথে অত্যন্ত মর্মান্তিক, গভীর বেদনাবিধুর ও তিক্ত অভিজ্ঞতা দান করেছিল। তবে আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের এসব রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও লড়াই দ্বারা মুসলিমজাতিকে যে মানসিক, চিন্তাগত ও আদর্শিক শিক্ষা দান করেছেন, তা অন্য কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। এসব মতবিরোধের কারণে রাজনৈতিক অঙ্গনে মুসলমানদের মানসিক দৃঢ়তা এবং চিন্তা ও কর্মের দীক্ষার যে উপাদান প্রস্তুত হয়েছে, তা বহু দেশ বিজয়ের মাধ্যমেও অর্জিত হয়নি।

৮. এসব যুদ্ধে বিরোধীদের সঙ্গে অনুসৃত আচার-আচরণ পরবর্তী যুগে প্রণীত ফিকহশাস্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল-প্রমাণ সরবরাহ করেছে। বিদ্রোহীদের সম্পর্কে অধিকাংশ ফিকহি বিধান হজরত আলির জীবনী থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। তাই মুজতাহিদ ইমামগণ সাহাবায়ে কেরামের দ্বন্দ্বকে এই দৃষ্টিতেই দেখেছেন যে, এর থেকে আমাদের জন্য কী কী কর্মপন্থা বেরিয়ে আসছে। তারা এ বিষয়ক বর্ণনা থেকে বহু বিধান আহরণ করেছেন।[১৯৪]

---

[১৯৪] এর দৃষ্টান্ত অসংখ্য। ফিকহের এমন কোনো কিতাব হয়তো নেই, যাতে সাহাবায়ে কেরামের উক্ত লড়াই সংক্রান্ত ইবারত থেকে বিধান আহরণ করা হয়নি। এখানে

একারণেই ইমাম আবু হানিফা রহ. বলতেন, 'যদি লড়াই সম্পর্কে হজরত আলির আদর্শ সামনে না থাকত, তা হলে কেউ জানতেই পারত না যে, মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ের বিধান কী'।[১৯৫]

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলতেন, 'মুসলমানরা মুশরিকদের সাথে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করেছে, মুরতাদদের সাথে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর আদর্শ অনুসরণ করেছে, আর বিদ্রোহীদের

উদাহরণস্বরূপ ফিকহে হানাফি, ফিকহে শাফেয়ি, ফিকহে মালেকি ও ফিকহে হামবলির বিভিন্ন কিতাব থেকে কিছু ইবারত তুলে ধরা হলো।

الفقه الحنفى:

ولا يسبى لهم ذرية ولا يقسم لهم مال لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل : ولا يقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال وهو القدوة في هذا الباب (الهداية: المجلد الثانى، كتاب السير، باب البغاة)

ولا بأس بالقتال بسلاحهم وكراهم عند الحاجة إليه؛ معناه اذا كان لهم فئة فيقسم على اهل العدل ليستعينوا به على قتالهم ولانه يجوز الامام ان يأخذ سلاح المسلمين عند الحاجة فهذا أولى، وهو مأثور عن على رضـ ايضا يوم البصرة. (الاختيار لتعليل المختار: ١٥٢/٤)

الفقه الشافعى:

والحرب يوم صفين قائمة ومعاوية يقاتل جادا في أيامه كلها منتصفا أو مستعليا وعلى يقول لاسير من أصحاب معاوية لا أقتلك صبرا (الأم للشافعى: ٢٣٧/٤، ط المعرفة)

الفقه الحنبلى:

وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة فان أبا بكر رضي الله عنه قاتل ما نعي الزكاة وعلي قاتل أهل الجمل وصفين وأهل النهروان (المغنى لابن قدامة: ٥٢٣/٤)

ويجب على الامام ان يراسلهم اى البغاة ويسألهم ما ينقمون منه لان ذالك طريق الى الصلح ووسيلة الى الرجوع الى الحق وقد روى ان عليا راسل اهل البصرة قبل الجمل. (كشف القناع عن متن الاقناع للامام منصور بن يونس البهوتى الحنبلى: ١٦٢/٦، ط العلمية)

الفقه المالكى:

الرابعة جواز قتال كل من منع حقا عليه وقاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة بتأويل وقاتل علي رضي الله عنه البغاة الذين امتنعوا من بيعته وهم أهل الشام

(الذخيرة لاحمد بن ادريس القرافى: ٦/١٢، ط دار الغرب الاسلامى بيروت)

لم يتبع المنهزمين يوم الجمل، ولا ذفف على الجرحى؛ لأنهم لم تكن لهم فئة، ولا إمام يرجعون إليه، واتبع المنهزمين يوم صفين؛ لأن لهم إماماً وفئة. (المختصر الفقهى لابن عرفة: ١٧٤/١٠، مؤسسة خلف احمد)

[১৯৫] বুগিয়াতুত তলাব, ১/৩০২

সাথে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছে হজরত আলি রা. এর আদর্শ ও কর্মপন্থা'।[১৯৬]

৯. জঙ্গে সিফফিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতারও এক বড় প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছিল। কেননা তিনি ইরশাদ করেছিলেন, 'যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের এমন দুটি দল পরস্পরে লড়াই না করবে, যাদের দাবি একই হবে, ততদিন কেয়ামত কায়েম হবে না'।[১৯৭]

হাদিস ব্যাখ্যাকারদের মতে এ ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব উদাহরণ ছিল জঙ্গে সিফফিনে অংশগ্রহণকারী দুই দল। বস্তুত এমন সত্য সংবাদ একজন নবী ছাড়া কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

জমহুর ওলামায়ে কেরাম জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনে হজরত আলি রা. কে সঠিক ইজতিহাদকারী এবং প্রতিপক্ষ দলকে ভুল ইজতিহাদকারী বলে আখ্যায়িত করে আসছেন। এর কয়েকটি কারণ আছে। যথা :

১. হজরত আলি রা. শরিয়তসম্মত খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর সকল শ্রেণির জন্য তার অনুসরণ ছিল ওয়াজিব।

২. সহিহ সনদে বর্ণিত কয়েকটি এমন হাদিস উপস্থিত ছিল, যার আলোকে হজরত আলি রা. এর সত্যপন্থি হওয়াটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। যেমন,

---

১৯৬.

أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ السِّيرَةَ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَأَخَذُوا السِّيرَةَ فِي قِتَالِ الْمُرْتَدِّينَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَأَخَذُوا السِّيرَةَ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .(الحاوى الكبير شرح مختصر المزنى للامام الماوردى رحـ (م ٤٥٠هـ)، ط العلمية)

১৯৭

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ (صحيح البخارى، ح: ٧١٢١، كتاب الفتن، باب خروج النار، صحيح مسلم، ح: ٧٤٣٨، الفتن، باب اذا تواجه المسلمان بسيفهما)

ক.

হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. সম্পর্কে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন, تقتلك الفئة الباغية অর্থাৎ তোমাকে হত্যা করবে একটি বিদ্রোহী দল।[১৯৮]

হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. জাঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিন উভয়টিতে ছিলেন হজরত আলির পক্ষে। হজরত আলির পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে সিফফিনের যুদ্ধে তিনি নিহত হয়েছিলেন।

খ.

সহিহ হাদিসে اولى بالحق তথা সত্যের অধিক নিকটবর্তী দলের জন্য সুসংবাদ আছে যে, তারাই খারেজিদের পরাজিত করবে।[১৯৯]

নিহরুওয়ানের যুদ্ধের পর এ হাদিসও হজরত আলির সত্যতার সাক্ষী হয়েছিল।

হজরত আলির সত্যতা ও সঠিক ইজতিহাদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য উপরোক্ত দলিলই যথেষ্ট। তবে এ ছাড়াও কিছু ইঙ্গিত দ্বারা এর পক্ষে সমর্থনও পাওয়া যায়। যেমন :

- একবার হজরত উমর রা. এর কাছে শামের এক বিচারক এলো। হজরত উমর রা. বিচারকার্যের নীতিমালা সম্পর্কে তার সাথে কথা বললেন। কথা শেষ করে যখন সে বিদায় নিতে লাগল, তখন হঠাৎ তার একটি বিষয় মনে পড়ল। ফিরে এসে বলল, এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, সূর্য ও চন্দ্র পরস্পর লড়াই করছে। প্রত্যেকের সাথেই তারকারাজির বিরাট বাহিনী আছে।

  হজরত উমর রা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার সাথে ছিলে?

  বিচারক বলল, সূর্যের বিপক্ষে এবং চন্দ্রের পক্ষে।

---

[১৯৮] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৭০৬, কিতাবুল ফিতান, অধ্যায়: কেয়ামত আসবে না...., সুনানে তিরমিযী, হাদিস : ৪১৭০, অধ্যায়: মানাকিবে আম্মার রাযি.

[১৯৯] মুসনাদে হুমাইদী, হাদিস : ৭৬৬, সুনানে আবি দাউদ তায়ালিসি, হাদিস : ২২৭৯, সহিহ মুসলিম, হাসীস: ২৫০৭

সঙ্গে সঙ্গে হজরত উমর বলে উঠলেন, নাউযু বিল্লাহ। তারপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন-

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

আমি রাত্র ও দিনকে দুটি নিদর্শনরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর রাত্রের নিদর্শনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছি আর দিনের নিদর্শনকে আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছি।[২০০]

এ কথা বলে হজরত উমর রা. বলেন, 'চলে যাও, আল্লাহর কসম, তুমি আগামীতে কখনো আমার অধীনে কোনো পদে থাকবে না'।

পরবর্তীতে এই বিচারক জঙ্গে সিফফিনে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সাথে লড়াইরত অবস্থায় শহিদ হয়েছিল।[২০১]

- হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. এর মনেও এক সময় হজরত আলি রা. এর সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সন্দেহ হয়েছিল।[২০২] একদিন

---

[২০০] সুরা বানী ইসরাইল, আয়াত: ১২

[২০১] হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. কৃত মুসনাদুল ফারুক, ২/ ৫৪৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাদিস : ৩০৭০৫

এ বর্ণনার উপর এভাবে আপত্তি করা যাবে না যে, হজরত উমর রা. যদি উক্ত বিচারককে পদচ্যুত করে থাকেন, তাহলে এর পূর্বে হজরত মুয়াবিয়া রা. কে শামের গভর্নরের পদ থেকে কেন বরখাস্ত করলেন না?

আসলে এখানে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে, হরজত উমর রা. জানতে পারবেন যে, সিফফিনের যুদ্ধ হবে এবং কাদের মধ্যে হবে। ঐ বিচারকের স্বপ্ন থেকে তিনি কেবল এতটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে কোনো এক সময় একটি ভ্রান্ত দলের সাথে যুক্ত হয়ে সত্যপন্থি দলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তাই তিনি 'নাউযুবিল্লাহ' বলেছেন এবং সতর্কতাবশত বিচারককে বরখাস্ত করেছেন।

এখানে আরো স্মরণ রাখতে হবে যে, সনদের বিচারে উপরোক্ত বর্ণনায় দুর্বলতা আছে। সুতরাং কেউ যদি এটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষাও করে, তবু তাতে আহলে সুন্নতের মতাদর্শে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। এখানে শুধু একটি প্রমাণিত বিষয়ের সমর্থনে বর্ণনটি পেশ করা হয়েছে।

[২০২] এটা ঐ সময়ের কথা, যখন হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. ছিলেন বালক এবং মদিনায় লেখাপড়া করছিলেন। সে সময় উমাইয়া বংশের অন্যদের অভ্যাস মতো তিনিও হজরত আলি রা. র সমালোচনা ও নিন্দা করতেন। শেষে মদিনায় হাদিসের পাঠদানকারী এক উসতাদ তাকে সঠিক বিষয়টি বুঝান। তখন তিনি অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/১১৭) স্বপ্নের উক্ত ঘটনা সম্ভবত তাওবা করার পরে ঘটেছিল।

তিনি স্বপ্নে দেখলেন তিনি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে বসা। হজরত আবু বকর ও উমর রা.-ও সেখানে ছিলেন। এমন সময় হজরত আলি ও হজরত মুয়াবিয়া রা. কে সেখানে আনা হলো। তারপর তাদের উভয়কে একটি দরজার ভেতরে নিয়ে দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হলো। একটু পর হজরত আলি বাইরে এসে বললেন, 'রব্বে কা'বার কসম, আমার পক্ষে ফয়সালা করা হয়েছে। তার পেছনে পেছনে হজরত মুয়াবিয়াও বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, 'রব্বে কা'বার কসম, আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে'।[২০৩]

মোটকথা, উল্লিখিত সহিহ হাদিসের উপর গভীরভাবে চিন্তা করা এবং অন্যান্য কিছু ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকার কারণে কিছুদিন পর সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে হজরত আলির সঠিক ইজতিহাদকারী হওয়ার ব্যাপারে জমহুর আলেমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। সেই সাথে এটাও সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, হজরত তালহা, হজরত যুবাইর এবং হজরত মুয়াবিয়াও নিজ নিজ চিন্তা অনুসারে সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন এবং তারাও মুজতাহিদ ছিলেন। সুতরাং তারা গুনাহগার নন; বরং ভুল ইজতিহাদকারী ছিলেন। আর মুজতাহিদের ভুল ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং ইজতিহাদের কারণে তাকে সাওয়াবও দেওয়া হয়।

১০. পরবর্তী যুগের কোনো রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট দলের ব্যাপারে কোনো হাদিস নেই। তাই গোটা ব্যাপারটার ভিত্তি থেকে যায় নিজ সিদ্ধান্ত, চিন্তাভাবনা ও জানাশোনার উপর। আর মানুষের জ্ঞান ও গবেষণাকে আমরা যতই পূর্ণাঙ্গ মনে করি, কোনো না কোনো দিক থেকে তা অসম্পূর্ণ হতেই পারে।

---

[২০৩] ইবনুল জাওযি কৃত হজরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ রহ. এর জীবনাদর্শ, পৃষ্ঠা : ২৮৫

সনদের বিচারে এ বর্ণনা সম্পর্কে আপত্তি হতে পারে। তবে এটিকেও কেবল সমর্থন হিসেবে পেশ করা হয়েছে; মূল দলিল হিসেবে নয়। সুতরাং যদি হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এ স্বপ্ন না দেখতেন, অথবা এ সম্পর্কে কোনো বর্ণনাই না থাকত, অথবা কেউ যদি এ বর্ণনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখানও করে, তবু মূল বিষয় একইভাবে প্রমাণিত থাকবে।

সুতরাং খোদাভীরু ও কর্মতৎপর মানুষদের, বিশেষত উম্মাহর বিশিষ্ট পূর্বসূরিদের সিদ্ধান্তকে যথাসম্ভব তাদের সৎ উদ্দেশ্য ও কল্যাণকামিতা বলে ধরে নেওয়া আবশ্যক। যদি তাদের কোনো স্পষ্ট ভুলও দৃষ্টিগোচর হয়, তবু তার কারণে তাদের সমালোচনা ও নিন্দা করা যাবে না। একান্তই যদি কখনো মন্তব্য করতে হয়, তা হলে সুবিন্যস্ত আকারে করা এবং সাধ্যমতো সুধারণার পরামর্শ দেওয়া।

১১. একথা সত্য যে, হজরত আলি রা. ছিলেন বহুগুণের অধিকারী এবং মহান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারক। তবে তিনি তো একজন মানুষই ছিলেন। মানুষ হিসেবে তিনি একটি উৎকৃষ্ট জীবন কাটিয়ে গেছেন। তার ঈমান, আমল, আখলাক, কর্মপন্থা ইত্যাদি আমাদের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সারা জীবন তিনি এক আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন এবং তার কাছে সাহায্য চেয়েছেন। কথা ও কাজে তিনি এক আল্লাহর কাছে চাওয়ার শিক্ষাই দিয়েছেন।

তিনি নিজে বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। নানাবিধ দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েছেন। অতিবাহিত করেছেন অভাব ও দারিদ্র্যপীড়িত জীবন। তিনি আল্লাহর বান্দা ছিলেন। মাটি থেকে সৃজিত হয়েছিলেন এবং মাটিতেই সমাহিত হয়েছেন। অবিনশ্বর তো কেবল এক আল্লাহর অস্তিত্ব। বিপদ দূর করার ক্ষমতা কেবল তাঁরই আছে। তিনি সর্বদা ছিলেন এবং চিরকাল থাকবেন। প্রার্থনা শ্রবণ করা, পথহারাকে পথের দিশা দেওয়া এবং বিপদ থেকে উদ্ধার করা কেবল তার জন্যই শোভা পায়। আমাদের উচিত, তার আনুগত্য বজায় রেখে সর্বদা তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তার দীনের উপর অবিচল থাকা।

সাহাবিদের মতভিন্নতা ছিল শরিয়তের পূর্ণতা বিধানের উদ্দেশ্যে

শাইখুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রহ. সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ঘটে যাওয়া মতবিরোধ সম্পর্কে দুই জায়গায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যথা :

- শরিয়ত ও তরকিত কা তালাযুম' (শরিয়ত ও তরিকতের পারস্পরিক অবধারিত সম্পর্ক) শিরোনামের শুরু অংশে।

- 'আল ই'তিদাল ফি মারাতিবির রিজাল' (পূর্বসূরিদের মর্যাদাগত স্তরনির্ণয়ে ন্যায়ানুগ পন্থা) শিরোনামের শেষদিকে।

সুধী পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ থাকবে, শাইখুল হাদিস রহ. এর এ অধ্যায়গুলো অবশ্যই অধ্যয়ন করবেন। আমি এখানে নিজের ভাষায় তার সারমর্ম তুলে ধরছি।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ঘটে যাওয়া মতানৈক্য মূলত ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে শরিয়তের পূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যে। কেননা কোনো নিয়মেরই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা সাধিত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কার্যকর না করা হয়। একটি আইন মানবজাতির জন্য উপকারী না ক্ষতিকর, তার বাস্তব প্রমাণ তখনই পাওয়া সম্ভব যখন তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হবে। এ কথা সত্য যে, শরিয়তের প্রতিটি বিধানই এসেছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং মানুষের জন্য এর উপকারিতা অবশ্যই সুনিশ্চিত ও প্রমাণিত। তবু সাধারণ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সে আইন ও বিধানের বাস্তবতা ও কার্যকারিতার সুফল নিজ চোখে দেখতে না পায়, ততক্ষণ সে তার প্রতি নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর মানুষের নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য সব ধরনের শরয়ি বিধানের বাস্তব দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে তাকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। নিম্নে তার রূপরেখা তুলে ধরা হলো।

শরিয়তের বিধান মোট চার ধরনের। যথা :

১. প্রথমত যেসকল বিধান করে দেখানো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান ব্যক্তিসত্তার মর্যাদার দাবি ছিল। যেমন : নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, জিহাদ ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা এজাতীয় বিধান করিয়ে দেখিয়েছেন, যাতে উম্মত সরাসরি নবীর কাছ থেকে আমলি নমুনা বা বাস্তব দৃষ্টান্ত লাভ করে।

২. দ্বিতীয় প্রকারের বিধান ছিল এমন কিছু ভুল ও বিচ্যুতির সাথে সম্পৃক্ত, যেগুলো মহানবীর ব্যক্তিসত্তা থেকে প্রকাশিত হওয়াটাও 'ইসমাতে আমবিয়া' বা নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থি ছিল না। যেমন : নামাজের মধ্যে ভুলক্রটির কারণে সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়া, নামাজ কাযা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

এজাতীয় বিধানের পূর্ণতাও স্বয়ং নবী থেকে করানো হয়েছে। তাই কদাচিৎ নবীকে ভুলের শিকার করা হয়েছে। দু একবার নিদ্রাকে প্রবল করে দিয়ে ফজরের নামাজ কাযা করে দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, উম্মত যেন সরাসরি নবীর জীবন থেকে এজাতীয় সমস্যার শরয়ি বিধান জেনে নিতে পারে।

৩. তৃতীয় প্রকারের বিধান ছিল শরয়ি দণ্ডবিধির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, মদ্যপান, চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদির শাস্তি। কিন্তু যেহেতু নবীগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন, তাই নবীর মহান ব্যক্তিসত্তা থেকে এজাতীয় কাজে লিপ্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাই আল্লাহ তায়ালা কতিপয় অপরিচিত সাহাবির দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এজাতীয় কাজ করিয়ে দিয়েছেন। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তাদের উপর শরয়ি দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়েছে। ফলে পৃথিবীবাসীর সম্মুখে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে যে, এজাতীয় অপরাধের শাস্তি এমনই হয়ে থাকে।

যারা এজাতীয় অপরাধে লিপ্ত হয়েছিলেন, তারা নিজেরা অত্যন্ত পবিত্র ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও অভিপ্রায় তাদের থেকে এজাতীয় কাজ করিয়ে দিয়েছে, যাতে শরিয়তের বিধান কেবল মৌখিক ও লিখিত আকারেই না থাকে, বরং তার বাস্তব দৃষ্টান্তও যেন প্রমাণিত থাকে। কেননা এ ছাড়া শরিয়তের বিধানের পূর্ণতা সাধিত হতো না।

৪. চতুর্থ প্রকারের শরয়ি বিধান ছিল সেগুলো, যেগুলো কার্যকর করার জন্য আল্লাহর নবীর পবিত্র সময়টি সমীচীন ছিল না। কেননা এসব বিধানের সম্পর্ক ছিল ফেতনা-ফাসাদ, মতবিরোধ ও গৃহযুদ্ধের সাথে।

ইসলামে এসব বিষয়ের সমাধান ও এর সাথে সম্পৃক্ত নির্দেশাবলি আছে। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সময়ে এজাতীয় ফেতনা প্রকাশ পাওয়াটা ছিল মর্যাদা পরিপন্থি। তাই এ সংক্রান্ত বিধানের বাস্তব প্রয়োগের জন্য আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী সময়টি নির্ধারিত রেখেছেন। আর সেটাও এমন পরিস্থিতিতে যখন পৃথিবীর বুকে ইসলাম বিজয়ী ও শক্তিশালী হয়ে যাবে, যাতে অভ্যন্তরীণ ফেতনার কারণে ইসলামি রাজনীতি এতটা দুর্বল না হয়ে পড়ে যে, বহিরাগত

শক্তিগুলো ইসলামের উপর চড়াও হয়ে যাবে। মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ ফেতনা হজরত আলি রা. এর যুগে প্রকাশিত হয়। আর তাতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ফেতনা-পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত সকল শরয়ি বিধানের বাস্তব দৃষ্টান্ত একের পর এক সামনে আসতে থাকে। সেই সাথে এসব বিধান কার্যকর করার সুফলও দুনিয়ার সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা অল্প সময়ের ব্যবধানে মুসলিম উম্মাহ পুনরায় একতাবদ্ধ হয়ে যায়। আবার শুরু হয় বিজয়াভিযান ও উন্নয়নের ধারা।

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন দীন ও ইসলামের জন্য প্রকৃত জীবন উৎসর্গকারী। তাই একদিকে তারা দীন ও ইসলামের জন্য কদমে কদমে দিয়েছেন জান ও মালের কুরবানি। অন্যদিকে আল্লাহর অভিপ্রায় বাস্তবায়িত করার জন্য দিয়েছেন নিজদের মান-সম্মানের বিসর্জন।

সুতরাং শরিয়তের পূর্ণতা বিধানের জন্য মহান আল্লাহর অভিপ্রায় যখন তাদেরকে কোনো ভুল বা বিচ্যুতির শিকার করে, যার প্রায়শ্চিত্তে তাদের কারো হাত কাটা হয়, কাউকে চাবুক মারা হয়, আবার কাউকে জীবন্ত মাটিতে পুতে প্রস্তর বর্ষণ করা হয়, তখন তারা নিজেদের ভুলের কারণে অনুতপ্তও হয়েছেন, আবার আল্লাহর ইচ্ছার উপর সন্তুষ্টও রয়েছেন। তারা এ অভিযোগ করেননি যে, আমাদের মতো নবীর প্রিয় মানুষদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কেন এবং জনসম্মুখে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে কেন?

বরং তারা এই মানহানির ক্ষেত্রেও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশা করেছেন।

এরপর আল্লাহর নবীর তিরোধানের পঁচিশ বছর পর, একে অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গকারী এই খোদাপ্রেমিকগণই আল্লাহর সিদ্ধান্তের সম্মুখে নিরুপায় হয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। অজস্র সংখ্যায় কেটে কেটে ভূপাতিত হয়েছেন।

বাহ্যদৃষ্টির লোকদের মতে এটা ছিল নিছক রক্তক্ষয়। কিন্তু এখানে আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল ফেতনা পরিস্থিতি ও গৃহযুদ্ধবিষয়ক শরয়ি বিধানাবলি বাস্তবায়ন করে দেখানো। ফলে সাহাবায়ে কেরাম এসব

বিপদও সহ্য করেছেন। জান ও মালের সাথে সাথে মান-সম্মান ও সুনাম-সুখ্যাতিরও বিসর্জন দিয়েছেন। সর্বোপরি আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবধারিত এত বড় মর্মান্তিক ঘটনার উপরও তারা সন্তুষ্ট থেকেছেন।

সমালোচকরা সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্যে দেখছে কেবল তরবারির ঝঙ্কার এবং লাশের স্তূপ। ফলে সাহাবায়ে কেরামকে পার্থিব স্বার্থলিপ্সু মনে করে তারা গোমরাহ হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ এসব ঘটনার অন্তরালে দেখেছেন আল্লাহর অভিপ্রায় ও বিশেষ রহস্য। আর সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে তারা সেই আকিদাই পোষণ করেছেন, যা বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে।

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

সৃষ্টিগত রহস্য- কুরআন ও সুন্নাহর উপর বিশ্বাসের পরীক্ষা

সাহাবায়ে কেরামের দ্বন্দ্বকে যদি সৃষ্টিগত রহস্যাবলি উপেক্ষা করে বিবেচনা করা হয়, তা হলে এগুলোকে কেবল বিপদ ও দুর্যোগ বলেই মনে হবে। পক্ষান্তরে সৃষ্টিগত রহস্য সামনে রেখে বিবেচনা করলে এর মধ্যেও আল্লাহর বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ পরিলক্ষিত হবে।

তন্মধ্যে একটি রহস্য ঈমানদারদের ঈমানের পরীক্ষা নেওয়া। অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলিম উম্মাহর পরীক্ষা নেওয়া যে, এসব ঘটনা দেখা বা জানার পর তারা কি সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত আকিদাই পোষণ করে নাকি কট্টরপন্থি ও পথভ্রষ্টদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে নিজের রুচি অনুযায়ী কোনো মতবাদ দাঁড় করায়।

ইফকের ঘটনাও একটি পরীক্ষা ছিল?

চিন্তা করে দেখুন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবদ্দশায় ইফকের ঘটনার রূপে একটি ঝড় সৃষ্টি হয়েছিল, যা মূলত ছিল একটি পরীক্ষা যে, কুরআনের সত্যতার উপর ঈমান দৃঢ় হয়েছে কিনা।

হয়তো কেউ চিন্তা করতে পারে যে, যদি এ ঘটনা না ঘটত, তা হলে কত ভালো হতো! কেননা এ ঘটনার মাধ্যমে অসচ্চরিত্রের লোকেরা হজরত

আয়েশার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপের বাহানা পেয়ে গেছে। অথবা যদি সেই সফরটাই না হতো, কিংবা হজরত আয়েশা ওই সফরে না যেতেন, অথবা কমপক্ষে তার হারটা না হতো, আর তিনি যদি কাফেলার সাথে সাথে চলে আসতেন, তা হলে তো কারো মুখ খোলার দুঃসাহস হতো না।

কিন্তু এটা আমাদের চিন্তা হতে পারে। আসলে ভালো কোনটা হতো, তা আল্লাহই ভালো জানতেন। আর তার নিকট যেটা ভালো ছিল, সেটাই ঘটেছে। বাহ্যিকভাবে ঘটনাটি যদিও বেশ হৃদয়বিদারক ছিল, কিন্তু এর মাধ্যমে হজরত আয়েশার মর্যাদা ও সম্মান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পবিত্র কুরআনে তার চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে পূর্ণ দুটি রুকু অবতীর্ণ হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত এ আয়াতগুলো মানুষের সামনে থাকবে। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত ঈমানদারদের জন্য এসকল আয়াতের উপর ঈমান এনে হজরত আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব, সতীত্ব ও সততা মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে গেছে। আসলে এটা ছিল একটা পরীক্ষা, যা এখনো মুমিনের ঈমান পরখ করে। বহুলোক আজও তাদের দুর্ভাগ্যের কারণে এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে যায়। আর মুনাফিকরা মদিনায় যেসব মিথ্যা কথা প্রচার করেছিল, আজও তারা সেগুলোকে খাঁটি মনে বিশ্বাস করে বসে থাকে। সুতরাং এদের হাশর ওই মুনাফিকদের সঙ্গেই হবে।

সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্যে কীসের পরীক্ষা ছিল?

জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনেও এমনই দুটি পরীক্ষা ছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই দুই ঘটনায় সাহাবিদের মধ্যে কেবল মতপার্থক্যই হয়নি, বরং রক্তক্ষয়ী লড়াইও হয়েছিল। তবে কেয়ামত পর্যন্ত এ ঘটনা দুটি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত উভয় রূপে সংরক্ষিত থাকবে। ইফকের ঘটনার চেয়ে এ দুই ঘটনায় আরো কঠিন পরীক্ষা ছিল। কেননা অহির ধারা বহু আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ইফকের ঘটনার মতো কুরআনের আয়াত দ্বারা ঘটনার মূল রহস্য জানার কোনো উপায় ছিল না। কে সঠিক আর কে ভুলের শিকার, তাও জানার সুযোগ ছিল না। অবশ্য সহিহ হাদিসের সঠিক দলের কিছু নিদর্শন বলে দেওয়া হয়েছিল।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা

উক্ত দুই ঘটনায় প্রথম পরীক্ষা ছিল এই যে, সঠিক দলের ইঙ্গিত বহনকারী হাদিসসমূহ অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিয়ে আমরা হজরত আলি রা. এর সঠিক সিদ্ধান্ত এবং প্রতিপক্ষের ভুল স্বীকার করি, নাকি ওই হাদিসগুলো ছেড়ে দিয়ে অকারণে বিভিন্ন অপব্যাখ্যা দাঁড় করে নিজ নিজ মতের উপর জোর দিই।

দ্বিতীয় পরীক্ষা এই ছিল যে, হজরত আলি রা. এর সঠিক সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার সাথে সাথে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে আমরা কুরআন-হাদিসে বর্ণিত আকিদা পোষণ করি কি না। অর্থাৎ আমরা তাদের সাহাবি হওয়ার মর্যাদার প্রতি লক্ষ রাখি, নাকি তাদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার লক্ষস্থলে পরিণত করি, নাকি আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে তাদের ঈমানই অস্বীকার করে বসি।

মোটকথা, উক্ত দুই ঘটনায় এভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে যে, ব্যক্তিগত অভিমত ও স্বভাবগত আবেগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, নাকি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ন্যায় ও ইনসাফের পথ অবলম্বন করা হয়। এ পরীক্ষা আজও একইভাবে অব্যাহত আছে। যেসব লোক কুরআন ও সুন্নাহর সমস্ত বর্ণনা ও তার সকল দিক সামনে রেখে, সহিহ হাদিসের দূরবর্তী কোনো ব্যাখ্যা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে ভারসাম্যপূর্ণ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, তারা এবং তাদের অনুসারীরা এ পরীক্ষায় পূর্ণ সফল।

পক্ষান্তরে কট্টর মানসিকতা গ্রহণ করে হাদিসের বর্ণনা থেকে যারা যে পরিমাণ উদাসীনতা প্রদর্শন করবে, অথবা হাদিসগুলোর যতটা অপব্যাখ্যা করবে, তারা ততটাই এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে।

সাহাবিদের মতানৈক্য একদিক থেকে ক্ষতিকর কিন্তু অন্যদিক থেকে ছিল উপকারী

সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্য একদিক থেকে অবশ্যই হৃদয়বিদারক ছিল সত্য। তবে অন্যদিক থেকে এতে নিহিত ছিল আল্লাহর গূঢ় রহস্য। অর্থাৎ এর মধ্যে ছিল মুসলিমজাতিকে স্থায়ী ও শক্তিশালী করার উপাদান।

যদি বলা হয়, এসব ঘটনা ঘটেছিল কুরআন ও সুন্নাহর উপর মুসলিম উম্মাহর আকিদাকে সুদৃঢ় করার জন্য, তা হলে যথার্থই বলা হবে। কেননা পরীক্ষার মাধ্যমেই মানুষ পরিপক্ব ও শক্তিশালী হয়। পরীক্ষার মাধ্যমেই ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণীত হয়। পরীক্ষাতেই খড়-কুটো ও আবর্জনা চিহ্নিত হয়। পরীক্ষার পর ব্যক্তিত্ব থেকে মরীচিকা কেটে যায়। স্বর্ণ কয়লা থেকে বেরিয়েই খাঁটি রূপ লাভ করে।

খড়-কুটো পৃথক হয়ে গেছে

এ পরীক্ষা সংশয়-সন্দেহে পড়ায় অভ্যস্ত মুনাফিক ও বাজে চিন্তার লোকদেরকে উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে পৃথক করে দিয়েছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলের নামে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এসব মরীচিকা ও নষ্ট উপাদান যদি মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের সাথে মিশে থাকত, তা হলে ভেতরে ভেতরে আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রমাণিত হতো।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ

আল্লাহ এমনটা করতে পারেন না যে, তিনি মুমিনদেরকে এমন অবস্থায় ফেলে রাখবেন, যে অবস্থায় এখন তোমরা আছো; যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি অপবিত্রকে পবিত্র থেকে পৃথক করে না দেবেন।[২০৪]

মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরীণ কাঠামো সুদৃঢ় হয়েছে

এটা সত্য যে, মুসলিমজাতির জন্য এসব ঘটনা ছিল একটি জাতীয় দুর্যোগ ও আঘাত। কিন্তু এজাতীয় দুর্যোগ ও আঘাতের ফলে যেকোনো জাতির অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো শক্তিশালী হয়। উদাহরণস্বরূপ কিছুদিন পূর্বে শিশুদের জন্য মাটিতে খেলাধুলা করা এবং মাটি খাওয়া ক্ষতিকর মনে করা হতো। কিন্তু এ যুগের নতুন চিকিৎসাগবেষণা বলছে, যে শিশু মাটিতে খেলাধুলা করে বড় হয় এবং মাটি খায়, পরিণত বয়সে অন্যদের তুলনায় তার মধ্যে প্রতিরোধের সক্ষমতা বেশি থাকে। এর কারণ এই বর্ণনা করা হয় যে, মাটির সাথে সাথে যেসব রোগজীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করে, তা দেহকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জীবাণুতে সহনীয় করে

---

[২০৪] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯

তোলে। এর ফলে সাধারণ পর্যায়ের ক্ষতিকর বস্তু মানবদেহকে প্রভাবিত করতে পারে না।

পক্ষান্তরে যে শিশু সম্পূর্ণ রোগ-জীবাণুমুক্ত পরিবেশে বড় হয়, সে কর্মজীবনে গিয়ে বাইরের পরিবেশে সাধারণ থেকে সাধারণ কারণেও সর্দি, কাশি, ঠান্ডা, জ্বর ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। একইভাবে যে শিশু অত্যন্ত আদর-সোহাগে প্রতিপালিত হয়, শীত-গরম থেকে যাকে খুব সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করা হয়, সে বড় হয়ে সাধারণ ঠান্ডা কিংবা সাধারণ গরমেও অসুস্থ হয়ে পড়ে। এর বিপরীতে শিশু বয়সে যারা শীত-গরম সহ্য করে বড় হয়, বড় হয়ে তারা প্রচুর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে।

ঠিক তদ্রূপ মুসলিম উম্মাহ তার শৈশবে যে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ ও পরীক্ষার মোকাবেলা করেছে, তার দ্বারা উম্মাহর প্রতিরোধ-ক্ষমতা শক্তিশালী হয়েছে। একারণেই চৌদ্দশ বছরে বহু বিপদ ও হাজারো ঝড়-ঝাপটার মুখোমুখি হয়েও মুসলিম উম্মাহ আজো টিকে আছে। শুধু তা-ই নয়, বরং দিন দিন তার পরিধি আরো বিস্তৃত হচ্ছে।

সাহাবিদের মতানৈক্য কি 'রুহামাউ বাইনাহুম' (পরস্পর দয়াশীল)-এর পরিপন্থি?

কেউ কেউ বলে থাকেন, সাহাবিদের পারস্পারিক ঝগড়া ও মতবিরোধ কুরআনের আয়াত رحماء بينهم এর পরিপন্থি। কেননা কুরআনে এ আয়াতে বলা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম একে অপরের জন্য ছিলেন দয়াশীল ও উদার। অথচ ইতিহাসের উপরোক্ত ঘটনাবলি বলছে তার বিপরীত কথা। সুতরাং যেসব ইতিহাসে এসব ঘটনা লেখা আছে, তাকে জলে ফেলে দেওয়া উচিত।

কিন্তু প্রথম কথা হলো, একথাই সম্পূর্ণ ভুল যে, মতবিরোধের ঘটনা শুধু ইতিহাসে আছে। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ ও মনোমালিন্যের বিভিন্ন ঘটনা তো হাদিসের কিতাবেও আছে। শুধু সাধারণ পর্যায়ের সাহাবিদের কথাই নয়, আল্লাহর নবীর পুণ্যবতী স্ত্রীদের মধ্যেও মাঝেমধ্যে এমন মনোমালিন্য হয়েছে, যার ঘটনা হাদিসের যেকোনো পাঠকেরই জানা থাকার কথা। শুধু তা-ই নয়, বরং খোলাফায়ে

রাশেদিনের মধ্যেও এমন মনোমালিন্যের দু' একটি ঘটনা পাওয়া যাবে। এমনকি হাদিসে প্রমাণিত আছে যে, স্বয়ং আল্লাহর নবী কোনো কোনো স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ঈলা পর্যন্ত করেছিলেন। কিন্তু এগুলোর কোনোটাকেই ভালোবাসা ও সম্প্রীতির পরিপন্থি বলা যায় না।

আসলে নিজেদের মধ্যে কখনো কখনো মিষ্টি অভিমান কিংবা কথা কাটাকাটি হওয়া কখনোই ভালোবাসা ও হৃদ্যতার পরিপন্থি নয়। এমন কোন পরিবারে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনের মধ্যে মাঝেমধ্যে মনোমালিন্য হয় না? কিন্তু তাই বলে তো এসব আত্মীয়তার সম্পর্কে কোনো ছেদ পড়ে না।

এমনিভাবে বন্ধুদের মধ্যে, কখনো উসতাদ ও শাগরিদদের মধ্যেও মনোমালিন্য হয়। এমনকি অনেক সময় তা তিক্ততা পর্যন্ত গড়ায়। বিশেষত যেখানে মেধাবী ও উন্মুক্ত চিন্তার মানুষের বসবাস থাকে, সেখানে মতবিরোধ একটি অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। সাহাবায়ে কেরামের পরিবেশও ছিল এমনই কৃত্রিমতামুক্ত। কেউ কারো অর্থহীন অনুসরণ কিংবা অন্ধ অনুকরণ করত না। বরং যার কাছে যেটা সঠিক মনে হতো, কল্যাণকামিতার সঙ্গে প্রকাশ্যে তা বলে দিতেন। আমরা যদি আমাদের ঘরের ভাই-বোন ও প্রিয়জনদের মধ্যে এজাতীয় ঘটনাকে ভালোবাসার পরিপন্থি মনে না করি, তা হলে শুধু সাহাবায়ে কেরামের এসব ঘটনাকে কেন এই দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হবে যে, 'এর দ্বারা বোঝা যায় তারা একে অপরের প্রাণের শত্রু ছিলেন'?

সাহাবায়ে কেরামের অন্তর ছিল নিষ্পাপ শিশুর মতো কোমল ও পবিত্র। শিশুরা যেমন একে অপরের সাথে ঝগড়া করে একটু পরই আবার হাসি-খুশি খেলতে শুরু করে, ঠিক তেমনই সাহাবিগণ সাময়িক মনোমালিন্যের পর দ্রুত দুধ-চিনির মতো একে অপরের সাথে মিশে যেতেন। তা ছাড়া তাদের বহু মতবিরোধ ছিল নিরেট ইলমি ও ফিকহি পর্যায়ের। আর এমন মতবিরোধ সকল শ্রেণির আলেমের মধ্যে হরহামেশা হয়ে থাকে।

দু'একটি ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে লড়াই ও যুদ্ধ হয়েছিল, তা-ও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তাদের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থি নয়। কেননা কুরআনে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে যেমন رحماء بينهم (তারা নিজেদের মধ্যে ছিলেন দয়াশীল) বলা হয়েছে, তেমনি এও বলা হয়েছে যে, ৮

يخافون في الله لومة لائم (তারা আল্লাহর ক্ষেত্রে কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করতেন না)।

সুতরাং তারা যে যে বিষয়কে শরিয়তের আদেশ বলে মনে করতেন, তাকে সম্পাদন করার জন্য জীবন দিতে কিংবা জীবন নিতেও প্রস্তুত ছিলেন। যে ঈমানি আত্মমর্যাদার কারণে হজরত মুসা আ. আপন ভাই হারুন আ. এর দাড়ি ধরেছিলেন, যে আবেগ ও উদ্দীপনার কারণে হজরত ইবরাহিম আ. আপন পুত্র হজরত ইসমাইল আ. এর গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন; ঠিক সেই আত্মমর্যাদা এবং সেই আবেগ ও উদ্দীপনার কারণেই সাহাবায়ে কেরাম জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনে হতাহত হয়েছিলেন। যেমনিভাবে হজরত মুসা ও হারুন আ. এবং হজরত ইবরাহিম ও ইসমাইল আ. এর ঘটনাবলিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না, এবং এগুলোকে কোনো নেতিবাচক ইচ্ছা হিসেবেও বিবেচনা করতে পারবে না, তেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করাও অসম্ভব এবং একে কোনো ভুল অর্থে ধরাও পথভ্রষ্টতা। যেভাবে উপরোক্ত নবীগণের ঘটনাবলি তাদের নিষ্পাপ বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থি নয়, ঠিক সেভাবেই সাহাবায়ে কেরামের উপরোক্ত ঘটনাবলি সাহাবায়ে কেরামের সত্যের মাপকাঠি হওয়ার মোটেই পরিপন্থি নয়। তবে শর্ত হলো, দৃষ্টি ও বিবেচনা সুস্থ হতে হবে।

মুয়াবিয়া রা. এর ইজতিহাদি ভুল সম্পর্কে হজরত থানবির উক্তি

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রহ. বলেছেন, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ঘটনায় মনে পড়ল। এক ব্যক্তি একজন স্বল্প ইলমের মৌলবির কাছে প্রশ্ন করল, হজরত মুয়াবিয়া রা. ও হজরত আলি রা. এর মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাজটি কোন স্তরের ছিল?

মৌলবি সাহেবের ইলম কম হলেও মেধা ছিল বেশ প্রখর। বললেন, ভাই, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ভুলটা ছিল ইজতিহাদি। এ কারণে বিষয়টি হালকা হয়ে গেছে (হজরত থানবি রহ. বলেন, আমাদের বুজুর্গদের আকিদাও এটাই)।

এ কথা শুনে লোকটি বলল, মানুষ যে স্তরের হয়, তার ভুলও সে পর্যায়ের হয়। সুতরাং এ ভুলের কারণে তার কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত।

মৌলবি সাহেব বললেন, আরে! এটা কি কম শাস্তি যে, আমাদের মতো অযোগ্যরা একজন সাহাবি সম্পর্কে মন্তব্য করছি, তিনি ভুল করেছিলেন? তার জন্য তো এটাই বিরাট শাস্তি। নতুবা কোন্ মুখে আমরা এমন কথা বলতে পারি? কোথায় একজন সাহাবি আর কোথায় আমাদের মতো গান্ধা পাপি!

হজরত থানবি রহ. বলেন, আসলেই বড় আশ্চর্য উত্তর।[২০৫]

রাজনৈতিক মতবিরোধের সময় উপযুক্ত কর্মপন্থা

রাজনৈতিক ও ব্যবস্থাপনাগত বিষয়গুলো সবসময় বহুমুখী হয়ে থাকে। ঘর কিংবা মহল্লা, প্রদেশ কিংবা রাষ্ট্র, রাজনীতি যে অঙ্গনেরই হোক, এর যেকোনো বিষয়ে মানুষের মতামত, পরামর্শ ও সিদ্ধান্তে ভুলের আশংকা থেকেই যায়। কেউ এমন নিশ্চয়তা সহকারে মত ব্যক্ত করতে পারে না যে, তার ফল হবে পুরোপুরি কাঙ্ক্ষিত। কোনো উদ্যোগ গ্রহণের সময় পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না যে, আমরা যেমন চাচ্ছি এ সিদ্ধান্তের ফল ঠিক তেমনই হবে। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেই আমাদের কাছে শতভাগ নিশ্চিত জ্ঞান থাকে না। আমরা অন্যদের চিন্তা-চেতনা, আবেগ ও সংকল্প সম্পর্কেও পুরোপুরি জানি না। যেমন: জানি না নিজেদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ভবিষ্যৎ।

রাজনৈতিক দায়িত্ব ও জাতীয় চাহিদা পূরণের জন্য গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপের ক্ষেত্রে মানুষ কেবল এটাই করতে পারে যে, নিয়ত ও উদ্দেশ্য ভালো রাখবে। ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা ও মুনাফা কুড়ানো থেকে দূরে থাকবে। জাতির কল্যাণে নিজেও গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবে এবং অন্যদের সাথেও পরামর্শ করবে। আল্লাহ তায়ালার শরিয়ত ও চারিত্রিক সীমারেখার মধ্যে থেকে সময়, যুগ ও পরিবেশ-পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করবে। এতটুকু করে একজন নেতা তার দায়িত্ব থেকে আল্লাহর দরবারেও মুক্তি পেয়ে যায়, আবার বান্দার নিকটও।

কিন্তু ভবিষ্যতে যদি এই উদ্যোগের ফল পূর্ণরূপে কিংবা আংশিকভাবে নেতিবাচক দেখা যায়, তা হলে উক্ত নেতার উপর চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেও কোনো অভিযোগ আসতে পারে না, শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকেও না।

---

[২০৫] মালফুজাতে হাকিমুল উম্মত থানবি : ১/৪১, ৪২, মালফুজ নম্বর : ১৭

কেননা সে নিজের সাধ্য অনুযায়ী খাঁটি নিয়ত, কল্যাণকামিতা, চিন্তাভাবনা ও সতর্কতার দাবি অনুযায়ী কাজ করেছে।

রাজনৈতিক ও ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে উভয় পক্ষের আন্তরিক ও জতির জন্য কল্যাণকামী হওয়া সত্ত্বেও কখনোবা তাদের মধ্যে বিরোধ হতে পারে। এ মতানৈক্য বিরোধ থেকে অগ্রসর হয়ে লড়াই ও যুদ্ধের রূপও ধারণ করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির জন্য এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয়ে যায় যে, দুই দলের মধ্যে কারা সঠিক আর কারা ভুল। কেউ বলতে পারে না, আল্লাহর নিকট কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাচারী। এমতাবস্থায় মানুষকে দুটি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যথা :

ক. তার তার কাছে ব্যাপারটি জটিল মনে হয়, তা হলে সে এর থেকে পৃথক থাকবে।

খ. আর যদি কোনো পক্ষের সঙ্গে থাকার দ্বারা জাতীয় কল্যাণের আশা থাকে এবং ওই পক্ষের অবস্থানও সঠিক বলে মনে হয়, তা হলে তার সঙ্গেই থাকবে।

রাজনৈতিক মতবিরোধের ৩টি ধরন

রাজনৈতিক মতবিরোধের ৩টি ধরন হতে পারে। যথা :

১. রাজনৈতিক দ্বন্দ্বটা যদি মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে হয়, তা হলে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয় না। কেননা আকিদা-বিশ্বাসের পার্থক্যই সেক্ষেত্রে সত্য ও মিথ্যা স্পষ্ট করে দেয়।

২. এমনিভাবে যদি কোনো দুরাচারী ও সৎলোকের মধ্যে কিংবা কোনো জালিম ও মজলুমের মধ্যে বিরোধ হয়, তা হলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া অতটা কঠিন হয় না।

৩. কিন্তু যদি রাজনৈতিক মতবিরোধকারী উভয় দল আকিদা ও আখলাক এবং উদ্দেশ্য ও কর্মের ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের হয়, তা হলে ব্যাপারটি খুব জটিল হয়ে যায়। কিন্তু এজাতীয় ক্ষেত্রেও চোখ বন্ধ করে বসে থাকা যায় না। কেননা এমন মতবিরোধ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার, যা হরহামেশাই মনুষ্যসমাজে হয়ে আসছে এবং হতে থাকবে।

তৃতীয় প্রকার মতবিরোধের ব্যাখ্যা

এখন এই তৃতীয় প্রকারের মতবিরোধে দুটি প্রশ্ন দেখা দেয়। যথা : একটি প্রশ্ন দেখা দেয় এ বিরোধের সাথে সরাসরি জড়িত কিংবা দ্বন্দ্বকালীন সময়ে উপস্থিত লোকদের সামনে। আরেকটি প্রশ্ন দেখা দেয় মতবিরোধ পরবর্তী সময়ের লোকদের সম্মুখে কিংবা যারা ওই বিরোধের সাথে জড়িত নয় তাদের সম্মুখে।

প্রথম প্রশ্নের সমাধান

সরাসরি জড়িত কিংবা উপস্থিত লোকদের সম্মুখে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই রাজনৈতিক বিরোধে তারা কার পক্ষ অবলম্বন করবে? অন্যদিকে পরবর্তী সময়ের লোকদের সম্মুখে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তারা ওই বিরোধপূর্ণ দল বা ব্যক্তিদের সম্পর্কে কী মত পোষণ করবে?

এজাতীয় জটিল বিরোধের ক্ষেত্রে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনের সাথে জড়িত সাহাবি ও তাবেয়িদের কর্মপন্থা আমাদের নিশ্চিন্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে। যার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

ক.

সরাসরি জড়িত হওয়ার বিষয়ে আমরা জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিন থেকে এই শিক্ষা পাই যে, যদি বিষয়টি আমাদের কাছে জটিল মনে হয়, অথবা তাতে প্রতিভা ক্ষয় করা জাতির জন্য কল্যাণপ্রসূ না হয়, তা হলে আমরা তার থেকে পৃথক থাকব। যদি আগে কোনো দলের সাথে জড়িত হয়েও থাকি, তা হলে জটিলতা প্রকাশ পাওয়ার পর পৃথক হয়ে যাব। যেমন : হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. আবদুল্লাহ বিন উমর রা. এবং হজরত উসামা বিন যায়েদ রা. করেছেন। অথবা যেমন হজরত যুবাইর রা. জঙ্গে জামাল চলাকালীন পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

খ.

কিন্তু যদি কোনো রাজনৈতিক দলের জাতীয় কল্যাণকামিতা, চরিত্র ও কর্ম, প্রচার ও আহ্বানের প্রতি আমাদের আস্থা থাকে, আর আমরা মনে করি যে, শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের সঙ্গে থাকা সঠিক, আর তাতে জাতীয় কল্যাণও রক্ষিত হয়, তা হলে আমরা সে দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাব। যেমন সাহাবায়ে কেরামের বিরাট একটি দল হজরত আলির

সঙ্গে একাত্ম ছিলেন এবং আরেকটি বিরাট দল হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সঙ্গে ছিলেন। একইভাবে হজরত তালহা রা. এবং হজরত যুবাইর রা. এর সঙ্গেও অনেকেই ছিলেন। অথচ এটা স্পষ্ট যে, কোনো ফেরেশতা এসে বলবে না যে, কে সত্যবাদী আর কে অসত্যের উপরে আছে। সিদ্ধান্তের ভিত্তি শরয়ি দলিল-প্রমাণ, বিচার-বিশ্লেষণ ও চিন্তাভাবনার যোগ্যতার উপরই থাকবে। সে অনুসারেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধান

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি রাজনীতি থেকে দূরে থাকা কিংবা মতবিরোধের পরবর্তী সময়ের লোকদের সম্মুখে দেখা দেয়, তা হলো, ওই বিরোধপূর্ণ ও লড়াইরত দলগুলো সম্পর্কে কী আকিদা পোষণ করা হবে, বাহ্যিকভাবে যাদেরকে সৎকর্মপরায়ণ, দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকামী ও শরিয়তের প্রতি যত্নবান মনে হয়?

এক্ষেত্রে জঙ্গে জামাল ও সিফফিনের প্রেক্ষাপট আমাদের বলছে, বড় ও সম্মানিত লোকদের সাথে আদব ও ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে। ইসলামি আইন পরিবর্তন করা কিংবা গোপন করা তো জায়েজ নেই। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইলমি পর্যালোচনায় কোনো একটি দলকে সঠিক বলাটা আবশ্যক হয়ে যায়। তারপর বিষয়টি নিজে বোঝা এবং অন্যকে বুঝানোর জন্য যৌক্তিক ও শরয়ি দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করাও আলেমদের জন্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমার মধ্যেই রাখা উচিত। অন্তর থেকে প্রত্যেক দলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখতে হবে। সেই সাথে তাদের এ নিষ্ঠা ও আবেগকেও শ্রদ্ধা জানাতে হবে যে, তারা যে যে অবস্থানকে সঠিক বলে মনে করেছেন, তারা সেটির উপর অবিচল থেকেছেন। সুতরাং তাদের খোদাভীরুতা, জাতীয় কল্যাণকামিতা, নির্মোহতা এবং ভদ্রতা ও বিশ্বস্ততার বিরুদ্ধে আঙুল তুলে নিজের জবান ও কলম নোংরা করা যাবে না।

অপ্রয়োজনে সাহাবিদের মতানৈক্যের আলোচনা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা

সাহাবায়ে কেরামের মতপার্থক্য এমন কোনো প্রিয় বিষয় নয় যে, বিনাপ্রয়োজনে তাকে ছড়াতে হবে। বিশেষত সাহাবায়ে কেরামের দোষ

বের করার নিয়তে এ বিষয়ে মনোনিবেশ করা তো ঈমানকে ধ্বংস করার সমার্থক। এ কারণেই আমাদের পূর্বসূরি মহান মনীষীগণ সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্যের বিষয়ে হজরত আলির সিদ্ধান্তকে সঠিক এবং তার বিরুদ্ধে লড়াইকারীদের সিদ্ধান্ত ভুল বলে আকিদা পোষণ করা সত্ত্বেও উন্মুক্তভাবে সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ের আলোচনা থেকে বিরত থাকতে বলতেন। যেমন,

ইমাম কুরতুবি রহ. বলতেন, 'হজরত হাসান বসরি রহ. কে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতানৈক্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

> قتال شهده اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقنا.
>
> জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিন ছিল এমন যুদ্ধ, যাতে আল্লাহর নবীর সাহাবিগণ উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু আমরা ছিলাম অনুপস্থিত। তারা (তৎকালীন অবস্থা) জানতেন, আমরা জানতাম না। (যে বিষয়গুলোতে) তারা একমত হয়েছেন, আমরা তাতে তাদের অনুসরণ করেছি। আর (যে বিষয়গুলোতে) তারা মতবিরোধ করেছেন, তাতে আমরা নীরবতা অবলম্বন করেছি'।[২০৬]

ইমাম আবু বকর বাকিল্লানি রহ. এর একটি রচনার নিম্নোক্ত কথাটিও চিন্তা করার মতো। তিনি বলেন, 'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে প্রশ্ন করা হলো, সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্য সম্পর্কে আপনি কী বলেন?

তিনি বলেন, আমি তা-ই বলি, যা আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে বলেছেন-

> رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
>
> হে আমাদের প্রভু, ক্ষমা করুন আমাদেরকে এবং তাদেরকেও যারা ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন।

---

[২০৬] তাফসিরে কুরতুবি : ১৬/৩২২, সুরা হুজুরাত

আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য আমাদের অন্তরসমূহে কোনো বক্রতা রাখবেন না।[২০৭]

(একই প্রশ্ন) করা হয়েছিল হজরত জাফর সাদিক রহ. কে। উত্তরে তিনি বলেছেন, 'আমি তা-ই বলি, যা আল্লাহ এই আয়াতে বলেছেন-

عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَ لَا يَنْسَى

তাদের জ্ঞান আমার প্রভুর নিকট (আমলনামায়) নথিভুক্ত আছে, আমার প্রভু ভুলও করেন না, ভুলেও যান না।[২০৮]

কোনো কোনো বুজুর্গের কাছে প্রশ্ন করা হলে তারা বলেছেন,

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

তারা ছিলেন (মহান ব্যক্তিদের) এক দল, যারা গত হয়ে গেছেন। তারা যা করেছেন, তা তাদেরই জন্য, আর তোমরা যা করবে, তা তোমাদের জন্য। তারা যা করেছেন, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জবাবদিহি করা হবে না।[২০৯]

একই প্রশ্ন হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. কেও করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন,

تلك دماء طهر الله يدى منها، افلا اطهر منها لسانى؟

তাদের রক্ত থেকে আল্লাহ আমার হাত পবিত্র রেখেছেন, সুতরাং আমি কি আমার জবানকে তাদের সমালোচনা থেকে পবিত্র রাখব না?

তারপর তিনি বলেন,

مثل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، وداء العيون ترك مسها.

[২০৭] সুরা হাশর, আয়াত ১০

[২০৮] সুরা তহা, আয়াত ৫২

[২০৯] সুরা বাকারা, আয়াত ১৩৪

আল্লাহর রাসুলের সাহাবায়ে কেরাম হলেন চোখের ন্যায়। আর চোখের চিকিৎসা এটাই যে, তাকে স্পর্শ করা যাবে না।[২১০]

যেসকল সাহাবি থেকে ইজতিহাদি ভুল হয়েছে, তাদের প্রতি অন্তরে কোনো ধরনের ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করা জায়েজ নেই। সর্বাবস্থায় তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা আবশ্যক। নিম্নের ঘটনা এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তার দাবিদার।

ইমাম আবু যুরআ রহ. এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলতে লাগল, 'মুয়াবিয়ার প্রতি আমার বিদ্বেষ আছে'।

ইমাম আবু যুরআ প্রশ্ন করলেন, কেন?

সে বলল, কারণ সে হজরত আলির বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করেছে।

ইমাম আবু যুরআ বললেন,

رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما.

মুয়াবিয়ার প্রভু মহান দয়াশীল আর মুয়াবিয়ার প্রতিপক্ষ একজন ভদ্র প্রতিপক্ষ। সুতরাং তুমি কেন তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছ?[২১১]

***

---

[২১০] আল ইনসাফ লি আবি বকর আল বাকিল্লানি, পৃষ্ঠা : ৬৬,

[২১১] ফাতহুল বারি, ১৩/ ৮৬, তারিখে দিমাশক, ৫৯/ ১৪১

অন্যান্য জাতির ধর্মীয় যুদ্ধের সাথে সাহাবিদের মতানৈক্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সুধী পাঠক, আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধ ও মতানৈক্য বিষয়ক সঠিক তথ্যচিত্র আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমরা পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলতে পারি, এটি এমন কোনো ইতিহাস নয়, যার দরুন আমাদেরকে বিজাতিদের সম্মুখে লজ্জিত হতে হবে কিংবা হীনম্মন্যতার শিকার হতে হবে।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ধর্মীয় নেতারা ধর্মের নামে যেসব যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে দিয়েছে, তার বিবরণ এতটাই মর্মন্তুদ যে, গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়। ইতিহাস সাক্ষী, খ্রিষ্টানদের দুই বড় দল ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টেন্ট মতাদর্শের ধর্মীয় গুরুরা যখন পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হলো, মানবতাকে তখন মাটির গভীরে জীবন্ত দাফন করা হয়েছিল। গির্জার তথাকথিত 'পবিত্র পিত'গণ নিজেদের মতবিরোধের জের ধরে যে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, ইউরোপের ইতিহাসে তার বিবরণ এখনো আছে। পড়ে দেখুন। এখানে শুধু নমুনাস্বরূপ তার একটি চিত্র মাওলানা মানাযির আহসান গিলানি রহ. এর কলম থেকে তুলে ধরছি।

'এই দ্বন্দ্বে পৃথিবীর কোন কোন শহরে কতবার ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল আর সে হত্যাকাণ্ডে কী পরিমাণ মানুষ বলির শিকার হয়েছিল, তার সূচি ইউরোপের বিস্তারিত ইতিহাসে দেখা যেতে পারে। তন্মধ্যে একটি দাঙ্গ হয়েছিল ফ্রান্সে, যা ইতিহাসে 'বার্থলির দাঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, ওই দাঙ্গায় টানা ন'দিন পর্যন্ত প্রোটেস্টেন্ট মতাদর্শের খ্রিষ্টানদের নারী-পুরুষকে গণহারে হত্যার আদেশ জারি করা হয়েছিল। ইতিহাসে লেখা আছে, গর্ভবতী মায়েদের পেট চিঁড়ে গির্জার ক্যাথলিক জানোয়ারেরা জীবন্ত নবজাতককে টেনে বের করত এবং কুকুরের সম্মুখে ছুড়ে দিয়ে চেয়ে চেয়ে তামাশা দেখত, কীভাবে কুকুর বাচ্চাটিকে জীবন্ত ছিঁড়ে-ফেড়ে খাচ্ছে। প্যারিসের সিন নদী নিহতদের রক্তে লাল হয়ে

গিয়েছিল। মোটকথা, ধারণা করা হয়েছে, আকিদা-বিশ্বাসের এই দ্বন্দ্বে যাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে, জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে, কিংবা অন্যকোনো উপায়ে যাদেরকে হত্যা কিংবা জবাই করা হয়েছে, তাদের সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ'।[২১২]

এত শুধু ইউরোপের চিত্র। হিন্দু, খ্রিষ্টান, ইহুদি, বৌদ্ধসহ পৃথিবীর এমন কোনো জাতি নেই, যাদের ধর্মীয় ইতিহাস অত্যন্ত ভয়ানক রকমের জুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ নয়।

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর একটা বড় অংশ তাদের ধর্মীয় গুরু, বরং দেব-দেবীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ, রক্তপাত, প্রতিশোধ, এমনকি কোনো ক্ষেত্রে লজ্জাষ্কর কাহিনিতে ভরপুর। রামায়ণ থেকে মহাভারত পর্যন্ত সমস্ত কথা পড়ুন। দেখবেন, স্থানে স্থানে যুদ্ধের ময়দান গরম হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের লড়াইয়ের ঘটনায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। ভাই ভাইয়ের সাথে, পিতা পুত্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও হিন্দুদের অবস্থা হলো, তারা তাদের ধর্মীয়গুরুদেরকে শুধু যে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে তা-ই নয়; বরং তাদেরকে দেবতার মর্যাদা দিয়ে পূজাও করে। অথচ খোদ সেক্যুলার হিন্দু গবেষকদের মতে ওই গুরুরা ছিল রাজা, পণ্ডিত ও পূজারি। কিন্তু তাদের ভক্তরা তাদের ঘটনাবলিতে অলৌকিক কিছু উপাখ্যান ও অতিরঞ্জন কথা জুড়ে দিয়ে তাদেরকে 'খোদা'র আসনে বসিয়ে দিয়েছিল। অথচ তাদের কারো কারো জীবনের ঘটনাবলি ছিল খুবই নিম্নশেণির মানুষের মতো। বরং কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়েও বাজে।

আমরা একথা বলি না যে, মুসলমানরাও তাদের পূর্বসূরিদের সম্পর্কে এ ধরনের অতিরঞ্জন কথা বলুক। কিন্তু হিন্দুদের নিম্ন শ্রেণির গুরুদের প্রতিও তাদের অন্ধ আনুগত্য দেখে ওইসব মুসলমানের অবশ্যই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ও লজ্জাবনত হওয়া উচিত, যারা জঙ্গে জামাল ও

---

[২১২] দাজ্জালি ফেতনে কে নুমায়া খাদ্দ ও খাল, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানি রহ., পৃষ্ঠা : ৮৮, বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত ইংরেজি উৎসগুলো দেখা যেতে পারে।

- The Histroy of Protestantism by Rev. J. A Wylie
- The Masacre of VIster Protestants in 1641
- (Christopher Marlowe) "Massacre at Paris"

জঙ্গে সিফফিনের মতো দু'তিনটি লড়াই দেখে নিজেদের ইতিহাসকে লজ্জার কারণ বলে মনে করে। বরং আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এমন সব মহান ব্যক্তির সমালোচনায় লেগে যায়, যাদের কেউ ছিলেন আল্লাহর রাসুলের শ্বশুর, কেউ জামাতা। কেউ ছিলেন পুণ্যবতী স্ত্রী আর কেউ কলিজার টুকরো। কেউ ছিলেন তার দেহরক্ষী আর কেউ লিপিকার। কেউ ছিলেন একান্ত খাদেম আর কেউ একান্ত শাগরিদ। কেউ ছিলেন রহস্যজ্ঞানী আবার কেউ উম্মাহর বিশ্বস্ততম ব্যক্তি।

আফসোস, অন্তরে এতটুকু উদারতাও নেই যে, এমন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মনীষীদের থেকে কদাচিৎ ঘটে যাওয়া বিচ্যুতিগুলোকে দৃষ্টি-অগ্রাহ্য করে সকলের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের আগ্রহ পোষণ করবে।

খেলাফতে রাশেদার সমাপ্তিকাল

হাসান ইবনে আলি রা. এর খেলাফতকাল

হজরত আলি রা. তার পরবর্তী খলিফা বা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কাউকে মনোনীত করে যাননি। তবে তার ইনতেকালের পর মুসলিমবিশ্বে তার পুত্র হজরত হাসানের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান ও উচ্চবংশীয় কেউ ছিল না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই প্রিয় দৌহিত্রকে এত বেশি ভালোবাসতেন, কয়েকবারই তিনি বলেছেন, 'হে আল্লাহ, আমি হাসানকে ভালোবাসি, আপনিও তাকে ভালোবাসুন এবং যারা হাসানকে ভালোবাসবে তাদেরকেও ভালোবাসুন'।[২১৩]

সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, হজরত হাসান ছিলেন আল্লাহর নবীর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি।[২১৪]

সত্যের কাণ্ডারি পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণীও উম্মাহর স্মরণ ছিল, যাতে তিনি ইরশাদ করেছেন, 'আমার এই পুত্র সরদার হবে। আশা করছি, এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা উম্মাহর দুটি বড় দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেবেন'।[২১৫]

এ কারণে কুফার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আশা ছিল, মুসলমানদের জন্য হজরত হাসানের খেলাফত বেশ বরকতপূর্ণ প্রমাণিত হবে। তাই নিঃসঙ্কোচে তারা হজরত হাসানের খেলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন।

এদিকে হজরত হাসান রা. লোকদের পক্ষ থেকে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের আবেদনে প্রথমে নীরবতা অবলম্বন করলেও উম্মাহর কল্যাণের

---

[২১৩] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৭৩৯৮, সনদ সহিহ।

[২১৪] সহিহ বুখারী, হাদিস : ৩৫৪৪, কিতাবুল মানাবিক, বাবু সিফাতিন নাবিয়্যি সা.।

[২১৫] সহিহ বুখারী, হাদিস : ২৭০৪, কিতাবুস সুলহি, অধ্যায়: নবীজী হযরত হাসান ইবনে আলি রাযি.কে বলেছেন, নিঃসন্দেহে আমার এ পুত্র সর্দার।

দিকটি বিবেচনা করে মানুষের বাইয়াত গ্রহণ করতে থাকেন। সর্বপ্রথম বাইয়াত হন হজরত কায়েস বিন সা'দ বিন উবাদা রা.। তিনি ছিলেন কুফার সেনাবাহিনীর সিপাহসালার।[২১৬]

হজরত হাসান রা. খেলাফতের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর প্রথম যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন, তার প্রতিটি শব্দ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, তিনি উম্মাহর জন্য অত্যন্ত কল্যাণকামী এবং ক্ষমতার জন্য রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট। ইমাম আহমাদ বিন হামবল রহ. উল্লেখ করেছেন, 'হজরত আলি রা. নিহত হওয়ার পর লোকেরা মাদায়েনে হজরত হাসানের চারপাশে সমবেত হতে থাকল। হজরত হাসান লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। প্রথমে আল্লাহর গুণকীর্তন করলেন। তারপর বললেন, যা কিছু হওয়া অবধারিত, তা খুবই নিকটবর্তী। নিঃসন্দেহে আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে, যদিও মানুষ তা অপছন্দ করে। আল্লাহর কসম, যেদিন থেকে আমি উপকারী ও অপকারী কাজের পার্থক্য বুঝতে পেরেছি, সেদিন থেকে আমার কিছুতেই এটা ভালো লাগে না যে, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের সরিষা পরিমাণ কোনো বিষয়ের দায়িত্বশীল হবো, আর তাতে কারো এক ফোঁটা রক্তও ঝরবে'।[২১৭]

হজরত হাসান কি ভীত হয়ে সন্ধি করেছিলেন?

হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত আলি রা. এর শাহাদাতের পর ইলয়া (বাইতুল মাকদিসে) শামবাসী থেকে তার খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তখন তাকে 'আমিরুল মুমিনিন' বলা শুরু হয়েছিল।[২১৮]

মুসলিমবিশ্বের রাজনৈতিক অঙ্গনে এটি ছিল এক নতুন পরিবর্তন। কেননা হজরত আলি রা. এর জীবদ্দশায় হজরত মুয়াবিয়া রা. খেলাফতের দাবি করেননি। তখন তাকে শুধু 'আমির' বলা হতো।

---

[২১৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াঃ ১১/ ১৩১

[২১৭] ফাজাইলুস সাহাবাহ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ. হাদিস : ১৩৬৪

[২১৮] তারিখুত তাবারি, ৫/ ১৬১, সনদ যয়িফ, কিন্তু এ বর্ণনার বিশুদ্ধতার পক্ষে আরো বর্ণনা আছে।

খেলাফতের দুজন দাবিদারের উপস্থিতিতে ঐকমত্যপুষ্ট খেলাফত প্রতিষ্ঠার তিনটি উপায় ছিল। যথা :

১. শামের লোকেদের হজরত হাসান রা. এর হাতে বাইয়াত হয়ে যাওয়া।
২. শামিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরকে একটি খেলাফতের অধীনে আনার চেষ্টা করা।
৩. খেলাফতের পদ ছেড়ে দিয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. কে খলিফা হিসেবে মেনে নেওয়া।

শামিরা যদি অন্যকারো হাতে বাইয়াত হতে রাজি থাকত, তা হলে তো হজরত আলির হাতেই হতো। তাই প্রথম উপায় বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এখন হজরত হাসানের সম্মুখে একটি বিরাট পরীক্ষা এসে দাঁড়াল। তিনি এই কঠিন পরিস্থিতিতে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন?

তখন হজরত হাসান সিদ্ধান্ত নিলেন, উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নিজের ক্ষমতা বিসর্জন দিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করবেন না।

হজরত হাসানের এ সিদ্ধান্তে কোনো দুর্বলতা বা কাপুরুষতা ছিল না। সহিহ বর্ণনার ভাষ্য অনুযায়ী হজরত হাসান রা. পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

যেসব বর্ণনায় বলা হয়েছে, হজরত হাসান তার বাহিনীর দুর্বলতা ও অবাধ্যতার কারণে বিরক্ত হয়ে হজরত মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলো যয়িফ রাবিদের থেকে বর্ণিত। তবে হ্যাঁ, হজরত হাসানের বাহিনীতে কতিপয় অতি আবেগী লোক অবশ্যই ছিল, যারা শামিদের সাথে সন্ধি করা পছন্দ করত না। কিন্তু তারা কোনো বিষয়ে ক্ষমতাবান ছিল না। দলের ক্ষমতাশালী লোকেরা সকলেই হজরত হাসানের পূর্ণ অনুগত ছিলেন। আর তাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার নয়, কয়েক লক্ষ।

হজরত হাসান রা. প্রথমদিকে তার কর্মপন্থা প্রকাশ করেননি, যাতে হঠাৎ করে কোনো বিরোধীচক্র হইচই করতে না পারে। বরং সতর্কতাবশত তিনি লোকদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করার সময় এই শর্ত আরোপ করেন যে, 'তোমরা আমার কথা শুনবে এবং মানবে। যার সাথে আমি

সন্ধি করব, তার সাথে সন্ধি করবে, যার সাথে আমি লড়াই করব, তার সাথে লড়াই করবে'।

ইরাকিদের যে গোষ্ঠীটি শামিদের সাথে সন্ধির পক্ষে ছিল না, তারা বাইয়াতের এ কথাগুলো শুনে ছটফট করতে লাগল এবং বলতে লাগল, হজরত হাসান আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লোক নন, তিনি তো লড়াই করতেই চান না'।[২১৯]

হজরত হাসানের নিয়মানুবর্তিতা ও ইবনে মুলজিমকে হত্যা

হজরত আলি রা. এর হত্যাকারী আবদুর রহমান বিন মুলজিমকে সামনে আনা হলো। সে হজরত হাসান রা. কে বলল, 'হাসান, আপনি কি একটি প্রস্তাবের উপর চিন্তাভাবনা করতে রাজি আছেন? আল্লাহর কসম, আমি যখনই আল্লাহর সাথে কোনো অঙ্গীকার করেছি, তা পূর্ণ করেই ছেড়েছি। আর আমি কা'বার হাতিমে বসে আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলাম, হয় আমি আলি ও মুয়াবিয়া উভয়কে হত্যা করব, নাহয় আমি নিহত হবো। এখন যদি আপনি ভালো মনে করেন, তা হলে আমাকে সুযোগ দিন, আমি মুয়াবিয়াকে নিঃশেষ করে দিই। তারপর যদি আমি বেঁচে যাই, তা হলে ফিরে এসে নিজেকে আপনার হাতে ন্যস্ত করব'। কিন্তু হজরত হাসান রা. তার প্রস্তাব অস্বীকার করে তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করেন। ফলে তাকে হত্যা করা হয়।[২২০]

হজরত হাসান রা. এর পক্ষ থেকে সন্ধির ঘোষণা এবং দাঙ্গাবাজদের বিরোধিতা

ইত্যবসরে হজরত মুয়াবিয়া রা. পত্র-মারফত হজরত হাসান রা. কে তার হাতে বাইয়াত হওয়ার আহ্বান জানান। হজরত মুয়াবিয়া রা. বলেন, আপনি যা ইচ্ছা আমার থেকে মঞ্জুর করিয়ে নিতে পারেন।

---

[২১৯] তারিখুত তাবারি, ৫/ ১৬২,

[২২০] তারিখুত তাবারি, ৫/ ১৪৮, ১৪৯

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, হজরত আলির ওয়ারিসরা প্রতিশোধের তাড়নায় তার অসিয়ত উপেক্ষা করে হত্যাকারীর হাত-পা কেটে ফেলেছিল, তার চোখ উপড়ে ফেলেছিল, নিকৃষ্টতম পন্থায় তাকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করেছিল। কিন্তু এসব বর্ণনার সনদ দুর্বল। নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক-বর্ণনায় কেবল এতটুকুই প্রমাণিত যে, হত্যাকারীকে কেসাসস্বরূপ হত্যা করা হয়েছিল।

খেলাফতের দুজন দাবিদারের উপস্থিতিতে ঐকমত্যপুষ্ট খেলাফত প্রতিষ্ঠার তিনটি উপায় ছিল। যথা :

১. শামের লোকেদের হজরত হাসান রা. এর হাতে বাইয়াত হয়ে যাওয়া।
২. শামিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরকে একটি খেলাফতের অধীনে আনার চেষ্টা করা।
৩. খেলাফতের পদ ছেড়ে দিয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. কে খলিফা হিসেবে মেনে নেওয়া।

শামিরা যদি অন্যকারো হাতে বাইয়াত হতে রাজি থাকত, তা হলে তো হজরত আলির হাতেই হতো। তাই প্রথম উপায় বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এখন হজরত হাসানের সম্মুখে একটি বিরাট পরীক্ষা এসে দাঁড়াল। তিনি এই কঠিন পরিস্থিতিতে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন?

তখন হজরত হাসান সিদ্ধান্ত নিলেন, উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নিজের ক্ষমতা বিসর্জন দিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করবেন না।

হজরত হাসানের এ সিদ্ধান্তে কোনো দুর্বলতা বা কাপুরুষতা ছিল না। সহিহ বর্ণনার ভাষ্য অনুযায়ী হজরত হাসান রা. পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

যেসব বর্ণনায় বলা হয়েছে, হজরত হাসান তার বাহিনীর দুর্বলতা ও অবাধ্যতার কারণে বিরক্ত হয়ে হজরত মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলো যয়িফ রাবিদের থেকে বর্ণিত। তবে হ্যাঁ, হজরত হাসানের বাহিনীতে কতিপয় অতি আবেগী লোক অবশ্যই ছিল, যারা শামিদের সাথে সন্ধি করা পছন্দ করত না। কিন্তু তারা কোনো বিষয়ে ক্ষমতাবান ছিল না। দলের ক্ষমতাশালী লোকেরা সকলেই হজরত হাসানের পূর্ণ অনুগত ছিলেন। আর তাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার নয়, কয়েক লক্ষ।

হজরত হাসান রা. প্রথমদিকে তার কর্মপন্থা প্রকাশ করেননি, যাতে হঠাৎ করে কোনো বিরোধীচক্র হইচই করতে না পারে। বরং সতর্কতাবশত তিনি লোকদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করার সময় এই শর্ত আরোপ করেন যে, 'তোমরা আমার কথা শুনবে এবং মানবে। যার সাথে আমি

সন্ধি করব, তার সাথে সন্ধি করবে, যার সাথে আমি লড়াই করব, তার সাথে লড়াই করবে'।

ইরাকিদের যে গোষ্ঠীটি শামিদের সাথে সন্ধির পক্ষে ছিল না, তারা বাইয়াতের এ কথাগুলো শুনে ছটফট করতে লাগল এবং বলতে লাগল, হজরত হাসান আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লোক নন, তিনি তো লড়াই করতেই চান না'।[২১৯]

হজরত হাসানের নিয়মানুবর্তিতা ও ইবনে মুলজিমকে হত্যা

হজরত আলি রা. এর হত্যাকারী আবদুর রহমান বিন মুলজিমকে সামনে আনা হলো। সে হজরত হাসান রা. কে বলল, 'হাসান, আপনি কি একটি প্রস্তাবের উপর চিন্তাভাবনা করতে রাজি আছেন? আল্লাহর কসম, আমি যখনই আল্লাহর সাথে কোনো অঙ্গীকার করেছি, তা পূর্ণ করেই ছেড়েছি। আর আমি কা'বার হাতিমে বসে আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলাম, হয় আমি আলি ও মুয়াবিয়া উভয়কে হত্যা করব, নাহয় আমি নিহত হবো। এখন যদি আপনি ভালো মনে করেন, তা হলে আমাকে সুযোগ দিন, আমি মুয়াবিয়াকে নিঃশেষ করে দিই। তারপর যদি আমি বেঁচে যাই, তা হলে ফিরে এসে নিজেকে আপনার হাতে ন্যস্ত করব'। কিন্তু হজরত হাসান রা. তার প্রস্তাব অস্বীকার করে তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করেন। ফলে তাকে হত্যা করা হয়।[২২০]

হজরত হাসান রা. এর পক্ষ থেকে সন্ধির ঘোষণা এবং দাঙ্গাবাজদের বিরোধিতা

ইত্যবসরে হজরত মুয়াবিয়া রা. পত্র-মারফত হজরত হাসান রা. কে তার হাতে বাইয়াত হওয়ার আহ্বান জানান। হজরত মুয়াবিয়া রা. বলেন, আপনি যা ইচ্ছা আমার থেকে মঞ্জুর করিয়ে নিতে পারেন।

---

[২১৯] তারিখুত তাবারি, ৫/ ১৬২,

[২২০] তারিখুত তাবারি, ৫/ ১৪৮, ১৪৯

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, হজরত আলির ওয়ারিসরা প্রতিশোধের তাড়নায় তার অসিয়ত উপেক্ষা করে হত্যাকারীর হাত-পা কেটে ফেলেছিল, তার চোখ উপড়ে ফেলেছিল, নিকৃষ্টতম পন্থায় তাকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করেছিল। কিন্তু এসব বর্ণনার সনদ দুর্বল। নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক-বর্ণনায় কেবল এতটুকুই প্রমাণিত যে, হত্যাকারীকে কেসাসস্বরূপ হত্যা করা হয়েছিল।

হজরত হাসান রা. হজরত মুয়াবিয়া রা. এর এ প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি তার চাচাতো ভাই হজরত আবদুল্লাহ বিন জাফর রা. কে বলেন, 'আমি একটি বিষয় চিন্তা করেছি। আমি চাই, আপনি তাতে আমার সঙ্গে থাকুন'।

হজরত আবদুল্লাহ বিন জাফর রা. বলেন, বলুন, আপনি কী চিন্তা করেছেন?

তিনি বললেন, আমি মদিনায় চলে যাব। আর শাসনক্ষমতা মুয়াবিয়া রা. এর হাতে ন্যস্ত করব। অনেক হানাহানি হয়েছে, অনেক রক্তপাত ঘটেছে'।

হজরত আবদুল্লাহ বিন জাফর রা. এ কথায় পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন, আল্লাহ আপনাকে গোটা উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন'।

এরপর হজরত হাসান রা. হজরত হুসাইন রা. কে ডেকে তার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি প্রথমে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। কিন্তু হজরত হাসান তাকে বুঝাতে থাকেন এবং একপর্যায়ে দলিলের মাধ্যমে বুঝাতে সক্ষম হন। হজরত হুসাইনও এতে সম্মত হন।[২২১]

ইরাকিদের উদ্দেশে হজরত হাসানের ভাষণ এবং দাঙ্গাবাজদের ধৃষ্টতা

কিছুদিন পর হজরত হাসান রা. ইরাকের লোকদের হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পক্ষে একমত করার জন্য 'সাবাত' নামক স্থানে সমবেত করেন। তারপর উন্মুক্ত সমাবেশে তিনি ভাষণ দেন। তিনি অত্যন্ত আবেগ ও দরদের সাথে বলেন, 'আমি নিজের জন্য যেমন কল্যাণ কামনা করি, আপনাদের জন্যও তেমনই কামনা করি। আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনারা আমার প্রস্তাব ফেলে দেবেন না। নিঃসন্দেহে উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বহুগুণে উত্তম'।[২২২]

---

[২২১] আল ইসাবাহ, ২/ ৬৫, তারিখে দিমাশক : ১৩/ ২৬৭, হজরত হাসান ইবনে আলি রাযি.র জীবনী। সনদ সহিহ।

[২২২] তারিখুত তাবারি, ৫/ ১৬২, ইসমাইল বিন রাশেদ থেকে বর্ণিত। আখবারুত তিওয়াল: পৃষ্ঠা : ২১৭

তারপর বলেন, 'পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত আমি আর আমার ভাই ছাড়া কেউ এমন নেই, যারা কোনো নবীর দৌহিত্র। তবু আমার মত এই যে, আপনারা মুয়াবিয়ার পক্ষে একমত হয়ে যান'।[২২৩]

হজরত হাসান কেবল এটুকুই বলেছেন, এর মধ্যেই আশপাশের খারেজি ও সাবায়ি চিন্তা-চেতনার বহু মানুষ একযোগে হইচই শুরু করল। তারা বলতে লাগল, 'হাসানও তার পিতার মতো কাফের হয়ে গেছে'। কেউ তো হজরত হাসানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ হ্যাঁচকা টানে তার কাঁধের চাদর টেনে খুলে ফেলল। কেউ পায়ের নিচ থেকে জায়নামাজ ধরে টানতে শুরু করল। কেউ আবার তার তাঁবুর উপর হামলা চালাল। মালপত্র সব লুটপাট করে নিল। এমনকি তার পায়ের নিচ থেকে গদিটি পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল।[২২৪]

হজরত হাসানের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ

এর কিছুদিন পর একবার হজরত হাসান রা. মাদায়েন যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় নামাজ পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় উপরোক্ত দাঙ্গাবাজদের এক লোক ধারাল খঞ্জর দিয়ে তার উপর আক্রমণ করল। আকস্মিক আক্রমণে হজরত হাসানের রান ক্ষতবিক্ষত হলো। সাথের বিশ্বস্ত সঙ্গীরা হামলাকারীকে ধরে হত্যা করে ফেলল। তারপর তিনি মাদায়েনের কাসরে আবয়াজ তথা শ্বেতপ্রাসাদে অবস্থান নিলেন। সেখানে তার ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করা হলো। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।[২২৫]

আসলে জালেমরা এভাবে আক্রমণের সুযোগ এজন্য পেয়েছিল যে, হজরত হাসান রা. তার সম্মানিত পিতার মতোই বিনাপ্রহরায় চলাফেরা করতেন। সুতরাং এটা কখনোই সত্য নয় যে, হজরত হাসানের ঘনিষ্ঠ

২২৩

عن ابن سيرين أن الحسن بن علي قال : لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم رجلا جده نبي غيري وأخي وإني أرى أن تجتمعوا على معاوية قال معمر : جابرس وجابلق : المشرق والمغرب (مجمع الزوائد، رواية: ٧٠٧٣، بسند صحيح، السنن الكبرى للبيهقى، رواية: ١٦٧١١)

[২২৪] আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি: ৩/৯৩, তারিখুত তাবারি, ৫/ ১৬২, ইসমাইল বিন রাশেদ থেকে বর্ণিত। আখবারুত তিওয়াল: পৃষ্ঠা : ২১৭

[২২৫] আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি: ৩/৯৩, তারিখুত তাবারি, ৫/ ১৬২, আখবারুত তিওয়াল: পৃষ্ঠা : ২১৭

সঙ্গীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, যাদের সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। সহিহ বর্ণনা অনুযায়ী হজরত হাসান তার উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ ও তার সহায়-সম্বল সব লুট হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ও ক্ষমতাসম্পন্ন খলিফাই ছিলেন।[২২৬]

হজরত হাসান কেন বাহিনী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন?

কিছুদিন পর হজরত হাসান রা. এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ইরাক থেকে শাম অভিমুখে রওনা করেন।[২২৭] সবাই ধারণা করছিল, এ বাহিনী শামে আক্রমণ করার জন্য যাচ্ছে। কিন্তু হজরত হাসানের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তিনি চাচ্ছিলেন, তার হাতে যারা সন্ধি ও যুদ্ধের বিষয়ে আনুগত্যের ওয়াদা করেছে, তারা সবাই একবার একত্র হোক। তিনি তাদের সকলকে নিয়ে মুসলমানদের এক বিরাট সমাবেশে হজরত মুয়াবিয়া রা. কে খেলাফতের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন।

নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়। যথা :

১. ইমাম যুহরি রহ. থেকে বর্ণিত আছে, হজরত হাসান রা. খলিফা নির্বাচিত হয়ে যুদ্ধ চাচ্ছিলেন না।[২২৮]

---

[২২৬] কোনো কোনো দুর্বল বর্ণনায় আছে, হজরত মুয়াবিয়ার সিপাহসালার হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. ইরাকে আক্রমণ করে মাদায়েনে হজরত হাসান রা. কে অবরোধ করেছিল। তখন হজরত হাসান রা. সন্ধি ছাড়া কোনো উপায় দেখতে না পেয়ে সন্ধির জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। - আল আখবারুত তিওয়াল, পৃষ্ঠা : ২১৭, তারিখুত তাবারি, ৫/ ১৫৯

অন্যদিকে কোনো কোনো বর্ণনায় এমন বুঝানো হয়েছে যে, হজরত হাসান ছিলেন সম্পূর্ণ সহায়-সম্বলহীন। গোটা বাহিনী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তার আশ্রয়ের কোনো জায়গা ছিল না।

আসলে এজাতীয় কথাবার্তা এজন্য প্রচার করা হয়েছিল, যাতে এ কথা বুঝানো যায় যে, হজরত হাসান মনের দিক থেকে সন্ধির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। শুধু দুর্বলতার কারণে ভীত হয়ে সন্ধি করেছিলেন। কিন্তু এজাতীয় বর্ণনা হয়তো একেবারেই সনদবিহীন, অথবা সনদ আছে, কিন্তু তা দুর্বল। সর্বোপরি এগুলো বুখারি শরিফের সেই বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক, যা একটু পরেই আসছে।

[২২৭] সহিহ বুখারী, হাদিস : ২৭০৪, কিতাবুস সুলহি, অধ্যায়: নবীজী হযরত হাসান ইবনে আলি রাযি.কে বলেছেন, নিঃসন্দেহে আমার এ পুত্র সর্দার।

[২২৮] وكان الحسن لا يرى القتال.-তারিখুত তাবারি, ৫/ ১৫৮,

২. হজরত হাসান রা. বাইয়াত গ্রহণের সময় এ শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, আমি যার সাথে সন্ধি করব, তোমরাও তার সাথে সন্ধি করবে।[২২৯] বাইয়াতের শব্দে এ বাক্যটি এজন্য যুক্ত করা হয়েছিল যে, শুরু থেকেই হজরত হাসান সন্ধির প্রতি আগ্রহী ছিলেন।

৩. বাইয়াতের সময় কোনো আমির এভাবে বলতে চাইল- 'আমরা আপনার হাতে কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ এবং বিদ্রোহী (শামি)-দের সাথে লড়াইয়ের অঙ্গীকারের উপর বাইয়াত হচ্ছি'। কিন্তু হজরত হাসান শব্দ পরিবর্তন করে এভাবে বলার আদেশ দেন-

على كتاب الله وسنة نبيه

আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর সুন্নাহর উপর বাইয়াত হচ্ছি।

তারপর তিনি বলেন, 'কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ সকল শর্ত অন্তর্ভুক্ত করেছে।[২৩০]

৪. হজরত হাসান রা. তার সেনাপতিকে এজন্য বরখাস্ত করেছিলেন যে, সে শামে আক্রমণের জন্য জেদ ধরেছিল। তিনি তার স্থলে হজরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন।[২৩১]

৫. এক বিশাল বাহিনী নিয়ে হজরত হাসান রা. এর শামের দিকে যাত্রা করা এবং সেখানে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সঙ্গে সন্ধি করা- এটাই প্রমাণ করছিল যে, তিনি কোনো লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে বাহিনী নিয়ে যাননি। নতুবা এত বড় বাহিনী নিয়ে শামের উপর আক্রমণ করতে তার কোনো শঙ্কা ছিল না।

৬. সহিহ বুখারির বর্ণনায় স্বয়ং হজরত হাসানের বর্ণনা আছে, তিনি উম্মাহকে আরো রক্তপাত থেকে রক্ষা করার জন্য এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত আবেগ ও বেদনার সাথে বলেছিলেন,

ان هذه الامة قد عائت فى دمائها

নিঃসন্দেহে এই উম্মাহ রক্তে জর্জরিত হয়ে গেছে।[২৩২]

---

[২২৯] তারিখুত তাবারি, ৫/ ১৬২

[২৩০] তারিখুত তাবারি, ৫/ ১৫৮,

[২৩১] তারিখুত তাবারি, ৫/ ১৫৮, ইমাম যুহরী থেকে বর্ণিত।

[২৩২] সহিহ বুখারী, হাদিস : ২৭০৪, কিতাবুস সুলহি, অধ্যায়: নবীজী হযরত হাসান ইবনে আলি রাযি.কে বলেছেন, নিঃসন্দেহে আমার এ পুত্র সর্দার।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, হজরত হাসান রা. যখন কুফা থেকে বাহিনী নিয়ে রওনা করেছিলেন, তখনও তিনি উম্মাহর রক্তক্ষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই কুফায় থাকতেই তিনি সন্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

সহিহ বুখারিতে সন্ধির ঘটনা

হজরত হাসান রা. সফলভাবে তার এই স্থিরীকৃত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। খেলাফত গ্রহণের ষষ্ঠ মাসে পূর্ণ শৌর্য-বীর্য ও বাহিনী সহকারে শামের সীমান্তে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তখন পর্যন্ত শামের নেতৃত্বদানকারীরা হজরত হাসান রা. এর সিদ্ধান্তের কথা জনতেন না। তাই এ বিশাল বাহিনী দেখে তারা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। যুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য তারাই প্রথমে সংলাপের প্রস্তাব পেশ করেন। হজরত আমর ইবনুল আস রা. এ সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। সহিহ বুখারির বর্ণনায় আছে, হজরত হাসান রা. পাহাড়সম বাহিনী নিয়ে এসে অবস্থান নেন। তখন হজরত আমর ইবনুল আস রা. হজরত মুয়াবিয়া রা. কে বলেন, 'হজরত হাসানের সঙ্গে আমি এমন বাহিনী দেখেছি, যারা তাদের প্রতিপক্ষকে নিঃশেষ না করে ফিরবে না'।

হজরত মুয়াবিয়া বলেন, হে আমর, বলুন, যদি এই বাহিনী ওই বাহিনীকে এবং ওরা এদেরকে মেরে ফেলে, তা হলে সাধারণ মানুষের দেখাশোনার জন্য আমার কাছে কে থাকবে? কে সাধারণ মানুষের এবং মহিলাদের বিষয়ে লক্ষ রাখবে? কে তাদের সহায়-সম্পদের খোঁজখবর নেবে?

তারপর হজরত মুয়াবিয়া রা. বনু আবদে শামসের দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি-হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. কে ডেকে বলেন, আপনারা দুজন হজরত হাসানের কাছে যান। তার সম্মুখে (সন্ধির) প্রস্তাব পেশ করুন। তার সাথে কথা বলুন। এবং (সমঝোতার) আবেদন করুন।

এরা দুজন হজরত হাসানের কাছে এসে কথা বলে সমঝোতার আবেদন করেন।

হজরত হাসান রা. তাদেরকে বলেন, 'আমরা আবদুল মুত্তালিবের সন্তান (যারা দানশীলতা ও উদারতায় সুখ্যাত হয়ে আসছে)। আর আমরা এ (দুনিয়ার) ধনসম্পদের (অনেক কিছু) ব্যয় করেছি (অর্থাৎ লোকদেরকে

আমাদের দানশীলতায় অভ্যস্ত করে তুলেছি। তা ছাড়া)। নিঃসন্দেহে এ উম্মাহ তার রক্তে ভিজে চুপচুপ হয়ে গেছে' (এই রক্তপাত বন্ধ করার জন্য সন্ধি করা আবশ্যক। আর সন্ধি অব্যাহত রাখার জন্য জরুরি হলো, আমরা মন খুলে মানুষের উপর খরচ করব, যাতে সন্ধিবিরোধীদের মুখ বন্ধ থাকে এবং মানুষ সন্ধির সুফল দেখে আনন্দিত হয়)।

শামের দূতদ্বয় বলেন, জি হ্যাঁ, হজরত মুয়াবিয়া রা. আপনাকে (এত এত উপঢৌকন ও সম্পদের) প্রস্তাব করছেন এবং আপনার কাছে সন্ধির আবেদন করেছেন।

হজরত হাসান রা. (এসব অর্থ-সম্পদ মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী অনুভব করার পর, আরো নিশ্চয়তা লাভের জন্য) বলেন, কিন্তু এ প্রস্তাব পূরণ করার দায়িত্ব কে নেবে?

দূতদ্বয় বললেন, আমরা এর দায়িত্ব নিচ্ছি।

এরপর হজরত হাসান (সন্ধির বিনিময় হিসেবে) যে যে বিষয়ের চাহিদা পেশ করেছেন, দূতদ্বয় তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। এরই ভিত্তিতে হজরত হাসান রা. হজরত মুয়াবিয়ার সঙ্গে সন্ধি করে নেন।[২৩৩]

হজরত হাসান রা. হজরত মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধির ক্ষেত্রে সম্পদের শর্ত এজন্য করেছিলেন যে, বিভিন্ন সময় মানুষ তাদের নানা প্রয়োজন নিয়ে হজরত হাসানের কাছে আসতে থাকে। তা ছাড়া তার ভক্তদের মধ্যে কিছু লোক সন্ধির বিরোধীও ছিল। তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য উপহার-উপঢৌকনের ধারা অব্যাহত রাখা জরুরি ছিল। এজন্য হজরত হাসান হজরত মুয়াবিয়া রা. থেকে বিরাট অংকের ভাতা জারি করাতে চাচ্ছিলেন।

এদিকে হজরত মুয়াবিয়া রা. আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ফলে সন্ধি হওয়ার পথে আর কোনো বাধা থাকল না।

সহিহ বর্ণনা অনুযায়ী হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত হাসানের চাহিদা হিসেবে আবজারদ নামক এলাকার আয়-আমদানি হজরত হাসানের নামে

---

[২৩৩] সহিহ বুখারী, হাদিস : ২৭০৪, কিতাবুস সুলহিজরি অধ্যায়: নবীজী হযরত হাসান ইবনে আলি রাযি.কে বলেছেন, নিঃসন্দেহে আমার এ পুত্র সর্দার।

লিখে দেন। এ ছাড়া কুফার বাইতুল-মালের সমস্ত অর্থ তাকে দিয়ে দেন, যার পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ লক্ষ দিরহাম।[২৩৪]

দুর্বল ও সনদবিহীন বিভিন্ন বর্ণনায় আছে, হজরত মুয়াবিয়া রা. সন্ধির শর্ত পূরণ করেননি। এটা সম্পূর্ণ ভুল।

সন্ধিচুক্তির ঘোষণায় হজরত ইবনে উমর রা. এর অংশগ্রহণ

এরপর কুফার অদূরে শামগামী পথের পাশে অবস্থিত নুখাইলা নামক এলাকায় একটি সমাবেশ করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সন্ধির ঘোষণা করা হয়।[২৩৫] তারপর একটি উন্মুক্ত সমাবেশের আয়োজন করা হয়। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করে।

হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. প্রথম মনের ক্ষোভে এ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু পরে তিনিও মদিনা থেকে এসে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রথম তার কষ্ট ছিল, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার পরামর্শ জরুরি মনে করা হয়নি। তাই তিনি তার বোন হজরত হাফসা রা. কে বলেছিলেন, 'আপনি কি দেখেছেন, মানুষ কী করছে? তারা এক্ষেত্রে আমাকে কোনো মূল্য দেয়নি'।

হজরত হাফসা রা. সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, এ সন্ধি থেকে দূরে থাকা আপনার মর্যাদায় শোভা পায় না। এ সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতে ঐক্য ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনি আল্লাহর নবীর শ্যালক এবং হজরত উমর রা. এর পুত্র। সুতরাং আপনি তাদের কাছে যান। তারা আপনার অপেক্ষা

---

[২৩৪] তারিখুত তাবারি: ৫/ ১৫৯, ১৬০
এ স্থানের বর্ণনায় দিনার বা দিরহামের কোনো নাম উল্লেখ নেই। তবে বাহ্যিকভাবে এটাই বোঝা যায় যে, পঞ্চাশ লক্ষ দিনারই ছিল। কেননা একটি সহিহ সনদের বর্ণনায় আছে, "خمس مائة الف الف درهم" (পঞ্চাশ কোটি দিরহাম)। (মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৪৮০৮) সম্ভবত এক দিনার=একশ দিরহাম হয়ে থাকে। এ হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ দিনারের চুক্তি করে পঞ্চাশ কোটি দিরহাম দিয়েছিলেন। -কিতাবুল মাগাযী, অধ্যায়: খন্দকের যুদ্ধ, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস; ৯৭৭৯, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, বর্ণনা: ৭৫৭০

[২৩৫] মু'জামুল বুলদান: ৫/ ২৭৮

করছেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আপনার না যাওয়ার কারণে আবার কোথাও কোনো মতবিরোধ দেখা না দেয়।

এভাবে হজরত সাফিয়া রা. তাগিদ দিয়ে তাকে রওনা করিয়ে দেন এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ওই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।[২৩৬]

যখন উম্মাহর সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত হন এবং সন্ধির সমস্ত ধারা-উপধারা চূড়ান্ত হয়, তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত হাসান রা. কে বলেন, উঠুন, ঘোষণা করে দিন যে, আপনি খেলাফতের দায়িত্ব আমার হাতে সঁপে দিয়েছেন'।

হজরত হাসান মিম্বারে আরোহণ করে বলেন, 'সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা। আর সবচেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা হচ্ছে আল্লাহর নাফরমানি করা। খেলাফতের বিষয়ে আমার ও মুয়াবিয়ার মধ্যে মতবিরোধ ছিল। এক্ষেত্রে আমি যদি সত্যের উপর থেকে থাকি, তা হলে উম্মাহর শান্তি ও নিরাপত্তা এবং রক্ত সংরক্ষিত রাখার জন্য আমি আমার অধিকার ছেড়ে দিলাম। আর যদি অন্য কেউ বেশি অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তা হলে তার অধিকার আমি তাকেই দিয়ে দিলাম'।

তারপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন-

---

[২৩৬] কিতাবুল মাগাযী, অধ্যায়: খন্দকের যুদ্ধ, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস; ৯৭৭৯, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, বর্ণনা: ৭৫৭০
শুরুতে হজরত ইবনে উমর রা. ব্যথিত হওয়ার কারণে দোটানার মধ্যে ছিলেন। এটা স্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কেরাম তাদের মহান মর্যাদা সত্ত্বেও মানবীয় অনুভব-অনুভূতিমুক্ত ছিলেন না। হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. ছিলেন হজরত উমর রা. কর্তৃক গঠিত শুরাপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। হজরত উমর রা. এই সিদ্ধান্ত করে গিয়েছিলেন যে, খেলাফতের বিষয়টি এসব বিশিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শের ভিত্তিতেই ধাপে ধাপে সম্পন্ন হবে। কেননা এরা আল্লাহর নবীর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/৩৪২)
হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. ছিলেন অধিকাংশ গাজওয়াতে অংশগ্রহণকারী সাহাবি। তা তৎকালীন ইসলামি দুনিয়ায় তার যে মর্যাদা ও অবস্থান ছিল, তার ভিত্তিতে শুধু সাধারণ মানুষই নয়; বরং তার নিজেরও এমন আশা করাটা অনর্থক ছিল না যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অবশ্যই তার সঙ্গে পরামর্শ করা হবে। কিন্তু যখন তেমনটা হলো না, সাময়িকভাবে অবশ্যই তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন।
কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা তার শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণাঙ্গতারই প্রমাণ যে, সেই মর্ম-বেদনা নিয়ন্ত্রণ করে তিনি সেই সমাবেশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

وَ اِنْ اَدْرِیْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَ مَتَاعٌ اِلٰی حِیْنٍ [২৩৭]

আমি জানি না, হয়তো এটা তোমাদের জন্য পরীক্ষা এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উপভোগ করার সুযোগ'।[২৩৮]

এভাবে ক্ষমতার পালাবদলের কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর হজরত মুয়াবিয়া রা. বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে ভাষণ প্রদান করেন। তারপর তিনি কুফায় গমন করেন এবং লোকদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন।[২৩৯]

খেলাফতে রাশেদার পরিসমাপ্তি

হজরত হাসান রা. এর খেলাফতের পদ থেকে স্বেচ্ছায় হাত গুটিয়ে নেওয়ার সাথে সাথেই উম্মাহর ইতিহাসের সেই অতি বরকতময় যুগটির সমাপ্তি ঘটে গিয়েছিল, যাকে 'খেলাফতে নবুওয়াত' অথবা 'খেলাফতে রাশেদা' বলা হয়। এরপর যে যুগটির সূচনা হয়, অধিকাংশ আলেম তাকে 'খেলাফতে আম্মাহ' তথা সাধারণ খেলাফত বলে থাকেন।

'খেলাফত' এজন্য বলা হয় যে, খেলাফতে রাশেদার পরবর্তী শাসকগণ তাদের ক্ষমতাকে খেলাফতই বলেছেন এবং সাবেক খলিফাদের মতো আমিরুল মুমিনিনের উপাধি ধরে রেখেছেন। সেই সাথে শরয়ি আইনকানুন, হুদুদ, কিসাস ইত্যাদি সেভাবেই কার্যকর ছিল এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামি অনুশাসন অব্যাহত ছিল। যদিও তাতে ঈষৎ পরিবর্তন ও দুর্বলতা এসেছিল। কিন্তু এ খেলাফতকে 'রাশেদা' না বলে 'আম্মাহ' বলার কারণ হলো, এতে ভালো-মন্দ ও মধ্যম সর্বশ্রেণির শাসকের অংশগ্রহণ ছিল। পক্ষান্তরে খেলাফতে রাশেদার মান ছিল এর চেয়ে বহুগুণে উন্নত।

এই খেলাফতে আম্মাহ বা সাধারণ খেলাফতকে রাজতন্ত্র বা বাদশাহি শাসনও বলা হয়। কেননা ধীরে ধীরে এতে ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে গিয়েছিল শাসকদের ব্যক্তিত্ব। আর শাসনক্ষমতা হয়েছিল শাসকদের পরিবারের জন্যই নির্দিষ্ট। যেমনটি হয়ে থাকে বাদশাহি নিয়মে।

---

[২৩৭] সুরা আম্বিয়া, আয়াত ১১১

[২৩৮] আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ৩/২৬থ মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৪৮১৩, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩০৬৯৮

[২৩৯] তারিখুত তাবারি : ৫/১৬২

ব্যক্তিগত ও বংশীয় শাসনক্ষমতার ধারা ক্রমান্বয়ে খেলাফতে আম্মাহকে রাজতন্ত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছিল। এভাবে শাসন পরিচালনা জায়েজ হওয়া সত্ত্বেও এটা ইসলামি শুরাভিত্তিক নিয়মের পরিপন্থি ছিল। আর শুরাভিত্তিক নিয়মটিই ছিল খেলাফতে রাশেদার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেননা তাতে শাসক নির্বাচনের পেছনে বংশ বা গোত্রের কোনো ভূমিকা ছিল না। ব্যক্তিগত বা সামরিক শক্তির সাহায্যে সেখানে ক্ষমতা দখলের কোনো সুযোগ ছিল না। শাসনক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা, এমনকি কোনো সাধারণ পদ চাওয়াটাও ছিল দোষণীয়। শাসক ও দায়িত্বশীল নির্বাচন করা হতো ইলম, দীনি বিষয়ে প্রজ্ঞা, অন্তর্জ্ঞান, খোদভীতিসহ নানামাত্রিক যোগ্যতা এবং ইসলামের জন্য ত্যাগ ও বিসর্জনের উল্লেখযোগ্য অবদান ইত্যাদি গুণের ভিত্তিতে। আর এ কারণেই খেলাফতে রাশেদার যুগের চার খলিফা ছিলেন চারটি ভিন্ন ভিন্ন বংশের সন্তান।

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রথম ভাষণ

খেলাফতের আসনে সমাসীন হয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে একটি ভাষণ প্রদান করেন। সহিহ বুখারিতে বর্ণিত আছে, হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. একবার হজরত হাবিব বিন মাসলামা রা. এর কাছে সেই ভাষণের প্রত্যক্ষ অবস্থা এভাবে শুনিয়েছিলেন, 'যখন লোকেরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল, তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. ভাষণ দিলেন এবং বললেন, এখন কেউ যদি এ বিষয়ে কিছু বলতে চায়, তা হলে মাথা তুলে বলুক। আমি এ বিষয়ের (খেলাফতের) বেশি উপযুক্ত তার চেয়েও এবং তার পিতার চেয়েও'।[২৪০]

২৪০

من كان يريد ان يتكلم فى هذا الامر فليطلع لنا قرنه فلنحن احق به منه ومن ابيه. (صحيح البخارى، ح: ٤١٠٨، باب غزوة الخندق)

আজকাল কেউ কেউ এখানে منه ومن ابيه বাক্যাংশের মর্ম এভাবে ব্যাখ্যা করে যে, 'হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ইঙ্গিত ছিল সাবায়িদের দিকে। অর্থাৎ কোনো সাবায়ি যদি মনে করে যে, সে শাসন-ক্ষমতার জন্য আমাদের চেয়ে অধিক উপযুক্ত, তাহলে সে যেন একটু সামনে আসে। কিন্তু ইবনে উমর এ কথার অর্থ না বুঝে অনর্থক ধাঁধার মধ্যে হাবাডুবু খেতে থাকে'।→

কিন্তু এ ব্যাখ্যা অত্যন্ত দূরবর্তী। কেননা ব্যাপারটি যদি এমনই হতো, তাহলে হজরত ইবনে উমর রা. এতটা ক্রোধান্বিত হতেন না, যার কথা এ বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত ইবনে উমর রা. সমাবেশের পরিবেশ এবং বক্তার মনোভাব ও বাচনভঙ্গি দেখেও সঠিক মর্ম বুঝতে পারবেন না এবং অনর্থক রেগে যাবেন, এটা অসম্ভব।

অন্যদিকে হাবিব বিন মাসলামা রা. হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সেনাপতি ও নৈকট্যভাজন হওয়া সত্ত্বেও উক্ত বাক্যাংশের সেই অর্থটিই বুঝেছিলেন, যা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বুঝেছিলেন। তাই হাবিব বিন মাসলামা হজরত ইবনে উমর যা বুঝেছিলেন, তার উপর কোনো আপত্তি করেননি। বরং এতটুকু বলেছিলেন যে, ধৈর্যধারণ করে আপনি ভালোই করেছেন।

সুতরাং এমনটা চিন্তা করা নিছক নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয় যে, চৌদ্দশ বছর পরে এসে আমরা কেবল কিতাবের শব্দের মাধ্যমে সঠিক মর্ম উদ্ধার করে ফেলেছি। এ কারণেই হাদিসের ব্যাখ্যাকারদের কেউ কেউ উক্ত অর্থ উদ্দেশ্য নেননি।

হাদিসের ব্যাখ্যাকারগণ এখানে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর উক্ত ইশারায় দু'টি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। হয়তো এর দ্বারা হজরত হাসান ও তার পিতা হজরত আলি উদ্দেশ্য, অথবা এর দ্বারা হজরত আবদুল্লহ ইবনে উমর ও তার পিতা হজরত উমর ফারুক রা. উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিবেচনা করলে এখানে প্রথম সম্ভাবনাটিই অধিক স্পষ্ট মনে হয়। এ কারণেই হাফেজ ইবনে হাজার রহ. দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি দূরবর্তী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

قيل أراد عليا وعرض بالحسن والحسين، وقيل أراد عمر وعرض بابنه عبد الله. وفيه بعد لان معاوية كان يبالغ فى تعظيم عمر.

কেউ বলে, হজরত মুয়াবিয়ার উদ্দেশ্য ছিল হজরত আলি আর তিনি হজরত হাসান ও হুসাইন রা. এর উপর আঘাত করেছেন। আবার কেউ বলে, তার উদ্দেশ্য ছিল হজরত উমর, আর তিনি তার পুত্র হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের প্রতি আঘাত করেছেন। কিন্তু এ দ্বিতীয়টি দূরবর্তী। কেননা হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত উমর রা. কে অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মান করতেন'। (ফাতহুল বারি : ৭/৪০৪)

তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, হজরত আলি রা. ও হজরত হাসান রা. র মর্যাদা সম্পর্কে জেনেও কেন হজরত মুয়াবিয়া রা. নিজেকে তাদের চেয়ে খেলাফতের জন্য অধিক উপযুক্ত বললেন?

এর উত্তর স্বয়ং হজরত মুয়াবিয়ার এক ভাষণে পাওয়া যায়, যাতে তিনি বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। কেননা তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন উমর এবং তার মতো ব্যক্তিরা আমার চেয়ে উত্তম।

(لكنى عسيت أن أكون أكناكم لعدوكم وأنعمكم.)

কিন্তু আমি তোমাদের শত্রুদের জন্য অধিক পীড়াদায়ক এবং তোমাদের সাথে অধিক কল্যাণকারী। (তারিখে দিমাশক : ৫৯/১৬৩)

এজন্যই হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেছেন, হজরত মুয়াবিয়ার মত এই ছিল (যে, খেলাফতের ক্ষেত্রে) শক্তি, কৌশল ও মেধায় অগ্রসর ব্যক্তিকে প্রাধান্য→

বর্ণনাকারী হাবিব বিন মাসলামা বলেন, আমি (হজরত ইবনে উমর রা. এর কাছে) জানতে চাইলাম, তারপর আপনি কি এ কথা কোনো উত্তর দেননি?

তিনি বলেন, আমি কিছু বলার জন্য আমার আসন থেকে নড়েচড়ে উঠেছিলাম। আমি তাকে বলতে চাচ্ছিলাম এ বিষয়টির (শাসনক্ষমতার) অধিক উপযুক্ত ও হকদার তারা, যারা ইসলামের জন্য তোমার এবং তোমার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।[২৪১]

কিন্তু আমি বলেও আবার বললাম না। এজন্য যে, আমার কথার কারণে আবার সমাবেশে মতবিরোধ শুরু হয়ে যায় কি না, আবার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় কি না, সর্বোপরি আমার কথার ভিন্ন কোনো মর্ম গ্রহণ করা হয় কি না। তাই আমি জান্নাতের সাওয়াবের উপরই সীমাবদ্ধ থাকলাম'।

হাবিব বিন মাসলামা রা. বললেন, 'আপনি সুরক্ষিত থেকেছেন এবং বেঁচে গেছেন'।[২৪২]

দেওয়া হবে এমন ব্যক্তির উপর, যিনি ইসলাম গ্রহণ, দীনদারি ও ইবাদতের ক্ষেত্রে অগ্রসর। এ হিসেবেই তিনি ব্যাখ্যাহীনভাবে বলেছেন, তিনিই সবচেয়ে উত্তম।
পক্ষান্তরে হজরত ইবনে উমর রা. র মত ছিল, কম মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির হাতে বাইয়াত হওয়া উচিত নয়। তবে যদি ফেতনার আশঙ্কা থাকে, তাহলে করা যেতে পারে। এ কারণেই হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর পরে হজরত মুয়াবিয়ার হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তার পুত্র ইয়াজিদের হাতেও বাইয়াত হন এবং নিজের ছেলেকে ইয়াজিদের বাইয়াত ছিন্ন করতে নিষেধ করেন। ইয়াজিদের পরে আবদুল মালিকের হাতেও বাইয়াত হয়েছিলেন। (ফাতহুল বারি : ৭/৪০৪)
মোটকথা, হজরত মুয়াবিয়া নিজেকে হজরত আলি, হাসান ও আবদুল্লাহ বিন উমরের চেয়ে উত্তম বলতেন না। তবে তার মত ছিল, শাসনকার্য আমিই ভালো পরিচালনা করতে পারি। এ চিন্তা থেকেই তিনি এর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। এ প্রচেষ্টায় তার নিয়ত অবশ্যই উত্তম ছিল। পরবর্তী ইতিহাসও প্রমাণ করেছে যে, সত্যিই তিনি অত্যন্ত উপযুক্ত ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন।

[২৪১] হজরত আবদুল্লাহ বিন উমরের এ কথার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমি সেই সকল প্রবীণ মুহাজির সাহাবির অন্যতম, যারা বদর, উহুদ ও খন্দকে তোমার পিতা আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে। তুমি তো তখন মুসলমান ছিলে না। আর সাবেক খেলাফত আমলে খেলাফতের উপযুক্ততার মাপকাঠি রাখা হয়েছিল আগে ইসলাম গ্রহণ, হিজরত, জিহাদ ও আত্মত্যাগের উপর। এ হিসেবে আমি তোমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত। →

[২৪২] সহিহ বুখারী, হাদিস : ৪১০৮, মাগাজী, অধ্যায়: খন্দকের যুদ্ধ।

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

এখানে কোনো কোনো ঐতিহাসিক ও হাদিস ব্যাখ্যাকার একটি ভুল ধারণার শিকার হয়েছেন। তা হলো এ ভাষণটি হজরত মুয়াবিয়া ইয়াজিদের মনোনয়নের সময় মদিনায় দিয়েছিলেন।

(كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزى: ١٦٧/١)

কিন্তু এটা নিছক ধারণা। বর্ণনার মধ্যে কোথাও মদিনার কথা উল্লেখ নেই। এ ধারণা ভুল হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, যে হাবিব বিন মাসলামা এটি বর্ণনা করেছেন, তিনি সর্বৈকমত্যে ইয়াজিদের মনোনয়নের বিতর্ক সৃষ্টির বহু আগে ৪২ হিজরিতে মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

(تقريب التهذيب، تر: ١١٠٦، سير أعلام النبلاء: ١٨/٣، تاريخ خلفة بن خياط، سن ٥٤٢)

ইয়াজিদের প্রশংসাকরীরা এ বর্ণনাটিকে ইয়াজিদের খেলাফতের বিষয়ে 'ইজমা' হওয়ার দলিল বানাতে চায়, তাই তারা এ নতুন ঘটনা সাজিয়েছে যে, হাবিব বিন মাসলামার মৃত্যু ৫০ হিজরির কাছাকাছি সময়ে হয়েছিল। এ দাবির পক্ষে তারা আল ইসাবাহ র নিম্নোক্ত ইবারতকে দলিল হিসেবে পেশ করে-

لم يزل مع معاوية فى حروبه وجهه الى آرمينية واليا، فمات بها سنة اثنتين واربعين ولم يبلغ خمسين

(الاصابة: ٢٢/٢ عن ابن سعد)

অথচ এ ইবারতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মৃত্যু ৪২ হিজরিতে হয়েছিল। لم يبلغ خمسين এর দ্বারা উদ্দেশ্য তার বয়স। অর্থ এই যে, মৃত্যুর সময় তার বয়স পঞ্চাশ বছরের কম ছিল। যেমনটি বর্ণনা করেছেন হাফেজ মিজ্জি। তিনি বলেন,

حبيب يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اثنتى عشرة سنة. (تهذيب الكمال: ٣٩٨/٥)

অতএব, যেহেতু এ ঘটনার বর্ণনাকারী হাবিব বিন মাসলামা নিজেই নিশ্চিতরূপে ৪২ হিজরিতে ইনতেকাল করেছেন, তাই এ ঘটনা ইয়াজিদের মনোনয়নের সাথে কী করে সম্পৃক্ত হতে পারে, যা নিঃসন্দেহে আরো অনেক পরে ঘটেছিল। মু'জামে কাবির তাবারানি এবং মাজমাউয যাওয়ায়েদের নিম্নোক্ত ইবারত এ বিষয়টি সমাধান করে দেয়। সেখানে বলা হয়েছে-

وعن ابن عمر قال لما كان اليوم الذى اجتمع فيه على ومعاوية بدومة الجندل قالت لى حفصة انه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر بن الخطاب فأقبل معاوية يومئذ على بختى عظيم فقال من يطمع في هذا الامر ويرجوه أو يمد له عنقه قال ابن عمر فما حدثت نفسي بالدنيا قبل يومئذ ذهبت أن أقول يطمع فيه من ضربك وأباك على الاسلام حتى أدخلكما فيه فذكرت الجنة ونعيمها فأعرضت عنه .

হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, যখন সেই দিন এলো, যেদিন দুমাতাল জান্দালে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর উপর সকলে একমত হলো, তখন হাফসা রা. আমাকে বলল, এই সন্ধিচুক্তি থেকে দূরে থাকা আপনার জন্য শোভন নয়। কেননা এর→

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হজরত হাসান রা. হজরত মুয়াবিয়া রা. কে যখন ক্ষমতা হাস্তান্তর করেন, তখন এই চিন্তা থেকেই করেছেন যে, তার মধ্যে নেতৃত্ব ও পরিচালনার যোগ্যতা আছে। তিনি ন্যায়পরায়ণ, খোদাভীরু এবং উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামী। যদি এমন না হতো, তা হলে নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে সন্ধি নয়, যুদ্ধ করতেন।

হজরত মুয়াবিয়া রা. উত্তম গুণাবলি হজরত আলিও অস্বীকার করতেন না, হজরত হাসানও অস্বীকার করতেন না। তবে খোলাফায়ে রাশেদিনের তুলনায় তার মধ্যে যে তুলনামূলক পার্থক্য ছিল, তাকেও উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

মদিনাবাসীর বাইয়াত

হজরত হাসান খেলাফত থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. তার ক্ষমতা গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। তারপর তিনি মুসলিমবিশ্বের

মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আপনি একদিকে আল্লাহর নবীর শ্যালক, অন্যদিকে হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর পুত্র।

সেদিন হজরত মুয়াবিয়া একটি বড় উটে চড়ে এলেন এবং বললেন, কে আছে এমন, যার এ ব্যাপারে আগ্রহ ও আশা আছে, অথবা সে এর জন্য মাথা উঁচু করতে চায়?

হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, সেইদিনের পূর্বে কোনোদিন আমার দুনিয়ার প্রতি আশা জাগেনি। আমি বলতে শুরু করেছিলাম, 'এ ব্যাপারে আগ্রহ তার আছে, যিনি তোমার সাথে এবং তোমার পিতার বিরুদ্ধে ইসলামের জন্য লড়াই করেছেন। এমনকি তোমাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করিয়েছেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমি জান্নাত ও তার নেয়ামতরাজি স্মরণ করে ব্যাপারটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।'

راواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات والظاهر أنه أراد صلح الحسن بن على ووهم الراوى

ইমাম আবু বকর হাইসামি এ বর্ণনার রাবিদেরকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। সাথে আরো বলেছেন, এখানে আসলে হজরত হাসান ইবনে আলির সাথে সন্ধির আলোচনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রাবির সন্দেহ হয়েছে (তাই দুমাতাল জান্দালের কথা উল্লেখ করেছেন। আসলে সন্ধি সেখানে হয়নি।)

তার কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উক্ত ভাষণ হজরত মুয়াবিয়া রা. খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সময় ইরাকে করেছিলেন। আর ঐতিহাসিকগণ একমত যে, এ ঘটনা ৪১ হিজরিতে ঘটেছিল। এ কারণেই হাবিব বিন মাসলামা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে এ ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিতে পেরেছিল। কেননা তার মৃত্যু হয়েছিল এর পরের বছর ৪২ হিজরিতে। সুতরাং ইয়াজিদের মনোনয়নের সাথে এ ঘটনার কোনো দিক থেকেই কোনো সম্পর্ক নেই।

বিভিন্ন অঞ্চলে তার প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে দেন, যেন তারা সবার থেকে তার পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমুল জামাআর বছর হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত বুসর বিন আরতাত রা. কে মদিনায় পাঠলেন, যেন তিনি এক এক কবিলা করে মদিনার সকল মানুষের বাইয়াত গ্রহণ করেন। যেদিন আনসারদের পালা এলো, সেদিন বনু সালামাও এলো। কিন্তু বুসর রা. বললেন, এখানে কি জাবের আছে?

সবাই বলল, না।

তিনি বললেন, এরা ফিরে যাক। জাবের যতক্ষণ পর্যন্ত না আসবে, ততক্ষণ আমি এদের বাইয়াত গ্রহণ করব না।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. বলেন, এরপর একজন আমার কাছে এসে বলল, আমরা আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন এবং বাইয়াত হোন, যাতে আপনার এবং আপনার কওমের রক্ত সুরক্ষিত থাকে। যদি আপনি এটা না করেন, তা হলে আমাদের যুবকদের হত্যা করা হবে, আমাদের সন্তানদের গোলাম-বাঁদি বানানো হবে।

হজরত জাবের রা. বলেন, আমি তাকে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললাম। সন্ধ্যায় আমি উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালামা রা. এর কাছে গিয়ে সবকিছু তাকে জানালাম।

তিনি বললেন, 'আমার ভাতিজা, যাও, বাইয়াত হয়ে তোমার এবং তোমার কওমের রক্ত সংরক্ষিত রাখো। আমি আমার ভাতিজাকেও একথাই বলেছিলাম। সে গিয়ে বাইয়াত হয়েছে'।[২৪৩]

২৪৩

حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما كان عام الجماعة بعث معاوية إلى المدينة بسر بن أرطاة ليبايع أهلها على راياتهم وقبائلهم فلما كان يوم جاءته الأنصار جاءته بنو سليم فقال أفيهم جابر قالوا لا قال فليرجعوا فإني لست مبايعهم حتى يحضر جابر قال فأتاني فقال ناشدتك الله إلا ما انطلقت معنا فبايعت فحقنت دمك ودماء قومك فإنك إن لم تفعل قتلت مقاتلتنا وسبيت ذرارينا قال فاستنظرهم إلى الليل فلما

অঙ্গীকার রক্ষার প্রতি হজরত হাসান রা. এর গুরুত্বারোপ

হজরত হাসান রা. স্বাধীনতা ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও খেলাফতের দায়িত্ব হজরত মুয়াবিয়া রা. এর হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। কিন্তু এর পরেও তিনি উম্মাহর এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তার আঙুলের ইশারায় হাজারো শির কর্তিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। তবু উম্মাহর কল্যাণকে সামনে রেখে এবং হজরত মুয়াবিয়ার যোগ্যতার প্রতি আস্থা রেখে তার অনুগত হয়ে ছিলেন।

কিছু মানুষ হজরত হাসানকে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বিরুদ্ধে উসকে তোলার অপচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। আর এক্ষেত্রে হজরত হাসানের অস্বীকৃতিকে তারা তার দুর্বলতা ও ভীরুতা বলে গণ্য করে। কিন্তু হজরত হাসান সর্বাবস্থায় তার সিদ্ধান্তের উপর অবিচল থাকেন। অপপ্রচারমূলক মিথ্যার জবাব দিতে থাকেন।

أمسيت دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرتها الخبر فقالت يا بن أم انطلق فبايع واحقن دمك ودماء قومك فإني قد امرت بن أخي يذهب فيبايع

(مصنف ابن ابی شیبة، الرواية: ٣٠٥٦٢ بسد صحيح متصل بل هو اصح ما فی الباب، ط الرشد)

এ বর্ণনার এই অর্থ নেওয়া যাবে না যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বাহিনী বাইয়াত গ্রহণে অসম্মত মুসলমানদের ধরে ধরে হত্যা করত এবং তাদের সন্তানদেরকে গোলাম-বাঁদি বানাত। এমনটি কোথাও প্রমাণিত নেই। তেমনিভাবে এটাও প্রমাণিত নেই যে, প্রতি শহরে বাইয়াতের জন্য বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল।

উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মদিনায় বাইয়াত গ্রহণের জন্য বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল। তবে অবশ্যই এর ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

যদি হিজরি প্রথম শতাব্দীর বিভিন্ন ঘটনা, যেমন সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধ ও হাররার ঘটনা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ করা হয়, তাহলে মনে হবে, হিজাজবাসী বিশেষত মদিনাবাসী শামিদের অধীনস্থ থাকতে কোনোভাবেই সম্মত ছিল না। শামিরাও এটা খুব ভালো করেই জানত। আর এ কারণেই মদিনায় বাইয়াত গ্রহণের জন্য বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল। যাতে মদিনাবাসীর উপর কিছুটা ভীতির সঞ্চার হয় এবং তারা নিজেদেরকে স্বাধীন ভেবে নিজেদের ইচ্ছামতো অবস্থান গ্রহণ না করে। সর্বোপরি যাতে আবারো উম্মাহর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে না পড়ে।

লোকেরা হজরত জাবের রা. বলেছিল, আপনার এবং আপনার কওমের রক্ত সুরক্ষিত করুন, নতুবা তাদেরকে মেরে ফেলা হবে এবং সন্তানদেরকে গোলাম-বাঁদিতে পরিণত করা হবে। এটা ছিল তাদের আশঙ্কা। বাস্তবে এমন কিছুই ঘটেনি। যাই হোক, এই আশঙ্কার ভিত্তিতেই হজরত উম্মে সালামা রা.-ও এটাই বলেছিলেন যে, 'বাইয়াত হয়ে নিজের এবং নিজ কওমের রক্ত সুরক্ষিত করো'।

এরই ধারাবাহিকতায় সন্ধির পর একদিন হজরত জুবায়ের বিন নুজাইর তাকে প্রশ্ন করেন, 'মানুষ বলাবলি করছে, আপনি (এখনো) খেলাফতের প্রতি আগ্রহী?

হজরত হাসান অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এ কথা অস্বীকার করে বলেন, 'আমার জন্য আরবজাতির মাথা দিতেও প্রস্তুত। আমি যার বিরুদ্ধে লড়াই করব, তারাও তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আমি যার সাথে সন্ধি করব, তারা তার সাথে সন্ধি করবে। তবু আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় উম্মতের রক্ত সুরক্ষিত রাখার স্বার্থে খেলাফত বর্জন করেছিলাম। তা হলে এখন কি আবার আমি হিজাজবাসীর মধ্যে রক্তপাত ঘটাব?'[২৪৪]

কায়েস বিন সা'দ রা. এর বাইয়াত

হজরত হাসান রা. এর কতিপয় আন্তরিক আমির শুরুর দিকে হজরত মুয়াবিয়ার হাতে বাইয়াতের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এদের অন্যতম ছিলেন হজরত কায়েস বিন সা'দ রা.। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. সুকৌশলে নম্র ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে সম্মত করে নেন। কেননা তার লক্ষ্য ছিল যেকোনো মূল্যে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে আনা।

হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত কায়েস রা. এর নিকট দূত পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি কার অধীনে লড়াই করার জন্য জেদ ধরে আছেন; অথচ আপনি যার অধীনস্থ, তিনি নিজেই তো আমার হাতে বাইয়াত হয়েছেন।

হজরত কায়েস বিন সা'দ রা. হজরত মুয়াবিয়ার কাছে হেরে যাওয়া পছন্দ করলেন না। তখন হজরত মুয়াবিয়া একটি সাদা কাগজে মোহর লাগিয়ে লিখে দিলেন যে, 'আপনি এখানে যা যা শর্তারোপ করবেন, সব আমি আগাম মঞ্জুর করলাম'।

এদিকে হজরত আমর ইবনুল আস রা. এতটা উদারতা প্রদর্শনকে সতর্কতার পরিপন্থি মনে করে বললেন, 'কায়েসের সাথে নমনীয়তা সমীচীন নয়'।

---

[২৪৪] আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, হাদিস : ৪৭৯৫, সনদ সহিহ।

এ কথা শুনে হজরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, 'আপনি চিন্তা করে দেখুন তো, আমরা তার উপর ততক্ষণ পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারব না, যতক্ষণ শামিদের থেকেও এত পরিমাণ লোক মারা হবে। আর যদি তাই হয়, তা হলে এরপর বেঁচে থাকার আর কী স্বাদ থাকবে? আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো উপায় অবলম্বন করা সম্ভব হবে, ততক্ষণ আমি কায়েসের সাথে লড়াই করব না।

তারপর হজরত মুয়াবিয়া রা. এই মোহরাঙ্কিত কাগজটি পাঠিয়ে দিলেন। তখন হজরত কায়েস রা. নিজের জন্য এবং হজরত আলি রা. এর সহযোগীদের জন্য নিরাপত্তা দাবি করলেন। তিনি বললেন, (অতীতের বিভিন্ন লড়াইয়ে) আমাদের হাতে যারা নিহত হয়েছে, অথবা আমরা গনিমতের সম্পদ নিয়েছি, তার কোনো বদলা নেওয়া যাবে না।

এ চুক্তিপত্রে তিনি হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে কোনো আর্থিক দাবি পেশ করেননি। হজরত মুয়াবিয়া তার শর্ত মঞ্জুর করেছিলেন। ফলে হজরত কায়েসের সাথি-সঙ্গী সবাই হজরত মুয়াবিয়ার দলে শামিল হয়ে গিয়েছিল।[২৪৫]

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর রাজনৈতিক কর্মপন্থায় নম্রতা ও মনোতুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। আন্তরিকভাবে তিনিও উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামী ছিলেন। যথাসম্ভব শক্তির পরিবর্তে তিনি সমঝোতার প্রবক্তা ছিলেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, সন্ধিপত্রে এ শর্তও ছিল যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পর খলিফা হবেন হজরত হাসান রা.। কিন্তু প্রাচীন উৎসগুলোর কোনো বর্ণনা দ্বারা এর পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় না। যদি সত্যিই এ শর্ত আরোপ করা হতো, তা হলে পরবর্তীতে ইয়াজিদের মনোনয়নের সময় লোকেরা অবশ্যই বলত যে, এ অধিকার তো হজরত হাসানের ছিল। তিনি যেহেতু ইনতেকাল করেছেন, তাই এখন এ অধিকার তার সন্তানদের হওয়া উচিত। কিন্তু তখন এমন যুক্তি বা প্রমাণ কেউ পেশ করেননি।

---

[২৪৫] তারিখুত তাবারি: ৫/ ১৬৫

সম্ভবত হজরত হাসানের হত্যার দায় হজরত মুয়াবিয়ার উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্যই এ বর্ণনা বানানো হয়েছিল।

ইরাক থেকে হজরত হাসান ও হুসাইন রা. এর প্রস্থান ও বিদায়ী বাণী

খেলাফতের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ার পর হজরত হাসান মাদায়েনের দুর্গে লোকজনকে সমবেত করলেন। তরপর সকলকে লক্ষ করে বললেন, 'হে ইরাকবাসী, তোমরা আমার হাতে এই শর্তে বাইয়াত হয়েছিলে যে, সন্ধি কিংবা যুদ্ধ, সর্বাবস্থায় তোমরা আমার সাথে থাকবে। আমি হজরত মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করেছি। সুতরাং এখন তোমরা তার কথা শোনো, তাকে মেনে চলো।'[২৪৬]

এরপর হজরত হাসান কুফায় যান। সেখানে শহরবাসীকে বিদায় জানাবার পূর্বে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী একটি ভাষণ দেন, যাতে মানুষকে তিনি প্রতিবেশী, মেহমান এবং বনু হাশিমের অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।[২৪৭]

ইরাকের ফেতনাবাজ লোকদের দ্বারা খলিফা ও তার গভর্নররা বেশ কষ্ট পেয়েছিল। কিন্তু হজরত হাসান রা. সেখান থেকে বিদায় নেবার পূর্বে অতুলনীয় উদারতার প্রমাণ দিয়ে সেসব জুলুম-অত্যাচার সব ক্ষমা করে দেন। তিনি বলেন, হে ইরাকের অধিবাসীগণ, আমি তোমাদের তিন অপরাধই ক্ষমা করে দিলাম। আমার পিতার হত্যা, আমার উপর বর্শার আঘাত এবং আমার সাজ-সরঞ্জাম লুটপাট।[২৪৮]

---

[২৪৬] আল মা'রিফাতু ফিত তারিখ, ৩/ ৩১৭

[২৪৭] তারিখুত তাবারি: ৫/ ১৬৫

[২৪৮] তারিখুত তাবারি: ৫/ ১৫৯,১৬০,

ইসমাইল বিন রাশেদ থেকে বর্ণিত আছে....

পিতার হত্যা ক্ষমা করে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, হত্যাকারীকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন। হত্যাকারী আবদুর রহমান বিন মুলজিমকে তো আগেই কেসাসস্বরূপ হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং ক্ষমা দ্বারা হজরত হাসান সম্ভবত বুঝাতে চেয়েছেন, এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে কার্যকর ষড়যন্ত্রের তদন্ত করলে হয়তো ইরাকের কিছু মানুষ, বিশেষত খারেজি ও সাবায়িরা পৃষ্ঠপোষক বলে প্রমাণিত হবে। আর শাসক এই শ্রেণির লোকদেরকেও শিক্ষা দেওয়ার জন্য শাস্তির আওতায় আনতে পারেন। কিন্তু

হজরত হাসানের এ কথা শুনেও কিছু মানুষের অন্তর ঠান্ডা হলো না। তারা হজরত মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধির কারণে হজরত হাসানকে লাঞ্ছিত করতে লাগল। তারা বলল, আপনি মুমিনদের জন্য লাঞ্ছনার কারণ।

হজরত হাসান সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, লাঞ্ছনা আগুন থেকে ভালো।[২৪৯]

হজরত হাসান ও হুসাইন রা. এর মদিনায় অবস্থান

এরপর হজরত হাসান রা. আপন ভাই হজরত হুসাইন এবং পরিবারের অন্যান্যকে নিয়ে একটি কাফেলার মতো করে মদিনায় গমন করেন।[২৫০]

বসস্থান স্থানান্তরের মধ্যে কয়েকটি ফায়দা ছিল। হজরত হাসান চাচ্ছিলেন, রাজনৈতিক ঝুট-ঝামেলা থেকে তার আঁচল বাঁচিয়ে রাখতে। আর কুফায় থেকে এটা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া হজরত হাসানের আপসহীন সঙ্গী-সাথি ও খারেজিদের থেকে দুর্ঘটনারও আশঙ্কা ছিল। এ দিক থেকে মদিনা ছিল তার জন্য সুরক্ষিত ও প্রিয় স্থান। সেখানেই তিনি জীবনের বাকি দিনগুলো নিরিবিলি কাটাতে চাচ্ছিলেন।

মদিনায় গিয়ে হজরত হাসান উম্মাহর রুহানি দীক্ষা ও আকিদা সংশোধনের কাজে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। নবী-পরিবার সম্পর্কে দাঙ্গাবাজদের অতিরঞ্জনকে তিনি সর্বদা অস্বীকার করতে থাকেন। কেউ প্রশ্ন করল, আপনার সঙ্গীরা তো এই আকিদা পোষণ করে যে, হজরত আলি রা. কেয়ামতের পূর্বে পুনরায় জীবিত হবেন।

হজরত হাসান রা. জোরালো ভাষায় অস্বীকার করে বলেন, আল্লাহর কসম, তারা মিথ্যা বলে। তারা আমাদের দলের লোক নয়। আমরা যদি হজরত আলির পুনরুজ্জীবিত হওয়ার আকিদা রাখতাম, তা হলে তার স্ত্রীগণ তো দ্বিতীয়বার বিবাহ করতেন না এবং তার মিরাসও বণ্টন করা হতো না।[২৫১]

হজরত হাসান ক্ষমা করে দিয়েছেন। পিতার হত্যা ক্ষমা করার দ্বারা সম্ভবত এটাই উদ্দেশ্য ছিল।

[২৪৯] আল ইসাবাহ : ২/৬৪

[২৫০] তারিখুত তাবারি: ৫/ ১৬৫

[২৫১] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/ ২৬৩

হজরত হাসান ও হুসাইন রা. এর সঙ্গে মুয়াবিয়া রা. র উত্তম ব্যবহার

হজরত মুয়াবিয়া রা. আজীবন হজরত হাসান ও হুসাইন রা. র সেবা-যত্ন ও তাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বজায় রেখে গেছেন। একবার হজরত হাসান ও হুসাইন রা. হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে এলেন। হজরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, আমি আপনাদেরকে এমন উপহার দেব, যা এর পূর্বে কেউ কাউকে দেয়নি। তারপর তিনি তাদেরকে দুই লক্ষ দিরহাম উপহার দেন।[২৫২]

এ ছাড়া আরেকবার হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত হাসান, হুসাইন এবং তাদের চাচাতো ভাই হজরত আবদুল্লাহ বিন জাফর, এদের প্রত্যেকের জন্য এক লক্ষ দিরহাম উপহার পাঠান।[২৫৩]

উপহার দেওয়ার এ সুন্দর ধারা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। হজরত হাসান ও হুসাইন রা. সব সময় হজরত মুয়াবিয়া রা. এর উপহার গ্রহণ করতেন।[২৫৪]

হজরত হাসান রা. এর সমালোচনার অপচেষ্টা

হজরত মুয়াবিয়া ও হজরত হাসান রা. এর মধ্যে সন্ধি হওয়ার কারণে কট্টরপন্থিরা ভীষণভাবে হতাশ হয়েছিল। তাই তারা তাদের মনের খেদ মেটানোর জন্য হজরত হাসান রা. কে مذل العرب তথা আরবজাতিকে লাঞ্ছনাকারী বলে নিন্দা করতে থাকে।[২৫৫] তা ছাড়া তারা এমন বর্ণনাও ছড়িয়ে দেয় যে, তিনি কেবল আরাম-আয়েশের জন্যই সন্ধি করেছিলেন। সারাটা জীবন কাটিয়েছেন একের পর এক বিয়ে করা ও তালাক দেওয়ার কাজে। কথিত আছে, তিনি বিবাহের কিছুদিনের মাথায় তালাক দিয়ে দিতেন। এমনকি তার উপাধি হয়ে গিয়েছিল 'মিতলাক' বা অধিক তালাকদাতা।[২৫৬]

---

[২৫২] তারিখে দিমাশক : ৫৯/ ১৯৩
[২৫৩] তারিখে দিমাশক : ৫৯/ ১৯৪
[২৫৪] তারিখে দিমাশক : ৫৯/ ১৯৪
[২৫৫] তারিখুত তাবারি: ৫/ ১৬৫
[২৫৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, ১১/ ১৯৭,১৯৮

কিন্তু সত্য এই যে, এ সমস্ত বর্ণনা অত্যন্ত দুর্বল। বরং এগুলোর অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। যেগুলোর সনদ আছে, তাতেও হিশাম কালবি, ইবনে জাদুবা এবং ওয়াকিদির মতো সমালোচিত রাবিরা আছে, যাদেরকে জারহ্-তা'দিলের ইমামগণ অত্যন্ত দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।

তদুপরি চিন্তার বিষয় হলো, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট তালাক হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ।[২৫৭] আর আল্লাহর নবীর যে প্রিয় দৌহিত্র সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করতেন, তিনি কি সারাটা জীবন এমন ঘৃণিত কাজের মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারেন?

হজরত হাসান রা. এর মৃত্যু

হজরত হাসান রা. সারা জীবন মদিনায় ছিলেন। ৪৯ বা ৫০ হিজরিতে যখন তার বয়স ৫৭ বছরে উপনীত হয়, তখন কোনো অভিশপ্ত তাকে অত্যন্ত শক্তিশালী বিষ প্রয়োগ করে। সেই বিষের ক্রিয়াতেই কিছুদিন পর তিনি মৃত্যু বরণ করেন। জানাজার নামাজের জন্য হজরত হুসাইন রা. হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. কে সামনে এগিয়ে দেন। হজরত সাঈদ রা. ছিলেন বনু উমাইয়া বংশের স্বনামধন্য ব্যক্তি।

তারপর জান্নাতুল বাকিতে আপন মাতা হজরত ফাতেমাতুয যাহরা রা. এর পার্শ্বে তাকে সমাহিত করা হয়।

হজরত হাসানের মৃত্যুর পর হজরত আবু হুরাইরা রা. মসজিদে নববিতে সমবেত লোকদের বলেন, লোকসকল, আজ আল্লাহর নবীর প্রিয় পাত্র দুনিয়া থেকে চলে গেলেন।

এ কথা শুনে উপস্থিত লোকদের কেউ অশ্রু সংবরণ করতে পারল না।[২৫৮]

---

[২৫৭] হাদিস শরিফে আছে,

أبغض الحلال الى الله تعالى الطلاق. (سنن ابى داؤد، ح: ٢١٧٨، كتاب الطلاق، باب فى كراهية الطلاق)

[২৫৮] আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১১/১১০-২১২

নোট : প্রসিদ্ধ আছে যে, হজরত হাসান রা. কে বিষপ্রয়োগের চক্রান্তে জড়িত ছিল তিনজন। তার স্ত্রী জাগদা, হজরত মুয়াবিয়া ও তার পুত্র ইয়াজিদ। কিন্তু সনদের

হজরত হাসান রা. এর খেলাফতকালটি যদিও সংক্ষিপ্ত ছিল; কিন্তু উম্মাহর উপর তার এর অবদান চির অমলীন হয়ে থাকবে যে, তিনি অকল্পনীয় আত্মত্যাগ ও অসাধারণ প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে উম্মাহকে ঐক্যের পথে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি এতটা বিসর্জন দিয়েছিলেন যে, চিরদিন মুসলিমজাতি এ কথা স্মরণ করে গর্বিত হবে। আর তা এভাবে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর নবীর সন্তান। খেলাফতের নিয়ন্ত্রণ ছিল তার হাতে। ইরাকের সৈন্যবাহিনী তার ইশারায় জীবন উৎসর্গ করতে ছিল সদাপ্রস্তুত। তার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল সর্বস্বীকৃত। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তিনি নত হওয়াকে মেনে নিয়েছেন। অথচ তার স্থানে যদি অন্য কোনো শাসক হতো, তা হলে ক্ষমতার জন্য জীবন দিতেও পিছপা হতো না। কিন্তু হজরত হাসান রা. তো দুনিয়ার বাদশাহ ছিলেন না। তিনি ছিলেন ওইসব খোলাফায়ে রাশেদিনের পরিশিষ্ট ও প্রতিবিম্ব, যারা ছিলেন স্বার্থান্বেষণ, অনৈতিক চাহিদা এবং সুবিধা তালাশের মতো গর্হিত চরিত্র থেকে পবিত্র। হজরত হাসান রা. যে অতুলনীয় আত্মত্যাগ ও বিসর্জনের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তা কেবল একজন খলিফায়ে রাশেদের পক্ষেই সম্ভব। অনৈক্য ও উচ্ছৃঙ্খলতায় দিশেহারা যুগে মুসলমানদের ঐক্যের পথে ফিরিয়ে আনা এবং ফেতনাবাজদের থেকে আঁচল বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তার এ আদর্শ কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে থাকবে।

বিচারে এটি কোনো প্রমাণিত কথা নয়। যেসব বর্ণনায় এ কথা বলা হয়েছে, তা হয়তো সনদবিহীন, অথবা অজ্ঞাত ও দুর্বল রাবিদের থেকে বর্ণিত। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, এই কিতাবের 'বাবু ইযালাতিশ শুবহাত'।

খেলাফতে রাশেদা সম্পর্কে ইসলামি আকিদা

মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশের ঐকমত্যপুষ্ট এবং সর্বসম্মত আকিদা এই যে, খেলাফতে রাশেদা হজরত আলি রা. পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। আর হজরত হাসানের শাসনামলের পাঁচটি মাস ছিল হজরত আলির যুগের পরিশিষ্ট। এর পরের যুগ খেলাফতে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত নয়।

এটা কোনো ইতিহাসসংক্রান্ত বিষয় নয়। বরং এটা আকিদা। এ কারণেই এ বিষয়টি আকিদার কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৫৯]

---

[২৫৯] আমাদের মহান পূর্বসূরিগণ খেলাফতে রাশেদা চার খলিফা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন, তন্মধ্য হতে আকিদাশাস্ত্রের কিতাবপত্রের কিছু ইবারত নমুনাস্বরূপ নিম্নে পেশ করা হচ্ছে। যথা :

١. قال الامام الاعظم ابو حنيفة رحـ: وافضل الناس بعد النبيين عليهم الصلوة والسلام ابو بكر والصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان ذو النورين ثم على بن ابى طالب. (الفقه الاكبر، ص: ٤١)

٢. قال الامام احمد بن حنبل: خير الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. (العقيدة، احمد بن حنبل برواية خلال، ص: ٢٣)

٣. وقال الامام الشافعي: اقدم ابا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليا رضي الله عنهم أجمعين، فهم الخلفاء الراشدون. (نقله الامام السيوطى فى حقيقة السنة والبدعة، ص: ٢٠٩)

٤. وقال امام الشافعية اسماعيل بن يحيى المزنى تلميذ الشافعى: "ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى بكر الصديق رضى الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبى صلى الله عليه وسلم، ونثنى بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه فى قبره وجليساه فى الجنة، ونثلث بذى النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه، ثم بذى الفضل والتقى على بن ابى طالب رضى الله عنهم أجمعين." (شرح السنة، ص: ١٦)

٥. وقال الامام ابو جعفر الطحاوى: وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَفْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ. ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. ثُمَّ لِعُثْمَانَ. ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْأَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّونَ. (العقيدة الطحاوية، ص: ٨١)

٦. وقال الامام ابو الحسن الاشعرى: هؤلاء هم الأئمة الأربعة المجمع على عدلهم وفضلهم رضي الله عنهم أجمعين وقد روى شريح بن النعمان قال : ثنا حشرج بن نباته عن سعيد بن جمهان

قال ثني سفينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك) ثم قال لي سفينة : أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم أمسك خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين (الابانة فى اصول الديانة، ابو الحسن الاشعرى، ص: ٢٥٩)

٧. وقال الامام ابن تيمية: أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد هؤلاء فهو أضل من حماره (العقيدة الواسطة، ص: ١١٨، ط اضواء السلف)

بل أهل السنة يقولون بالحديث الذى فى السنن "خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا" (منهاج السنة: ٤/ ٥٢٢)

٨. وقال امام المتكلمين ابو بكر الباقلانى: تحت قوله تعالى: وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ (سورة النور:٥٥) وكان من ذلك ما وعدهم الله تعالى واستخلف الاربعة الائمة الخلفاء الراشدين. (تمهيد الاوائل، ص: ١٨٥)

٩. وقال امام الحرمين جوينى: الخلفاء الراشدون لما ترتبوا في الإمامة فالظاهر ترتيبهم في الفضيلة فخير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وقد قال عليه السلام سنة الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا وكانت أيام الخلفاء هذا القدر (لمع الادلة فى قواعد اعتقاد أهل السنة، ص: ١٣٠)

١٠. وقال الامام الغزالى: فأما الخلفاء الراشدون فهم أفضل من غيرهم، وترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الإمامة، ....وهم قد أجمعوا على تقديم أبي بكر، ثم نص أبو بكر على عمر، ثم أجمعوا بعده على عثمان، ثم على علي رضي الله عنهم. (الاقتصاد فى الاعتقاد، ص: ١٣٢)

١١. وقال الامام النسفى: وأفضل البشر بعد نبينا صلى الله عليهم وسلم: أبو بكرالصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان ذو النورين، رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه وخلافتهم على هذا الترتيب ايضا. (متن عقائد النسفى، ص: ٤)

١٢. قال التفتازانى فى شرحه: خلافتهم اى نيابتهم عن الرسول عليه السلام في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الإتباع على هذا الترتيب ايضا، يعنى ان الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابى بكر ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلى رضى الله عنهم أجمعين. (شرح العقائد النسفية، ص: ٣٤٨)

অনেক আলেম হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. কেও খোলাফায়ে রাশেদিনের মধ্যে গণ্য করেছেন। (দ্রষ্টব্য : উমদাতুল কারি : ১/১১৩) হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কেও এ দলে সংযুক্ত করা হয়েছে।

الاعمر بن عبد العزيز فانه ملحق بالخلفاء الراشدين وكذلك ابن الزبير. (الصواعق المحرقة لابن حجر هيثمى: ٦٢٩/٢)

আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. হজরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কেও এ কথাই বলেছেন-

فهو من الخلفاء الراشدين" (تاريخ ابن خلدون: ٦٥٠/٢)

কেউ কেউ খেলাফতে রাশেদা ও পরবর্তী শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে এভাবে তুলনা করেন যে, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের কাজ কোন যুগে বেশি হয়েছে। কোন খলিফা অথবা কোন বাদশাহর আমলে অধিক দেশ জয় হয়েছে।

কিন্তু আদর্শ শাসকদের জন্য এ বিষয়গুলোকে প্রথম মাপকাঠি বানানো ঠিক নয়। কেউ যদি এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, তা হলে সুলতান মাহমুদ গজনবির যুগটি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর যুগের চেয়ে উত্তম সাব্যস্ত হবে। কেননা শাসিত অঞ্চলের চতুর্সীমানা এবং ভৌগোলিক বিজয়ের পরিমাপে সুলতান মাহমুদ গজনবি অনেক অগ্রসর ছিলেন। কিন্তু ইসলামি জ্ঞানে যার সামান্য দৃষ্টি আছে এবং মর্যাদার স্তরগত পার্থক্য যে বোঝে, এমন কেউ এজাতীয় কথা চিন্তাও করতে পারে না।

খেলাফতে রাশেদা শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ

খেলাফতে রাশেদার শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ চারটি। যথা :

১. খোলাফায়ে রাশেদিন ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্যশীল এবং আল্লাহর নবীর পবিত্র মুখনিসৃত মর্যাদায় অনন্য।

২. তারা অগ্রে ইসলাম গ্রহণ, হিজরত ও দীনের জন্য ত্যাগ ও কুরবানির ক্ষেত্রে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

৩. ফিক্হ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রেও তারা অন্যান্য উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

৪. তাদের শাসনামলে রাজনৈতিক নীতিমালা পরিপূর্ণরূপে ইসলামি শুরাভিত্তিক নিয়মে পরিচালিত হতো। একটি সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম

সম্ভবত এ সকল ব্যক্তি আভিধানিক অর্থের প্রতি লক্ষ করে চার খলিফা ছাড়া অন্যদের উপর খেলাফতে রাশেদা পরিভাষা প্রয়োগ করেছেন। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যেকোনো উত্তম ও ন্যায়পরায়ণ শাসককে 'রাশেদ' বলা যায়। কিন্তু এর দ্বারা পারিভাষিক খেলাফতে রাশেদা চারজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি বাতিল হয় না।

কিন্তু যদি এ সকল ব্যক্তিকে কেউ পারিভাষিক খেলাফতে রাশেদার মর্মকেই ব্যাপক করতে চায়, তাহলে স্পষ্ট যে, উম্মাহর অধিকাংশ ইমামের ঐকমত্যের বিপরীতের তার এ বিচ্ছিন্ন মতের কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে না।

ইসলামি শাসনব্যবস্থায় যেসব বৈশিষ্ট্য কাম্য, তার সবই খোলাফায়ে রাশেদার আমলে সর্বোচ্চ মানে বিদ্যমান ছিল।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, খোলাফায়ে রাশেদিনের উত্তম গুণাবলি একটি পর্যায়ে কতিপয় উমাইয়া ও আব্বাসি খলিফার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরবর্তী শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক নীতিমালায় ব্যক্তিগত ও বংশীয় পরিচালনার ধারা ছিল একটি আবশ্যক বিষয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তা খেলাফতে রাশেদা চেয়ে ব্যতিক্রম ছিল। আর এই প্রক্রিয়াটিই খেলাফতে রাশেদাকে খেলাফতে আম্মাহ ও রাজতন্ত্র থেকে পৃথক করে একটি পার্থক্যরেখা তৈরি করে দিয়েছিল। তা ছাড়া সহিহ হাদিসে ইরশাদ হয়েছে,

الخلافة ثلاثون سنة

খেলাফতে রাশেদা চার খলিফার মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টিকে এ হাদিস স্পষ্ট ভাষায় সমর্থন করে শক্তিশালী করে দিয়েছে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. এর বাণী

হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. বলেছেন, 'হাদিস শরিফে আছে, আল্লাহর নবী ইরশাদ করেছেন, 'আমার পরে খেলাফত চলবে ৩০ বছর'। তাই আমরা দেখতে পাই-

- আল্লাহর নবীর ইনতেকালের পর হজরত আবুবকর রা. খলিফা নির্বাচিত হন। তার শাসনামল ছিল ২ বছর ৪ মাস।
- তারপর হজরত উমর রা. খলিফা নির্বাচিত হন এবং ১০ বছর ৬ মাস শাসন পরিচালনা করেন।
- তারপর হজরত উসমান খলিফা হন এবং ১২ বছর থেকে কয়েক দিন কম শাসন পরিচালনা করেন।
- সবশেষে খলিফা হন হজরত আলি। তিনি খেলাফত পরিচালনা করেন ৪ বছর ৯ মাস।
- এরপর খলিফা হয়েছিলেন হজরত হাসান রা. এবং মাত্র ৫ মাস খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

এবার চার খলিফার শাসনামলকে যোগ করলে দেখা যায় মোট দাঁড়ায় ২৯ বছর ৭ মাস। এর সাথে হাসান রা. এর ৫ মাস যোগ করলে ৩০ সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যায়।

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সাথে হাসান রা. এর ঐতিহাসিক সন্ধি হয়েছিল ১৫ জুমাদাল উলা, ৪১ হিজরি তারিখে। এর দ্বারাও বোঝা যায় খেলাফতে রাশেদার মেয়াদ ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছিল। এরপর চলেছে আমিরদের শাসন ও ক্ষমতা। এক কথায় যাকে বলা যায় রাজতন্ত্র ও বাদশাহি ব্যবস্থা।

খেলাফতে রাশেদা-পরবর্তীযুগ

মুয়াবিয়া রা. এর খেলাফতকাল

শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ

৪১-৬০ হিজরি; ৬৬১-৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ

বংশ পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন

হজরত মুয়াবিয়া রা. ছিলেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত এবং বনু উমাইয়া গোত্রের প্রতিভাবান ব্যক্তি। তার পিতা ছিলেন হজরত আবু সুফিয়ান বিন হারব রা. এবং মাতা হজরত হিন্দ বিনতে উতবা রা.। এরা দুজন মক্কাবিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. এর আগে, ৭ম হিজরিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উমরাতুল কাযার সময় গোপনে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।[২৬০]

হজরত মুয়াবিয়া রা. র ব্যক্তিত্ব ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী ও গৌর বর্ণের সুদর্শন যুবক।[২৬১] শৈশব থেকেই তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণ এত দীপ্তমান ছিল যে, মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এক নজর দেখেই অবচেতন মনে বলে উঠত, 'আল্লাহর কসম, এ বালক অবশ্যই একদিন তার জাতির নেতা হবে'।[২৬২]

হজরত মুয়াবিয়া নবীজির পবিত্র খেদমতে

হজরত মুয়াবিয়া রা. ছিলেন কুরাইশের হাতেগোনা কয়েকজন শিক্ষিত যুবকদের একজন। মক্কাবিজয়ের পর তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেখক হিসেবে নিয়োজিত হন। আল্লাহর নবী তাকে দিয়ে আরব সরদারদের কাছে বিভিন্ন চিঠি লিখে পাঠাতেন। পাশাপাশি তিনি আসমানি ওহীও লিপিবদ্ধ করতেন।[২৬৩]

---

[২৬০] তারিখে দিমাশক লিবনি আসাকির : ৫৯/৫৭, তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/৪০৬, ইসলাম গ্রহণকালে তার বয়সের বিষয়টি মৃত্যুর সময় তার বয়স থেকে অনুমান করে লেখা হয়েছে।

[২৬১] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/১২১,

[২৬২] তারিখে দিমাশক লিবনি আসাকির : ৫৯/৫৭

[২৬৩] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৩০১৪, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/১২৩

এভাবে তিন বছর পর্যন্ত তিনি আল্লাহর নবীর নৈকট্য লাভ করেন। এ সময় তিনি প্রচুর হাদিস শ্রবণ এবং বর্ণনা করেন। তার থেকে মোট ১৬৩টি হাদিস বর্ণিত আছে।[২৬৪]

হজরত মুয়াবিয়ার খেদমতে সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর নবী তাকে বিভিন্ন দোয়া করতেন। একবার এ দোয়া করলেন,

اللہم اجعله هاديا مهديا واهد به

> হে আল্লাহ, তাকে আপনি হেদায়েতের পথপ্রদর্শনকারী এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন এবং তার মাধ্যমে হেদায়েতকে ব্যাপক করে দিন।[২৬৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় এমন কিছু ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন, যার দ্বারা হজরত মুয়াবিয়ার ধারণা হয়েছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানদের নেতৃত্বদানের ভারী বোঝা তার কাঁধে চাপবে। কেননা একবার আল্লাহর নবী তাকে বলেছিলেন, 'মুয়াবিয়া, কখনো যদি তোমাকে শাসনক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্বশীল বানিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে আল্লাহকে ভয় করবে এবং ন্যায় ও ইনসাফ বজায় রেখে চলবে'।

হজরত মুয়াবিয়া রা. বলতেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর কারণে (যা ছিল নিঃসন্দেহে ভবিষ্যদ্বাণী) সব সময় আমার বিশ্বাস ছিল, আমাকে অবশ্যই শাসন পরিচালনার পরীক্ষায় ফেলা হবে। অবশেষে সে দায়িত্ব আমাকে গ্রহণ করতেই হয়'।[২৬৬]

নবীজির ইনতেকালের পর হজরত মুয়াবিয়া

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর যুগে হজরত মুয়াবিয়া রা. আপন বড় ভাই হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানের সঙ্গে শামের বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

শামের বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর হজরত উমর রা. ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররা রা. কে শাম অঞ্চলে তার

---

[২৬৪] আসমাউস সাহাবা আর রুওয়াত লিবনি হাযাম, পৃষ্ঠা : ৫৫

[২৬৫] সুনানুত তিরমিযি, হাদিস : ৩৮৪১, আবওয়াবুল মানাকিব, সনদ সহিহ।

[২৬৬] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৯৩৩, এর বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তারপর যখন ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান রা. এর ইনতেকাল হয়। তখন হজরত উমর রা. এর নির্বাচন-দৃষ্টি হজরত মুয়াবিয়া রা. এর উপর নিবদ্ধ হয়। হজরত মুয়াবিয়া তার ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিভাবান ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। অন্যদিকে শাম ছিল এমন এক দেশ, যেখানে প্রতিমুহূর্তে রোমানদের আক্রমণের আশঙ্কা লেগে থাকত। সুতরাং এমন স্থানের জন্য হজরত মুয়াবিয়াকে নির্বাচন করা একথারই প্রমাণ যে, তার উপর হজরত উমর রা. এর পূর্ণ আস্থা ছিল।

ইসলামের এ মহান সিপাহসালার হজরত উসমান রা. এর যুগে সমুদ্র অভিযানের সূচনা করেন। তারপর রোমানদেরকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে অনেক এলাকা দখল করে নেন।[২৬৭]

যুদ্ধ কিংবা সন্ধি, যেকোনো অবস্থায় হজরত মুয়াবিয়া রা. ইসলামি শরিয়তের পূর্ণ অনুগত ছিলেন। একবার রোমানদের সাথে তার সন্ধির মেয়াদ চলছিল। এই অবসরে তিনি সীমান্ত এলাকায় সৈন্যসমাবেশ ঘটান। তারপর সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্র সৈন্যবাহিনীকে দুশমনের এলাকায় অভিযানে নামিয়ে দেন। এমন সময় বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আমর বিন আবাসা রা. অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটে আসেন এবং চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'আল্লাহু আকবার, ওয়াদা রক্ষা করো, গাদ্দারি করো না'। তারপর হজরত মুয়াবিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে এ হাদিস স্মরণ করিয়ে দেন যে, যখন দুটি জাতির মধ্যে সন্ধির চুক্তি হবে, তখন কেউ যেন তা ভঙ্গ না করে'। অর্থাৎ সন্ধির মেয়াদ চলাকালে সন্ধির পরিপন্থি কিছু যেন না করে।

উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যুদ্ধবন্ধকালীন সময় সৈন্যসমাবেশ ঘটিয়ে আক্রমণোদ্যত হয়ে থাকবে না এবং মেয়াদ শেষ হতেই সীমান্ত লঙ্ঘনমূলক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা ঠিক নয়।

হজরত মুয়াবিয়া রা. এ কথা শোনার সাথে সাথে সৈন্যবাহিনীকে ফিরে আসার আদেশ দেন এবং বিজিত এলাকাগুলো খালি করে দিয়ে চলে আসেন।[২৬৮]

---

[২৬৭] উসদুল গাবাহ : ৫/২০১

সত্যিই, আল্লাহর আইনের প্রতি এমন আনুগত্য কেবল সাহাবায়ে কেরামের জীবনেই পাওয়া যায়।

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর উপর সাহাবিদের আস্থা ও নির্ভরশীলতা

খোলাফায়ে রাশেদিন এবং বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম হজরত মুয়াবিয়া রা. এর যাবতীয় যোগ্যতার উপর শুধু যে আস্থাশীল ছিলেন তাই নয়, বরং তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দেখে তাকে বাহবা দিতেন। হজরত উমর রা. বলতেন, 'কায়সার ও কিসরার রাজত্ব নিয়ে আলোচনার তোমাদের কী প্রয়োজন, যখন তোমাদের মধ্যে মুয়াবিয়া উপস্থিত আছে'![২৬৯]

হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলতেন, 'রাজনীতিতে মুয়াবিয়ার চেয়ে অভিজ্ঞ আর কাউকে আমি দেখিনি'।[২৭০]

---

[২৬৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/ ১২৫

[২৬৯] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৩০

[২৭০] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৩৭, সনদ সহিহ

শাসনামলের সূচনা

৪১ হিজরির জুমাদাল উলার যেদিন হজরত মুয়াবিয়া রা. খেলাফতের মসনদে সমাসীন হন, সেদিন থেকে মুসলিমবিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। বহু বছরের দুর্যোগ ও দুরবস্থা থেকে মুসলিম উম্মাহ নিষ্কৃতি লাভ করে। মুসলিমজাতির রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ইসলামের যে দুশমনরা আনন্দিত হচ্ছিল, সেদিন থেকে তাদের উপর নেমে আসে হতাশার কালো অন্ধকার। অন্যদিকে একনিষ্ঠ মুসলমানদের সকল শ্রেণি রাজনৈতিক দিক থেকে এক পতাকাতলে এসে আশ্রয় নেয়। সেদিন থেকেই সর্বপ্রথম দামেশক নগরী ইসলামি খেলাফতের কেন্দ্র হয়ে যায়। তারপর থেকে প্রায় এক শতাব্দীকাল শামই ছিল ইসলামি খেলাফতের কেন্দ্রভূমি।[২৭১]

হজরত আলি রা. এর শাহাদাতের সময় সত্যিকার মুসলমানরা মূলত দুটি দলে বিভক্ত ছিল। একটি দল ছিল শামের, যারা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর অনুগত ছিল। অপরটি ছিল ইরাকি মুসলমানদের দল, যারা হজরত হাসান রা. এর হাতে বাইয়াত হয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, 'আপনি যার সাথে সন্ধি করবেন, আমরাও তার সাথে সন্ধি করব'।

এ দুটি দলের বাইরে নিরপেক্ষও ছিল প্রচুর মানুষ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হজরত সাঈদ বিন যায়েদ, হজরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা, হজরত উসামা বিন যায়েদ, হজরত সালামা ইবনে আকওয়া, হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হজরত আবু মুসা আশআরি ও হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

---

[২৭১] তারিখুত তাবারি : ৫/৩২৪

قال ابن حجر: فسميت سنة الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب. (فتح البارى: ٦٣/١٣)

হজরত হাসান রা. যখন খেলাফতের পদ হজরত মুয়াবিয়া রা. এর হাতে ছেড়ে দিলেন, তখন ইরাকের মুখলিস মুসলমানরাও হজরত মুয়াবিয়ার হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে হজরত কায়েস বিন সা'দ রা. এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এর ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ছিলেন।

অন্যদিকে নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ যখন বিশেষ ও সাধারণ নির্বিশেষ সকলকে হজরত মুয়াবিয়া রা. খেলাফতের ব্যাপারে একমত দেখতে পেলেন, তখন তারাও বাইয়াত হয়ে গেলেন। একারণে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর খেলাফতের মসনদে সমাসীন হওয়ার বছরটিকে عام الجماعة তথা ঐক্যের বছর বলে স্মরণ করা হয়ে থাকে। এ হিসেবে হজরত মুয়াবিয়া রা. শাসন পরিচালনা কল্যাণ ও বরকতের কারণ হয়েছিল।[২৭২]

তবে একথা সঠিক যে, হজরত আলি এবং হজরত হাসান রা. এর হাতে বাইয়াত না হওয়া এবং শামদেশের উপর কর্তৃত্ব ও স্বাধীন ক্ষমতা ধরে রাখাটা ছিল হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ইজতিহাদি ভুল। কিন্তু হজরত আলির স্থলাভিষিক্ত হজরত হাসান রা. যখন হজরত মুয়াবিয়ার হাতে শাসনভার ছেড়ে দেন, তখন নিঃসন্দেহে তিনি শরিয়তসম্মতভাবে শাসনক্ষমতা লাভ করেছিলেন।[২৭৩]

সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কর্মপন্থা

এ সময়ও কিছু মানুষ এমন ছিল, যারা বুঝে কিংবা না বুঝে তাগুতি শক্তির ক্রীড়নক হয়ে মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধানোর চক্রান্তে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। মূলত এরা তিনটি দলে বিভক্ত ছিল। যথা :

১. হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীরা।
২. খারেজি চিন্তাধারা পোষণকারী কট্টরপন্থি দল, যারা নিজেদের ছাড়া কাউকে মুসলমান মনে করত না।

---

[২৭২] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত : ৪১ হিজরির অধিনে, তারিখে ইবনে যুরআ আদ দিমাশকি : ১/১৯০,

[২৭৩] ফারুকি রহ. মাওলানা আবদুশ শাকুর লাখনাবি. 'সাহাবা ও খোলাফায়ে রাশেদিন সম্পর্কে জরুরি আকায়েদ' শিরোনামে অধীনে লিখেছেন, হজরত মুয়াবিয়া রা. শুরুতে বিদ্রোহী ছিলেন বটে, কিন্তু হজরত হাসান বিন আলি রা. র পক্ষ থেকে সন্ধি ও বাইয়াত হওয়ার পর নিঃসন্দেহে তিনি বৈধভাবেই খলিফা হয়েছিলেন। (সিরাতে খুলাফায়ে রাশেদীন, পৃষ্ঠা : ১১)

৩. শামের কট্টরপন্থি উমাইয়া ও মারওয়ান গোত্রের লোকজন, যারা ছিল গোত্রীয় পক্ষপাতের শিকার।

শামের সকল দল আগে থেকেই হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সঙ্গে ছিল। হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী দল, যাদের মধ্যে সাবায়িরাও মিশে ছিল, তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর হাতে বাইয়াত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

খারেজিরাও এমনই করেছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. বড় বিচক্ষণতার সঙ্গে এদের সকলকে শামলে নিয়েছিলেন। অত্যন্ত সহনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাহায্যে তাদেরকে ন্যায় ও ভারসাম্যের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। অকারণে কঠোরতার পক্ষে তিনি ছিলেন না।

খারেজিরা হজরত আলি রা. এর কাছে পরাজিত হয়ে নিজেদের জনবল হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এখন তারা ভেতরে ভেতরে আবার সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. এদের সাধারণ সদস্যদের দিকে হাত বাড়ালেন না। কিন্তু যারা অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা ছড়াচ্ছিল, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হজরত মুয়াবিয়া মোটেই বিলম্ব করেননি।

একইভাবে সাবায়িদেরকেও নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

হজরত মুয়াবিয়া রা. নিজ কাঁধে আরোপিত সেই দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন, যা তিনি শাসনক্ষমতা লাভ করার কারণে মাথায় নিয়েছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, মুসলিমবিশ্বকে একটি দৃঢ়, নিরাপদ ও অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত করবেন। কেননা এ পর্যন্ত বনু হাশিম গোত্রের আত্মত্যাগ এবং মুসলমানদের একতার ফলে আজ তার হাতে গোটা মুসলিমবিশ্বের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এসেছে।

এক্ষেত্রে তিনি খোলাফায়ে রাশেদিনের সিরাত সম্মুখে রাখার পাশাপাশি তৎকালীন পৃথিবীতে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাগুলো থেকেও উপকৃত হয়েছেন। উমাবি সাম্রাজ্যকে একটি সর্বস্বীকৃত শাসনব্যবস্থা রূপে সুগঠিত করার জন্য যা কিছু করা দরকার, তার সব ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন, যাতে বিপক্ষশক্তি এ সাম্রাজ্যকে টলাতে না পারে।

এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য হজরত মুয়াবিয়ার সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজগুলো ছিল, তা এই :

১. শরিয়তকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত রাখা।
২. আরবজাতির নেতৃত্ব সুবিন্যস্ত করা।
৩. বহিঃশক্তির হাত থেকে মুসলিমবিশ্বকে সুরক্ষিত রাখা এবং নতুন বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখা।
৪. সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা এবং ন্যায় ও ইনসাফ বিস্তৃত করা।
৫. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজানো।
৬. বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের ভেতরগত চক্রান্তগুলোকে যথাযথভাবে নির্মূল করা।

শাসনভার গ্রহণ থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত এ বিষয়গুলোর প্রতিই হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এবার আসুন, এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পদক্ষেপগুলোর প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে আসি।

১. সবকিছুর ঊর্ধ্বে শরিয়তকে প্রতিষ্ঠিত রাখা

যেমনিভাবে অতীতের খলিফাগণের জীবনের লক্ষ্য ছিল শরিয়তকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত রাখা, তেমনিভাবে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর লক্ষ্যও এটাই ছিল। তিনি কখনোই ইচ্ছাকৃতভাবে শরিয়তের সীমার বাইরে কদম রাখেননি। তার ছত্রছায়ায় মুসলিমবিশ্বের প্রতিটি শহরে কুরআন ও সুন্নাহকেই সাংবিধানিক রূপ দেওয়া হয়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর সম্মুখে হজরত মুয়াবিয়া মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন।[২৭৪]

নসিহতের উপর তৎক্ষণাৎ আমল

পূর্ববর্তী তিন খলিফার উপর প্রাণঘাতী হামলার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে হজরত মুয়াবিয়া রা. নিজের জন্য পাহারা নিযুক্ত করেছিলেন। তাই যেকেউ যেকোনো সময় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারত না।

এই অবস্থা দেখে আবু মারয়াম আল আযদি নামের এক সাহাবি হজরত মুয়াবিয়ার কাছে গিয়ে বলেন, 'আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যদি কাউকে মানুষের দায়িত্বশীল বানান, আর সে তার এবং মুসলমানদের প্রয়োজনাদি ও বিষয়আশয়ের মধ্যে আড়াল করে দেয়, তা হলে আল্লাহ তায়ালাও তার প্রয়োজন ও নিজের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করে দেবেন'।

---

[২৭৪] হজরত আলি রা. র যুগে হজরত মুয়াবিয়া রা. রাজনৈতিক বিষয়ে যে সকল ভিন্নমত গ্রহণ করেছিলেন, তা ভালো উদ্দেশ্যেই ছিল। কখনোই তার দ্বারা শরিয়তের বিরোধিতা করা উদ্দেশ্য ছিল না। খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পরও যা কিছু করেছিলেন, তা তার চিন্তা, বুদ্ধি ও ইজতিহাদ অনুযায়ী শরিয়তের ওয়াজিব মনে করেই করেছিলেন। তাই সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানরা সেগুলোকেও ইজতিহাদি ভুল বলে আখ্যায়িত করেন। বদদীনি বা গুনাহ বলেন না। (ইজতিহাদি ভুলের কারণে সওয়াব দেওয়া হয়।)

হজরত মুয়াবিয়া রা. একথা শুনতেই এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, যার দায়িত্ব ছিল মানুষের প্রয়োজন ও বিষয়আশয় তার কাছে পৌঁছে দেওয়া।[২৭৫]

কিসাসের বিষয়ে হজরত আলির ইজতিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন

শরিয়তের ঊর্ধ্ব-অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত রাখার ধারাবাহিকতায় হজরত মুয়াবিয়া রা. বিভিন্ন দলিলের উপর চিন্তাভাবনা করে হজরত উসমান রা. এর কিসাসের ক্ষেত্রে হজরত আলি যে ইজতিহাদ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন, তার অনুসরণ করেন। হজরত উসমান রা. এর শাসনবিরোধী আন্দোলনের মূল হোতাদের উপর কোনো রকম শাস্তি কার্যকর করেননি। বরং তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।[২৭৬] আর এর দ্বারা এ ইজতিহাদ সর্বদিক থেকে ইজমার রূপ গ্রহণ করে।

পূর্ববর্তী কোনো শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জড়িত ছিল, কিন্তু বর্তমান খেলাফতের হাতে বাইয়াত হয়েছিল, এমন সব মানুষ হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পুরো বিশ বছরের শাসনামলে জীবন ও সম্পদের সব রকম নিরাপত্তা লাভ করেছিল।

আসলে শরিয়তের মাসআলা এটিই ছিল এবং কর্মকৌশল ও কল্যাণকামনাও এটিই দাবি করছিল। তবে চলমান গৃহযুদ্ধ ও অস্থিতিশীল পরিবেশের কারণে এতদিন হজরত মুয়াবিয়া রা. বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হননি। কিন্তু এখন যখন গোটা মুসলিমবিশ্বের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছেন, তখন সেই বিষয়টি তার চোখে একটি জীবন্ত রহস্য হয়ে ধরা দিল।

হজরত মুয়াবিয়া রা. খেলাফতের মসনদে সমাসীন হয়েছিলেন হজরত হাসান রা. এবং তার সহযোগীদের সাথে সন্ধি ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে।

---

[২৭৫] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২৯৪৮, কিতাবুল খারাজ ওয়াল ইমারাহ, বাবুন ফি মা য়ালযামুল ইমাম মিন আমরির রায়িয়্যাতি ওয়াল হুজ্জাতি আনহু।

[২৭৬] তবে মূল ঘটনাস্থলে সরাসরি হত্যায় যারা অংশ নিয়েছিল, যারা সরাসরি হজরত উসমানের গায়ে প্রাণনাশি আঘাত করেছিল, যেমন কিনানাহ বিন বিশর, আবু শিমার, আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ ও অন্যান্যরা, এদেরকে তদন্তের পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। (তারিখে দিমাশক : ৫০/২৫৯, ২৬০, আল ইসাবাহ : ৫/৪৮২, জামহারাতু আনসাবিল আরব লিবনি হাযাম, পৃষ্ঠা : ৪৩৫, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৬৯১)

চুক্তি হয়েছিল যেসব লোক (বিগত যুদ্ধগুলোতে) ইরাকি বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে, কিংবা ইরাকিরা যে গনিমতের মাল লাভ করেছে, তার কোনো বদলা গ্রহণ করা হবে না।[২৭৭]

এ চুক্তির আগ পর্যন্ত শামের লোকেরা দীর্ঘদিন যাবত ইরাকিদেরকে বিদ্রোহী মনে করে। আর মূলত এটিই একমাত্র শরয়ি কারণ, যার ভিত্তিতে শামের লোকেরা ইরাকিদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করাকে বৈধ মনে করেছে। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. খেলাফতের মসনদে সমাসীন হওয়া ও উন্মুক্ত বাইয়াত গ্রহণ করার সময় একথা মানতে বাধ্য হলেন যে, বিগত সময়ের বিদ্রোহীদের সাথে রক্ষণশীল আচরণ করা যেমন রাজনৈতিক কল্যাণের দাবি, তেমনি শরিয়তসম্মতও। তা না হলে হজরত মুয়াবিয়া রা. কোনোক্রমেই ওইসব লোকের জীবন ভিক্ষা দেওয়ার চুক্তি কখনোই করার মানুষ ছিলেন না, যারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল এবং যাদের সম্পর্কে তিনি খুব ভালো করেই জানতেন যে, তাদের মধ্যে হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী কুচক্রীরাও আছে।

খেলাফত লাভ করার পর হজরত মুয়াবিয়া রা. একথাও বুঝে নিয়েছিলেন যে, এখন থেকে তিনি ইরাকের সেইসব লোককে আর বিদ্রোহী বলতে পারবেন না, যারা এ পর্যন্ত শামের বিপক্ষে কাজ করেছে। বরং এখন তাদের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থারই দায়িত্বে পরিণত হয়েছে।

ঠিক একইভাবে হজরত আলি রা.-ও হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করার পর তাদের নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। সুতরাং হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে সেই বিদ্রোহকারীরা আজও যদি ইরাকিদের মধ্যে উপস্থিত থাকে, তা হলে অতীতের বিদ্রোহ সত্ত্বেও শরিয়তের দৃষ্টিতে তারা ঠিক তেমনই নিরাপত্তা লাভ করেছিল, যেমন লাভ করেছিল শামবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ইরাকের লোকেরা।

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে এমন কোনো পার্থক্য ছিল না যে, একদিকে তিনি হজরত আলির নেতৃত্বে শামের

---

[২৭৭] তারিখুত তাবারি : ৫/১৬৫

বিরুদ্ধে লড়াইকারী ইরাকিদেরকে ক্ষমার যোগ্য মনে করবেন, অন্যদিকে হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদেরকে শাস্তিযোগ্য মনে করবেন। সিফফিনের যুদ্ধে যারা হজরত মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, যাদেরকে বিদ্রোহী মনে করে তাদের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করেছিলেন, যদি এখনো তিনি তাদেরকে ক্ষমার অযোগ্য মনে করতেন, তা হলে তাকে সন্ধি ও সমঝোতার পথ পরিহার করে এক বিরাট জনগোষ্ঠীকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হতো, কার্যত যা ছিল একটি অসম্ভব ব্যাপার। কেননা এমন চেষ্টা করা হলে নিশ্চিত পূর্বাঞ্চলীয় সমস্ত অধিবাসী তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করত। অবশেষে যে গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচার আশায় হজরত হাসান রা. এর সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল, নতুন করে তার অগ্নিশিখা জ্বলে উঠত। ফলে উম্মাহ অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হতো।

এ কারণে, সাধারণ নিরাপত্তার গুরুত্ব এবং শরয়ি দলিলের উপর গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত আলি রা. এর গৃহীত সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে নিলেন। অর্থাৎ ইতিপূর্বে বিদ্রোহী যে-ই হোক, বাইয়াত হওয়ার পর সে নিরাপদ।

হজরত মুয়াবিয়া রা. আরো বুঝতে পেরেছিলেন যে, কিসাসের মাসআলা বিদ্রোহের মামলা থেকে ভিন্ন। কিসাসের অপরাধে কেবল ওইসব লোকই শাস্তির উপযুক্ত, যাদের ব্যাপারে সরাসরি প্রাণনাশি আঘাত হানার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

এই কর্মকৌশল গ্রহণ করার পর, হজরত মুয়াবিয়া রা. কে নিজস্ব লোকদের সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছিল। কেননা তখন পর্যন্ত উসমান রা. এর পক্ষে আন্দোলনকারীরা হজরত উসমান রা. এর কিসাস গ্রহণের জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল। আন্দোলনের পূর্ববর্তী ঘোষণা অনুযায়ী তারা হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে হত্যা করা ওয়াজিব মনে করতেন। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. কোনো কোনো প্রবীণ ব্যক্তিত্বের উত্তেজনাপূর্ণ কথার পরোয়া করেননি।

শাসনভার গ্রহণ করার পর হজরত মুয়াবিয়া রা. প্রথমবার যখন মদিনায় গেলেন, তখন হজরত উসমান রা. এর বাড়ির গলিপথ ধরে যাওয়ার সময় হজরত উসমান রা. এর ঘর থেক আওয়াজ শুনতে পেলেন,

يا أمير المؤمنيناه! ... يا أمير المؤمنيناه!

হজরত মুয়াবিয়া জানতে চাইলেন, এটা কার আওয়াজ?

লোকেরা বলল, হজরত উসমান রা. এর কন্যা। হজরত মুয়াবিয়া রা. এর আগমনের খবর পেয়ে তিনি তার পিতার হত্যা এবং কিসাস আন্দোলনের হৃদয়বিদারক সব ঘটনা স্মরণ করে ক্রন্দন করছেন।

হজরত মুয়াবিয়া রা. সেখানে গিয়ে তাকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে আমার ভাতিজি, লোকেরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার আনুগত্য স্বীকার করেছে। তাই আমিও ক্রোধ থাকাসত্ত্বেও তাদের প্রতি সহনশীল হয়েছিল। এখন যদি আমি সহনশীলতা ছেড়ে দিই, তা হলে তারাও আমার আনুগত্য ছেড়ে দেবে। দেখো, আমিরুল মুমিনিনের কন্যা হয়ে থাকা তোমার জন্য একজন সাধারণ মানুষ হয়ে যাওয়ার চেয়ে বহুগুণে উত্তম। সুতরাং আজকের পর থেকে আর কোনোদিন যেন আমি তোমাকে হজরত উসমান রা. এর কথা স্মরণ করে কাঁদতে না শুনি।[২৭৮]

হজরত মুয়াবিয়ার কথার উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের শাসনক্ষমতার অধীনে তুমি তো বনু উমাইয়ার শাহজাদি হয়ে আছ। কিন্তু আমাদের কঠোরতার কারণে যদি শাসনক্ষমতাই হাতছাড়া হয়ে যায়, তা হলে তোমার অবস্থান কোথায় চলে যাবে, ভেবে দেখ।

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. বিভিন্ন সময় কিসাসের দাবিতে মরিয়া লোকদের বুঝাতে থাকেন। যে যেভাবে এ দাবি তুলত, তাকে সেভাবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করতেন। যথাসাধ্য শরিয়তের সীমার বাইরে কদম রাখতেন না।

২৭৮

روى عنه انه لما قدم المدينة حاجا، فسمع الصوت من دار عثمان: يا امير المؤمنيناه! يا امير المؤمنيناه! فقال: ما هذا؟

قالوا: بنت عثمان تندب عثمان، فصرف الناس،

ثم ذهب اليها. فقال: يا ابنة عم! ان الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره، وبذلنا لهم حلما على غيظ. فان رددنا حلمنا ردوا طاعتهم. ولان تكونى بنت امير المؤمنين خير من ان تكونى واحدة من الناس. فلا اسمعك بعد اليوم ذكرت عثمان. (رواه ابن تيمية فى منهاج السنة: ٤٠٨/٤)

২. আরব নেতৃত্বকে নতুন আঙ্গিকে বিন্যাস

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর এক বিরাট অবদান এই ছিল যে, তিনি তার যুগে আরবজাতিকে ইসলামের রক্ষাকারী জাতি হিসেবে নতুন করে বিন্যস্ত করেন। তিনি অনারবদের দিকে ঝুঁকে পড়ার কোনো কারণ রাখেননি। বরং আরবদেরকেই নেতৃত্ব ও শাসনের দায়িত্ব প্রদান করেন।

হজরত মুয়াবিয়া এবং হজরত আলির ব্যবস্থাপনাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য

হজরত মুয়াবিয়া রা. এবং হজরত আলি রা. এর ব্যবস্থাপনাগত চিন্তাধারার একটি স্পষ্ট পার্থক্য এই ছিল যে, হজরত আলি রা. ইসলামকে একটি বৈশ্বিক জীবনবিধানরূপে সম্মুখে অগ্রসর করে নতুন বিজিত জাতিগুলোর জন্য শাসন ও নেতৃত্বের দরজা খুলে দিতে চেয়েছিলেন, যাতে ইসলামের গায়ে কেবল আরবজাতির ছাপ না পড়ে। বরং ইসলাম একটি বৈশ্বিক ধর্মরূপে পরিচিতি লাভ করে।

ইসলামের এ বিশ্বব্যাপী পরিচিতিকে সামনে রেখে হজরত আলি রা. আরবজাতির কেন্দ্রভূমি হিজাজ ছেড়ে কুফায় বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। কুফার অবস্থান ছিল অনারব ভূমিতে। যদিও আরব উপদ্বীপ থেকে এর দূরত্ব খুব বেশি ছিল না।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হজরত আলি রা. এর এ উদ্দেশ্য অত্যন্ত উঁচু ও উন্নত ছিল এবং ইসলামের মূলবাণীর খুব নিকটবর্তী ছিল। কেননা ইসলামে কোনো অনারবের উপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা ছিল না।

কিন্তু ভাগ্যের কী আশ্চর্য লিখন! হজরত আলি যাদের থেকে এ কাজ নিতে চেয়েছিলেন, তারা আন্তর্জাতিক পর্যায় তো দূরের কথা, স্থানীয় বিচারও পরিচালনার উপযুক্ত ছিল না। বরং তাদের মধ্যে বিভেদ ও মতপার্থক্যের জীবাণু খুব মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এসব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ব্যবস্থাপনাগত কর্মকৌশল এই ছিল আরবজাতিকেই এ বিশ্বব্যাপী দীনের ধারক-বাহক ও সংরক্ষকরূপে পরিচিত করানো। তিনি মনে করতেন, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলামের বিজয়ের জন্য আবশ্যক হচ্ছে ইসলামের ধারক ও বাহকদের অত্যন্ত সুসংগঠিত, কর্মতৎপর ও দক্ষ হওয়া। আর এসব গুণ আরবদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি ছিল। তা ছাড়া তৎকালীন সময়ে উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, অর্থাৎ সাহাবি ও তাবেয়িদের সিংহভাগ ছিলেন আরবের। তাদেরকে একতাবদ্ধ রাখা ছিল সকল সফলতার মূল চাবিকাঠি।

এর অর্থ এই নয় যে, তাদের যুগে নতুন মুসলমানদের অধিকার খর্ব করা হতো এবং তাদেরকে দখলদারত্বের টার্গেটে পরিণত করা হতো। কখনোই তা নয়। বরং নতুন মুসলমান তো পরের কথা, অমুসলিম, অর্থাৎ জিম্মিরাও ইসলামের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সমস্ত অধিকার ভোগ করছিল। যোগ্যতা হিসেবে তাদের জন্য জীবিকা উপার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকুরির দরজাও খোলা ছিল, যার ধারণা পাওয়া যায় হজরত মুয়াবিয়া রা. এর লেখকের দিকে লক্ষ করলে। কেননা তার লেখক (সেক্রেটারি) ছিল 'স্যারজুন' নামের এক খ্রিষ্টান।[২৭৯]

তবে সাধারণ কর্মপন্থা এই ছিল যে, রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে আরবদের উপরই নির্ভর করা হবে।

বর্তমান আরব জাতীয়তাবাদের সাথে আরব নেতৃত্বের ব্যবস্থাপনাগত পার্থক্য

আরবজাতির উপর হজরত মুয়াবিয়া রা. এর নির্ভরশীলতা এবং তার নতুন বিন্যাস ছিল মূলত একটি রাজনৈতিক কৌশল। এটি আরব জাতীয়তাবাদ বা আরব ন্যাশনালিজমের বর্তমান দর্শন ছিল না, যাতে ধর্মকে পেছনে নিক্ষেপ করে শুধু আরব হওয়াটাকেই গর্বের বিষয় বলে মনে করা হয়। হজরত মুয়াবিয়া রা. ইসলামি সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখা এবং দীনকে উন্মুক্ত করার লক্ষ্যেই আরবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও

---

[২৭৯] তারিখুত তাবারি : ৫/ ৩৪৮

সুবিন্যস্ত করতে চাচ্ছিলেন। আরবের সরদারদেরকে তিনি বারবার এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতেন আর বলতেন, 'হে আরবজাতি, আল্লাহর কসম, যে স্পষ্ট ধর্ম নিয়ে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হয়েছে, তোমরা যদি তাকে আঁকড়ে না ধরো, তা হলে অন্যদের থেকে কী করে আশা করা যায় যে, তারা এ দীন সংরক্ষণ করবে?'২৮০

বনু উমাইয়া গোত্রের ঠিকাদারি : এক অবশ্যম্ভাবী প্রেক্ষাপট

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর যুগে আরব-নেতৃত্ব সুবিন্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে বনু উমাইয়া গোত্রও আগের চেয়ে বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়ে সকলের সামনে এলো। তবে এটি কোনো আশ্চর্য ব্যাপার ছিল না। কেননা হজরত মুয়াবিয়া রা. আরবদের একতাকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান ও বিজয়যাত্রার প্রয়োজনে ব্যবহার করছিলেন। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সামরিক নেতৃত্বে বনু উমাইয়া সব সময়ই অগ্রসর ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে বিভিন্ন গাজওয়াতে এবং পরবর্তী বহু যুদ্ধে তারা নিজেদেরকে তরবারির বলে বলীয়ান প্রমাণ করেছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. নিজে এবং তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিও ছিলেন উমাইয়া গোত্রের সন্তান। এহেন পরিস্থিতিতে বনু উমাইয়া গোত্রের প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে প্রবল হয়ে যাওয়া ছিল একটি নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার।

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর এ রাজনৈতিক কৌশলটি এত বেশি কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়েছিল যে, দীর্ঘ ষাট-সত্তর বছর পর্যন্ত বনু উমাইয়া অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে একে ধরে রেখেছিল।

তবে কালের আবর্তনে এক সময় এ কৌশল অকার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে বিরোধী শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পায়। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তদানীন্তন সময়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কৌশল যথোপযুক্তই ছিল। কেননা সে যুগের অবিস্মরণীয় বিজয়গুলো এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে।

---

২৮০ মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৯৭৯

৩. মুসলিমবিশ্বের সুরক্ষা ও নতুন বিজয়াভিযান

হজরত মুয়াবিয়া রা. র একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল মুসলিমবিশ্বের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিজয়াভিযানের সেই ধারাবাহিকতা আবার এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, যা গৃহযুদ্ধের কারণে কয়েক বছর যাবৎ থেমে ছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. এর খেলাফতকালে জিহাদের ধারাবাহিকতা আবার পূর্ণ শৌর্য-বীর্যের সাথে শুরু হয়। তিনি নিজেও ছিলেন একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা ও সমরবিদ। হজরত উসমান রা. এর যুগে লাগাতারভাবে তিনি রোমানদের পরাজিত করেছিলেন। তারই নিখুঁত পরিকল্পনা ও উন্নত মনোবলের বদৌলতে ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নৌ-অভিযানের সূচনা হয়েছিল। হজরত উসমান রা. এর শাসনামলে তিনি কুবরুস ও মাল্টার মতো গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দ্বীপ রোমানদের দখল থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন।[২৮১]

হজরত মুয়াবিয়া রা. যখন শাসনক্ষমতা লাভ করেন, তখন মুসলিমরা যেসব বহিঃশক্তির প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিল, তা ছিল তিনটি। যথা :

১. সেইসব পৌত্তলিক জাতি, যারা মধ্যএশিয়া থেকে খোরাসান ও হিন্দুস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দুশমনরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বে বিভক্ত ছিল। এদের থেকে কিছু কিছু গোত্র বারবার পরাজিত হতো। কিন্তু সুযোগ পেলেই তারা বিদ্রোহ করে বসত। হজরত মুয়াবিয়া ক্ষমতা গ্রহণের সময়ও তারা হামলার জন্য ওত পেতে ছিল।

২. আফ্রিকার অনুন্নত গোত্রসমূহ, যাদের শক্তি উত্তর আফ্রিকায় বেশি ছিল। এরাও বারবার বিদ্রোহ করত।

৩. রোমান সাম্রাজ্য, যাকে বশ করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. সাময়িক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে রোমানদের

---

[২৮১] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ১৫৪,

সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি করে নেন, যাতে আগে একনিষ্ঠতার সাথে অন্যান্য ঝামেলা শেষ করে নেওয়া যায়।[২৮২]

তিনি হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে মিসরের এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. কে বসরার শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। এরা দুজন ছিলেন সর্বস্বীকৃত সিপাহসালার এবং রাজনীতিবিদ।[২৮৩]

এই দু' ব্যক্তিত্ব উন্নত কর্মপরিকল্পনার সাহায্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ইসলামি সৈন্যবাহিনীকে অগ্রসর করেন। যার ফলে খোরাসান এবং আফ্রিকা থেকে সন্ত্রাসীদের মূলোৎপাটন হয় এবং সেখানে ইসলামি বাহিনীর ভীত মজবুত হয়। হিন্দুস্থানের সীমান্ত এলাকা, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানেও কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং তাতে বিজয় অর্জিত হয়।

সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এসব অঞ্চলের বিজয়সমূহের পৃথক পৃথক বিবরণ পেশ করছি।

---

[২৮২] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৫

[২৮৩] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৪, ৪১ হিজরি।

ভারত উপমহাদেশে জিহাদ অভিযান

সাধারণত বলা হয়, ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল ৯২ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে। কিন্তু সঠিক কথা হলো, হজরত উমর রা. এর যুগে মুসলমানরা ভারতের সিন্ধুপ্রদেশের দেবলবন্দরে ঝটিকা হামলা চালিয়েছিল। হজরত আলি রা. এর যুগে এ অভিযান কিকান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।[২৮৪]

উপমহাদেশে সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা এজন্য দেখা দিয়েছিল যে, এখানকার যুদ্ধবাজ জাতিগুলো অতর্কিত হামলা চালিয়ে মুসলিম আমির ও সৈন্যদের শহিদ করে দিচ্ছিল। হজরত আলি রা. এর পক্ষ থেকে এ অভিযানের জন্য নিযুক্ত কমান্ডার হজরত হারেস বিন মুররা রহ. কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. এর খেলাফতের দ্বিতীয় বছর ৪২ হিজরিতে এ অভিযানেই তাকে তার অধিকাংশ সঙ্গী সহকারে শহিদ করে দেওয়া হয়।[২৮৫]

তারপরে বসরার গভর্নর হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন রাশেদ বিন আমর জাদিদির হাতে। তিনি ৪২ হিজরিতে সৈন্যবাহিনী নিয়ে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেন এবং মাকরানের উপর দিয়ে সিন্ধুপ্রদেশের বহুদূর পর্যন্ত শত্রুবাহিনীকে ধাওয়া করে যান।[২৮৬]

বানু ও লাহোরের অভিযান

৪৪ হিজরিতে উমাইয়া বংশের নামকরা সিপাহসালার হজরত মুহাল্লাব বিন আবু সুফরা রহ. অপর দিক থেকে অগ্রসর হন এবং বান্না (বানু) বিজয় করেন।[২৮৭] এ অভিযানে মুহাল্লাব বিন আবু সুফরা এক জায়গায়

---

[২৮৪] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৪১৬, মু'জামুল বুলদান : ৪/৪২৩, 'কিকান' দ্বারা উদ্দেশ্য, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের মধ্যবর্তী ক্ষীরথারের পার্বত্য অঞ্চল।

[২৮৫] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৪১৭,

[২৮৬] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৪১৮, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৪, ২০৫

[২৮৭] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৬

একাকী ছিলেন। তখন শত্রুদের আঠারোজন অশ্বারোহী হঠাৎ চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলে। তারা তাকে শহিদ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু হজরত মুহাল্লাব একাই সবাইকে ধরাশায়ী করেন।[২৮৮] তারপর তিনি শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে আলাহোর (লাহোর) এর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় এবং তাতে হিন্দুদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। হজরত মুহাল্লাব রহ. শহর দখল না করেই প্রচুর গনিমতের মাল নিয়ে ফিরে যান।[২৮৯]

কিকান (ক্ষীরথার পর্বত) এর দ্বিতীয় অভিযান

হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার রহ. কে কিকানের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ও প্রসিদ্ধ আমির। তিনি যখন বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন, তখন ঘোষণা করে দেন, কোনো তাঁবুতে যেন আগুন জ্বালানো না হয়। সবার খাবারের দায়িত্ব আমার।

এক রাতে তিনি একটি তাঁবুর পাশে আগুন জ্বলতে দেখেন। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন, এক নারী মা হয়েছেন। তাই তার জন্য মিষ্টান্ন রান্না করা হচ্ছে। একথা শুনে তিনি বলেন, আগামী তিনদিন পর্যন্ত আমার পক্ষ থেকে সবাইকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হবে'। [২৯০]

---

[২৮৮] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৪১৭

[২৮৯] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৬

অধিকাংশ ঐতিহাসিক মুহাল্লাব বিন আবি সুফরা রহ. এর এ অভিযান অগ্রাহ্য করেছেন। আবার অনেকেই লাহোরকে 'আহওয়ায' মনে করেছেন। এ ভুল এতটাই পোক্ত হয়ে গেছে যে, পরবর্তী যুগের ইতিহাসগুলো হজরত মুয়াবিয়া রা. এর অবদানের তালিকায় লাহোরের অভিযানের কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। অথচ প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে এর আলোচনা রয়েছে। 'মু'জামুল বুলদান' এর ভাষ্য এই:

غزا المهلب بن ابى صفرة فى سنة ٤٤ هـ ايام معاوية ثغر السند فاتى بنة ولاهو وهما بين كابل وملتان. (١/٥٠١ باب الباء والنون)

[২৯০] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৪১৭.

সে যুগে স্ত্রীদেরকে জিহাদে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম ব্যাপক ছিল। নারীরা তাঁবুর মধ্যে থাকতেন এবং স্বামী, ভাই ও পুত্রদের খেদমত করতেন। যাতে তারাও জিহাদের সাওয়াবের অংশ লাভ করেন।

কিকানের পার্বত্য অঞ্চল ছিল অত্যন্ত দুর্গম রণাঙ্গন। কিন্তু তা সত্ত্বেও হজরত আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার রহ. সেখনে সফল জিহাদ পরিচালনা করেন। প্রচুর সংখ্যক কিকানি ঘোড়া হজরত মুয়াবিয়া রা. এর খেদমতে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করেন। কিন্তু এখানেই একদিন সুযোগ পেয়ে গ্রাম্য দস্যুরা তার সকল সাথি সহকারে তাকে শহিদ করে দেয়।[২৯১]

তারপর হজরত মুয়াবিয়া রা. ৪৮ হিজরিতে হজরত সিনান বিন সালামা রহ. কে বেলুচিস্তানের অভিযানের সিপাহসালার বানিয়ে পাঠান। তিনি অভিযানেই ব্যস্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধ সিপাহসালার রাশেদ বিন আমর জাদিদি রহ. ৫০ হিজরিতে সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে জিহাদ পরিচালনার সময় শহিদ হয়ে যান।[২৯২] যার ফলে মাকরানসহ বিশেষ কিছু এলাকা আবার মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। উপমহাদেশের অভিযানে প্রেরিত প্রথম সিপাহসালার হারেস বিন মুররা ও চতুর্থ সিপাহসালার নিহত হওয়ার পর এবার দ্বিতীয় সিপাহসালার রাশেদ বিন আমরের শাহাদাত বড়ই দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হজরত সিনান বিন সালামা রহ. এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য বেলুচিস্তান এলে দুশমনরা বিরাট বাহিনী নিয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় এবং হুঙ্কার ছাড়ে। হজরত সিনান রহ. ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ। তিনি বাহিনীর মুজাহিদদের কসম দিয়ে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি লড়াই থেকে পলায়ন করবে, তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।[২৯৩]

শত্রুপক্ষের বিশাল বাহিনী দেখে তিনি তার সাথিদের হিম্মত বৃদ্ধির জন্য বলেছিলেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ করো, দুটির মধ্য থেকে যেকোনো এক সফলতা তোমাদের অর্জিত হবেই। হয়তো বিজয় নয়তো জান্নাত'। তারপর তিনি সাতটি পাথর উঠিয়ে মুজাহিদদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেন, 'যখন আমাকে আক্রমণ করতে দেখবে, তখন তোমরাও ঝাঁপিয়ে পড়বে'।

হজরত সিনান রহ. তার বাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। যখন সূর্য ঠিক মাথার উপর উঠে আসে, তখন আল্লাহু আকবার বলে পরপর ছয়টি পাথর

---

[২৯১] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৪১৭, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৮

[২৯২] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৯, ২১১

[২৯৩] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৪১৭

শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করেন। তারপর আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। যখন সূর্য সামান্য হেলতে শুরু করে, তখন সপ্তম পাথরটি নিক্ষেপ করে চিৎকার করে বলেন, حم لا ينصرون। তারপর আল্লাহু আকবার বলে পৌত্তলিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

মুজাহিদ বাহিনীও তাদের সেনাপতির পেছনে পেছনে শত্রুবাহিনীর উপর হামলা করতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই মুশরিকদের লাশের স্তূপ পড়ে যায়। যারা বেঁচে ছিল, পালিয়ে যায়। মুসলমানরা ১২ মাইল পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। অবশেষে পলায়নকারীরা একটি দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মুসলমানরা দুর্গটি ঘিরে ফেললে স্থানীয় লোকেরা ভেতর থেকে বলতে থাকে, 'আল্লাহর কসম, আমাদেরকে তো তোমরা মারোনি, বরং সাদাকালো ডোরাকাটা ঘোড়ায় আরোহিত সাদা পাগড়ি পরিহিত এক বাহিনী আমাদের মেরেছে'।

উত্তরে মুসলমানরা বললেন, 'তারা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সাহায্যকারী বাহিনী'।

এ ভয়াবহ যুদ্ধে মুসলমানদের কেবল একজন মুজাহিদ শহিদ হন। পরবর্তীতে জনৈক সৈনিক হজরত সিনান বিন সালামা রহ. কে জিজ্ঞেস করেন, দুশমনদের উপর আক্রমণ করতে এত বিলম্ব করলেন কেন?

তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করতেন'।[২৯৪]

হজরত সিনান বিন সালামা রহ. তরবারির শক্তিতে মাকরান পুনর্দখল করেন। তারপর গোটা বিজিত এলাকা নতুন করে আবাদ ও সুবিন্যস্ত করেন। দু'বছর পর্যন্ত তিনি এ অঞ্চলে ছিলেন এবং অত্যন্ত সুচারুরূপে শাসন পরিচালনা করেন।[২৯৫]

***

[২৯৪] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২১২, ২১৩

[২৯৫] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৪১৮,

খোরাসান অভিযান

বসরার প্রথম গভর্নর হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. এবং দ্বিতীয় গভর্নর হজরত জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান খোরাসান থেকে দাঙ্গাবাজদের উৎখাত এবং নতুন বিজয়ের দুয়ার খুলে রেখেছিলেন। বসরার হেডকোয়ার্টার থেকে উত্তর এবং মধ্য ও দক্ষিণ আফগানিস্তানের জন্য পৃথক পৃথক সেনাপতি নির্ধারণ করা হয়। উত্তর আফগানিস্তান অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয় হজরত কায়েস বিন হাইসাম এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন খাযেমের হাতে। হজরত কায়েস বলখের বিদ্রোহীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন এবং তাদের অগ্নিকুণ্ড ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেন। অন্যদিকে হজরত আবদুল্লাহ বিন খাযেম হেরাত ও বাদাগিসের দাঙ্গাবাজদের পরাভূত করেন।[২৯৬]

হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. র নেতৃত্বে কাবুলের জিহাদ

মধ্য ও দক্ষিণ আফগানিস্তানের জন্য প্রসিদ্ধ সাহাবি হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. কে নির্বাচন করা হয়। তিনি হজরত উসমান রা. এর যুগে এ অঞ্চলের বিজয়াভিযানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ওই সময় তিনি কাবুলকে একটি চুক্তির অধীনে বিজয় করেছিলেন। কিন্তু ততদিনে কাবুল থেকে নিয়ে কান্দাহার পর্যন্ত গোটা এলাকা আবার স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল।

হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. বাহিনী নিয়ে কাবুল পর্যন্ত এগিয়ে চলেন। এবার তার সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন সাহাবি, কয়েকজন বিখ্যাত তাবেয়ি এবং আরবের প্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ কিছু অশ্বারোহী। তদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. হজরত আমর বিন উবাইদুল্লাহ।

২. হজরত আবদুল্লাহ বিন খাযেম।

---

[২৯৬] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৩৯৬,

শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করেন। তারপর আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। যখন সূর্য সামান্য হেলতে শুরু করে, তখন সপ্তম পাথরটি নিক্ষেপ করে চিৎকার করে বলেন, حم لا ينصرون। তারপর আল্লাহু আকবার বলে পৌত্তলিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

মুজাহিদ বাহিনীও তাদের সেনাপতির পেছনে পেছনে শত্রুবাহিনীর উপর হামলা করতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই মুশরিকদের লাশের স্তূপ পড়ে যায়। যারা বেঁচে ছিল, পালিয়ে যায়। মুসলমানরা ১২ মাইল পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। অবশেষে পলায়নকারীরা একটি দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মুসলমানরা দুর্গটি ঘিরে ফেললে স্থানীয় লোকেরা ভেতর থেকে বলতে থাকে, 'আল্লাহর কসম, আমাদেরকে তো তোমরা মারোনি, বরং সাদাকালো ডোরাকাটা ঘোড়ায় আরোহিত সাদা পাগড়ি পরিহিত এক বাহিনী আমাদের মেরেছে'।

উত্তরে মুসলমানরা বললেন, 'তারা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সাহায্যকারী বাহিনী'।

এ ভয়াবহ যুদ্ধে মুসলমানদের কেবল একজন মুজাহিদ শহিদ হন। পরবর্তীতে জনৈক সৈনিক হজরত সিনান বিন সালামা রহ. কে জিজ্ঞেস করেন, দুশমনদের উপর আক্রমণ করতে এত বিলম্ব করলেন কেন?

তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করতেন'।[২৯৪]

হজরত সিনান বিন সালামা রহ. তরবারির শক্তিতে মাকরান পুনর্দখল করেন। তারপর গোটা বিজিত এলাকা নতুন করে আবাদ ও সুবিন্যস্ত করেন। দু'বছর পর্যন্ত তিনি এ অঞ্চলে ছিলেন এবং অত্যন্ত সুচারুরূপে শাসন পরিচালনা করেন।[২৯৫]

***

[২৯৪] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২১২, ২১৩

[২৯৫] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৪১৮,

খোরাসান অভিযান

বসরার প্রথম গভর্নর হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. এবং দ্বিতীয় গভর্নর হজরত জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান খোরাসান থেকে দাঙ্গাবাজদের উৎখাত এবং নতুন বিজয়ের দুয়ার খুলে রেখেছিলেন। বসরার হেডকোয়ার্টার থেকে উত্তর এবং মধ্য ও দক্ষিণ আফগানিস্তানের জন্য পৃথক পৃথক সেনাপতি নির্ধারণ করা হয়। উত্তর আফগানিস্তান অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয় হজরত কায়েস বিন হাইসাম এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন খাযেমের হাতে। হজরত কায়েস বলখের বিদ্রোহীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন এবং তাদের অগ্নিকুণ্ড ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেন। অন্যদিকে হজরত আবদুল্লাহ বিন খাযেম হেরাত ও বাদাগিসের দাঙ্গাবাজদের পরাভূত করেন।[২৯৬]

হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. র নেতৃত্বে কাবুলের জিহাদ

মধ্য ও দক্ষিণ আফগানিস্তানের জন্য প্রসিদ্ধ সাহাবি হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. কে নির্বাচন করা হয়। তিনি হজরত উসমান রা. এর যুগে এ অঞ্চলের বিজয়াভিযানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ওই সময় তিনি কাবুলকে একটি চুক্তির অধীনে বিজয় করেছিলেন। কিন্তু ততদিনে কাবুল থেকে নিয়ে কান্দাহার পর্যন্ত গোটা এলাকা আবার স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল।

হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. বাহিনী নিয়ে কাবুল পর্যন্ত এগিয়ে চলেন। এবার তার সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন সাহাবি, কয়েকজন বিখ্যাত তাবেয়ি এবং আরবের প্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ কিছু অশ্বারোহী। তদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. হজরত আমর বিন উবাইদুল্লাহ।

২. হজরত আবদুল্লাহ বিন খাযেম।

---

[২৯৬] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৩৯৬,

৩. হজরত মুহাল্লাব বিন আবু সুফরা।

৪. হজরত আব্বাদ বিন হুসাইন।

৫. হজরত হিশাম বিন আমের।

৬. হজরত হাসান বসরি।

৭. হজরত সিলাহ বিন আশইয়াম।

৮. হজরত যায়েদ আল আবদি।

৯. হজরত কাতারি বিন ফুজাআ। রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।[২৯৭]

হজরত সিলাহ বিন আশইয়াম রহ. এর আত্মত্যাগ

হজরত সিলাহ বিন আশইয়াম রহ. ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগুজার। কাবুল অভিযানে তারই এক সহযাত্রী যায়েদ আল আবদি রহ. বলেন, 'এক রাতে আমাদের সৈন্যরা ছাউনি ফেলল। এশার নামাজ আদায় করে সকলেই শুয়ে পড়ল। আমি ভাবলাম, আজ রাতে দেখব সিলাহ বিন আশইয়াম কীভাবে ইবাদত করেন।

তারপর আমি দেখলাম, হজরত সিলাহও অন্যান্য মুজাহিদের সাথে শুয়ে পড়েন। সবাই যখন নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়ল, তখন তিনি উঠে সোজা জঙ্গলের দিকে চলে যান। আমিও তার পিছু নিলাম। দেখলাম, তিনি অজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি নামাজ পড়ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে এবং তার একেবারে কাছে পৌঁছে যায়। আমি ঘাবড়ে গিয়ে দৌড়ে একটা গাছে উঠে গেলাম। কিন্তু হজরত সিলাহ নিশ্চিন্ত মনে নামাজ পড়েই যাচ্ছিলেন। আমি ভাবতে লাগলাম, বাঘটা মনে হয় এখনো সিলাহকে দেখেনি। অথবা দেখলেও হয়তো গাছ ভেবেছে। এমন সময় হজরত সিলাহ সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আমি ভাবলাম, এখন তো নিশ্চয় বাঘটি তাকে চিড়ে-ফেড়ে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু কিছুই হলো না।

একটু পর হজরত সিলাহ সালাম ফেরালেন এবং বাঘটির দিকে তাকিয়ে বললেন, হে হিংস্র, অন্য কোথাও গিয়ে তোমার রিজিক তালাশ করে নাও।

---

[২৯৭] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৩৮৪,

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, একথা শুনতেই বাঘটা এত ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে পালাতে লাগল, মনে হলো, পাহাড়ের পত্রপল্লব সব উড়ে যাবে।

হজরত সিলাহ আবার নামাজে দাঁড়িয়ে যান এবং ভোরের আভা ফুটে ওঠা পর্যন্ত নামাজ আদায় করতে থাকেন। তারপর তিনি আল্লাহর গুণ-কীর্তন করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দোয়া করেন। শেষে বলেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে শুধু এইটুকু চাই যে, আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন।

তারপর হজরত সিলাহ রহ. ছাউনিতে ফিরে আসেন। সকালে আমি তাকে এমন হাস্যোজ্জ্বল দেখতে পেলাম, মনে হলো সারারাত তিনি নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়েছেন। অথচ তার পেছনে রাত জেগে আমার যে কী অবস্থা হয়েছিল, তা আল্লাহই ভালো জানেন।[২৯৮]

এভাবে আল্লাহওয়ালাদের এ বাহিনী কাবুলের দিকে এগিয়ে চলতে থাকে। রণাঙ্গন যখন কাছে চলে আসে, (এবং পাহাড়ি ঘাঁটি শুরু হয়) তখন বাহিনীর আমির বললেন, 'বাহিনীর কেউ যেন এদিক-ওদিক হারিয়ে না যেতে পারে'।

এবার বাহিনী রওনা হতে লাগল। এদিকে হজরত সিলাহ রহ. এর খচ্চর তার সামানাপত্র নিয়ে কোথাও পালিয়ে গেছে। তাই তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে নামাজের নিয়ত বাঁধতে লাগলেন। লোকেরা বলল, জনাব, বাহিনী তো রওনা হয়ে গেছে।

তিনি কয়েক কদম হেঁটে আবার থেমে গিয়ে বললেন, আমাকে দুটি রাকাত আদায় করতে দাও।

সাথিরা বলল, বাহিনী তো চলে যাচ্ছে।

তিনি বললেন, আমার বাহন ও পাথেয় হালকা আছে (সহজেই বাহিনীর সাথে মিলতে পারব)। তারপর তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করে এভাবে দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ, তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, আমার বাহন ও পাথেয় ফিরিয়ে দাও'।

এর কিছুক্ষণ পরই তার খচ্চর পাথেয় নিয়ে তার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।[২৯৯]

---

[২৯৮] শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকি, হাদিস : ২৯৪১, আয যুহদ ওয়াররিকাক লি আবদুল্লাহ ইবনিল মুবারাক, হাদিস : ৮৬৩,

[২৯৯] প্রাগুক্ত।

দুজন আরবমুজাহিদ শত্রুদের মুখ ফিরিয়ে দেয়

এ সফরে এক জায়গায় গ্রাম্য দস্যুদের সাথে ভীষণ লড়াই হয়। হজরত সিলাহ বিন আশইয়াম রহ. এবং অপর এক তাবেয়ি এবং হজরত আবু হুরাইরা রা. এর শাগরিদ হজরত হিশাম বিন আমের রহ. সেদিন একাকী লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তরবারি চালান এবং বর্শা নিক্ষেপের নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। এভাবে তারা দুজনেই দুশমনের গতিরোধ করে দেন। আর এর ফলে কাফেরদের মধ্যে এমন ভীতির সঞ্চার হয় যে, তারা বলতে থাকে, মাত্র দুজন আরব সৈনিক আমাদের এ করুণ দশা করেছে, যদি তারা সবাই আমাদের উপর আক্রমণ করত, তা হলে কী অবস্থা হতো! তাই তারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নেয়।

এক ব্যক্তি হজরত আবু হুরাইরা রা.-কে এ সংবাদ দিয়ে তার শাগরিদের নামে অভিযোগ করে বলেন, সেদিন হিশাম নিজেকে ধ্বংস করার পথে কোনো ক্রটিই বাকি রাখেনি।

হজরত আবু হুরাইরা রা. বললেন, কখনোই নয়। সে তো শুধু এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল হতে চাচ্ছিল-

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ۔[৩০০]

> আর কিছু মানুষ নিজের জীবনকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়।[৩০১]

সুবহানাল্লাহ, এই ছিল সাহাবি ও তাবেয়িদের জিহাদের জজবা।

কাবুল উপত্যকায়

এমন আরো বহু ঈমানজাগানিয়া ঘটনার সৃষ্টি করে হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. এর নেতৃত্বে এই মোবারক বাহিনী কাবুল এসে পৌছে। কাবুল ছিল প্রকৃতিগতভাবেই এক পাহাড়-বেষ্টিত সুরক্ষিত শহর। তাই কাবুলের লোকেরা কাবুলের জন্য শুধু লড়াই নয়; জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিল। ফলে শহরটি জয় করা ছিল ভীষণ কঠিন ব্যাপার।

---

[৩০০] সুরা বাকারা, আয়াত ২০৭

[৩০১] শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকি, বর্ণনা নম্বর : ২৯৪১,

الزهد والرقاق، عبد الله بن المبارك، والزهد، نعيم بن حماد، رقم الرواية: ٨٦٣

হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. অত্যন্ত কঠোরভাবে কাবুল অবরোধ করলেন, যা কয়েক মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হলো। অবশেষে তীব্র শীত ও বরফ বর্ষণের মৌসুমও চলে এল, যা আরবদের জন্য ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। তবু মুসলমানরা অটল হয়ে থাকল। একদিকে শীত, অন্যদিকে বরফবৃষ্টি... তাও আবার কাবুলে... আল্লাহু আকবার!!

পুরো শীতের মৌসুমটা এভাবে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কাটল। অবরোধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকল। বসন্ত ও গ্রীষ্ম কেটে গিয়ে আবার শীতের সময় ঘনিয়ে এলো। এদিকে মুসলমানরা তখনো নামাজ কসরই আদায় করছিল। কেননা এখানে স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছা তাদের ছিল না।[৩০২]

রণাঙ্গনে হাদিস ও ফিকহের তালিম

উক্ত অবরোধ চলাকালে হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. হাদিস ও ফিকহের তালিমও অব্যাহত রেখেছিলেন। এ অভিযানে তার সঙ্গে ছিলেন হজরত হাসান বসরি, হজরত ইবনে হাবিব এবং হজরত ইবনে উবায়দের মতো বিশিষ্ট তাবেয়ি। এরা ছিলেন তার শাগরিদের মতো। আর এরা সকলে একইসাথে আলেম যেমন ছিলেন, তেমনি মুজাহিদও ছিলেন। হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে 'সালাতুল খাওফ' আদায়ের বাস্তব প্রশিক্ষণ দান করেন।[৩০৩]

অন্যদিকে হাদিসের দরসে হজরত আবদুর রহমান এ অভিযানে একটি হাদিস শুনিয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। হাদিসটি এই- দায়িত্ব চেয়ো না। কেননা যদি চাওয়ার কারণে তোমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তা হলে সেটা তোমার জন্য বিপদ হয়ে যাবে। আর যদি চাওয়া ছাড়া তোমাকে দেওয়া হয়, তা হলে এ বিষয়ে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তোমাকে সাহায্য করা হবে।[৩০৪]

---

[৩০২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৫০৯৯, ৮২০৩, আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, হাদিস : ৫৬৩৯, ৫৪৭৮

[৩০৩] আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, হাদিস : ৬০০৭, ৬০৪৫

[৩০৪] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২০৬৩৯

বসন্তকাল এলে কাবুলের আশপাশের এলাকা ফলফলাদিতে ভরে ওঠে। মুজাহিদদের প্রয়োজন অনুযায়ী সে ফল খাওয়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া কিংবা ফলদার ডালা-পালার ক্ষতি সাধন করা কঠোরভাবে নিষেধ ছিল।[৩০৫]

ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার

যখন কোনোভাবেই কাবুল পদানত করা যাচ্ছিল না, তখন হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে শহরের প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাধারণত মুসলমানরা দুর্গ চূর্ণকারী অস্ত্র বা উপায় গ্রহণ করতে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কেননা এতে সাধারণ লোকদের আঘাতের শিকার হওয়ার আশংকা থাকে। কিন্তু আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের যুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। তাই এর বৈধতা প্রমাণিত ছিল।

যাই হোক, কাবুলের যুদ্ধে মিনজানিকের ব্যবহার ফলপ্রসূ প্রমাণিত হলো। ভারী পাথরের গোলাবর্ষণে কাবুলের দুর্জয় প্রাচীরে এক বিরাট ভাঙ্গন সৃষ্টি হলো। কাবুলের দস্যুরা রাতের আঁধারে সে ভাঙ্গন ভরাট করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু মুসলিম বীর সেনানিদের অধিনায়ক হজরত আব্বাদ বিন হুসাইন রহ. সারারাত জেগে অবিরাম তির নিক্ষেপ করে তাদেরকে সেই ভাঙ্গন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। হজরত হাসান বসরি রহ. তার দুঃসাহসিকতা দেখে বলতেন, 'আব্বাদ বিন হুসাইনকে দেখার আগ পর্যন্ত আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, একজন মানুষ এক হাজার মানুষের সমান হতে পারে।'[৩০৬]

চূড়ান্ত লড়াই

ভোরে শহরের ফটক খুলে দেওয়া হলো। পরাজয় নিশ্চিত জেনে কাবুলের পৌত্তলিক জাতি বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো দুর্গের বাইরে আছড়ে পড়তে

---

[৩০৫] আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, হাদিস : ১৮০০৮

[৩০৬] মাকারিমুল আখলাক লি ইবনি আবিদ দুনয়াঃ ১/৬৫, ৮৪, ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৩৮৪,

লাগল। তাদের সঙ্গে একটি ভয়ানক যুদ্ধবাজ হাতিও ছিল। যে-ই তার সম্মুখে আসতে চাইত, হাতিটি তাকে পিষে ফেলার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠত। হজরত আবদুল্লাহ বিন খাযেম এই দৃশ্য দেখে বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হাতিটি কেবল ফটক থেকে সামান্য অগ্রসর হয়েছিল। তিনি সেখানেই তাকে আঘাত করে ফেলে দিলেন। হাতিটি আহত হয়ে দুর্গের একটি কপাটের সাথে এমনভাবে ঘেঁষে পড়ল যে, পৌত্তলিকরা ফটক বন্ধ করতে পারল না। মুসলমানরা তাদেরকে ধাওয়া করে করে শহরের মধ্যে ঠেলে নিয়ে গেল। আর এভাবেই কাবুলের মতো একটি অজেয় ও সুরক্ষিত শহর অস্ত্রের বলে বিজিত হলো। ইতিহাসে এমন নজির দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. দুজনকে দামেশকে পাঠিয়ে দিলেন। তারা ছিলেন হজরত উমর বিন উবাইদুল্লাহ এবং হজরত মুহাল্লাব বিন আবু সুফরা রা.।[৩০৭]

মুজাহিদদের বিশ্বস্ততা

কাবুল বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের হাতে প্রচুর গনিমতের সম্পদ জমা হয়। হরেক রকম মালের স্তূপ হয়ে যায়। কেউ কেউ সেখান থেকে নিজের ইচ্ছামতো কাড়াকাড়ি করে নিতে শুরু করে। হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যক্তিকে বলেন, 'ঘোষণা করে দাও, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস রয়েছে, যে ব্যক্তি লুটপাট করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। সুতরাং যে যা ছিনিয়ে নিয়েছ, ফিরিয়ে দাও'।

এ ঘোষণা শোনামাত্র মুসলমানরা সব ফিরিয়ে দেয়। তারপর আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. নিয়ম অনুযায়ী সকলের মধ্যে গনিমত বণ্টন করে দেন।[৩০৮]

আসলে সে যুগের অধিকাংশ মুসলমান এতটাই খাঁটি হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন যে, আল্লাহর নবীর বাণীর সম্মুখে মাথা নত করতে তারা

---

[৩০৭] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৩৮৪,

[৩০৮] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২০৬১৯

সামান্যও বিলম্ব করতেন না। আর এটিই ছিল তাদের যাবতীয় সফলতার মূল রহস্য।

কাবুলের কয়েদি শিশু হলো উম্মাহর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস

উক্ত অভিযানে যারা বন্দি হতো এবং গোলাম হতো, তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা হতো। এদের শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হতো। কাবুল বিজয়ের সময় যেসব গোলাম মুসলমানদের হাতে এসেছিল, তাদের মধ্যে কিছু বালক ছিল অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান, যারা পরবর্তীতে উম্মাহর বিশিষ্ট আলেমকুলের সান্নিধ্যে এসে একেকজন বড় বড় মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও শায়েখে পরিণত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন :

১. হজরত ইবনে উমর রা. র গোলাম হজরত নাফে রহ.।
২. হজরত সালেম বিন আজলান রহ.।
৩. হজরত আবু আইয়ুব সাখতিয়ানি রহ.।
৪. হজরত আবু হুমাইদ আত তাউইল মিহরান রহ.।[৩০৯]

হজরত মাকহুল রহ.-ও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার পূর্বপুরুষরা ছিল সিন্ধুপ্রদেশের অধিবাসী। কিন্তু পরে তিনি যখন শামে স্থানান্তরিত হন, তখন 'মাকহুল শামি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং বড়মাপের মুহাদ্দিস হন।[৩১০]

কান্দাহার বিজয়

কাবুল বিজয়ের পর হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. সিজিস্তানের (দক্ষিণ আফগানিস্তান) দিকে অগ্রসর হন। বিভিন্ন শহর, দুর্গ ও গোত্র জয় করে করে তিনি কান্দাহার ও বুসত পর্যন্ত পৌঁছে যান। এ অভিযানেই তিনি গজনির পার্শ্ববর্তী যাবুল বিজয় করেন।[৩১১]

---

[৩০৯] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৬, ৪২ হিজরি।
[৩১০] সুবুলুস সালাম: ৬/১৬৭,
[৩১০] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৬,
[৩১১] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৩৮৪,

হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. এর মৃত্যু

এরপর ৪৬ হিজরিতে হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. খোরাসান থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। তাকে বসরায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। ফেরার সময় তিনি কাবুলের বহু গোলামকে সঙ্গে নিয়ে যান। তারা বসরায় গিয়ে হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. এর বিশাল বাড়ির সীমানায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এর কয়েক বছর পর হিজরি ৫০ সনে খোরাসান ও সিজিস্তানের এ মহান বিজেতা পরলোক গমন করেন।[৩১২]

নতুন হাঙ্গামা ও তার প্রতিরোধ

হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. এর পর খোরাসানের স্থানীয় গোত্রগুলো আবার বিদ্রোহ করে। কাবুল থেকে কান্দাহার পর্যন্ত আবারো তাদের ঠিকাদারি কায়েম হয়। অবশেষে নতুন গভর্নর হজরত রাবি বিন জিয়াদ বুসত নামক স্থানে উক্ত গোত্রসমূহের নেতাকে পরাজিত করেন, যার উপাধি ছিল রুতবেল। তারপর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বিদ্রোহের কেন্দ্র কান্দাহারকেও তিনি পুনরায় পদানত করেন।[৩১৩]

হজরত রাবি বিন জিয়াদের পর উবাইদুল্লাহ বিন আবু বকর এসে খোরাসান ও সিজিস্তানক পদানত করার অসম্পূর্ণ কাজ এগিয়ে নেন। এ সময় শত্রুপক্ষের সরদার রুতবেল নগদ দুই লক্ষ দিরহাম এবং বাৎসরিক দশ লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেন।

হজরত উবাইদুল্লাহ বিন আবু বকর রা. তাতে ইতিবাচক সাড়া দেন। কিন্তু চূড়ান্ত চুক্তি করার আগে তিনি ইরাকে গিয়ে জিয়াদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সন্ধির বিষয়ে পরামর্শ করেন। জিয়াদ অনুমতি প্রদান করেন। কারণ স্থানীয় দাঙ্গাবাজদের উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ হবার কোনো উপায় দেখা যাচ্ছিল না। তাই কোনোভাবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ হওয়াই উত্তম ছিল। সুতরাং সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়।[৩১৪]

---

[৩১২] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৩৮৪,

[৩১৩] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৮

[৩১৪] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৩৮৫,

গুর ও আশাল বিজয়

আফগানিস্তানের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি প্রদেশের নাম 'গুর'। দুর্গম মরুভূমি ও পাহাড়ি গিরিপথের কারণে যেকোনো বিজয়ী সেনাপতির জন্য এ এলাকাটি ছিল এক ভয়াবহ পরীক্ষা। অবশেষে হিজরি ৪৭ সনে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সেনাপতি হজরত হাকাম বিন আমর গিফারি রা. সর্বপ্রথম এ দুর্বোধ্য এলাকা জয় করেন।[৩১৫]

তারপর হিজরি ৫০ সনে তিনি আশাল পর্বতমালার দিকে অগ্রসর হন। এখানকার অধিবাসীরা স্বর্ণের তৈজসপত্র ব্যবহার করত। ইসলামি বাহিনী অত্যন্ত জটিল পাহাড়ি গিরিপথ ধরে অগ্রসর হতো এবং শত্রুদলকে পরাজিত করত। এভাবে তারা ক্রমান্বয়ে পর্বতমালার গহীন থেকে গহীনতর বনাঞ্চলে চলে যায়। হঠাৎ একটি জায়গায় শত্রুদল তাদের ঘিরে ফেলে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেখানে তাদের এক সরদার মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়ে যায়। সে তার মুক্তির শর্তে মুসলমানদেরকে সেখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার পথ বাতলে দেয়। আর এভাবেই বিপুল পরিমাণ গনিমত নিয়ে মুসলমানদের এ বাহিনী নিরাপদে ফিরে যায়।

যেহেতু এ অভিযানে স্বর্ণ-রৌপ্যের কোনো মুদ্রা হস্তগত হয়নি; তাই পূর্বাঞ্চলীয় গভর্নর হজরত জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান হজরত হাকাম বিন আমর রা. কে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আদেশ করেন যে, স্বর্ণ-রূপার তৈজসপত্রগুলো কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইরাকের উদ্দেশে যাত্রা করুন।

এই অভিযানের পর মার্ভে হজরত হাকাম বিন আমর রা. এর মৃত্যু হয়ে যায়।[৩১৬]

---

[৩১৫] তারিখুত তাবারি : ৫/২২৯

[৩১৬] তারিখুত তাবারি : ৫/২৫০-২৫২

নোট : অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, আশাল পর্বতমালা সম্পর্কে ইতিহাসের বইপুস্তক, ভূগোলের বইপত্র কোথাও কিছুই বলা হয়নি। অন্যদিকে তাবারির বর্ণনায় এ স্থানটির নাম 'জাবালুল আশাল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বোধহয় এটি ফারসি শব্দ-'কোহে আশাল'-এর আরবি রূপ।

যাই হোক, বর্ণনায় পাওয়া যায়, এ এলাকার অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য ছিল

سلاحهم اللبود وآنيتهم الذهب

মধ্যএশিয়ায় বিজয়ের সূচনা

হিজরি ৫১ সনে হজরত মুয়াবিয়া রা. সেই সীমান্ত অতিক্রম করে ইকদামি জিহাদের সূচনা করেন, যা নির্ধারণ করেছিলেন হজরত উমর ফারুক রা. এবং যা তখন পর্যন্ত কোনো ইসলামি বাহিনী অতিক্রম করেনি। সেটি ছিল আমুদরিয়া। এই আমুদরিয়ার তীরবর্তী এলাকাই ছিল মধ্যএশিয়ার সবচেয়ে অর্থকড়ি ও খনিজ সম্পদে ভরপুর অঞ্চল। কারো

অর্থাৎ তাদের অস্ত্র ছিল পশমের মোটা জুব্বা আর তৈজসপত্র ছিল স্বর্ণের।

এখন প্রশ্ন হলো, আসলে এটি কোন এলাকা ছিল? এক্ষেত্রে ধারাণা করা হয় যে, 'কোহে আশাল' হয়তো বর্তমান কোয়েটা অঞ্চল হয়ে থাকবে, যেটি ব্রিটেনের সাম্রাজ্য বিস্তারের পূর্বে 'শাল কোট' নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং এমন হওয়া মোটেই দুষ্কর নয় যে, সুদীর্ঘ বারশ বছরে 'কোহে আশাল' পরিবর্তন হয়ে প্রথমে 'শাল কোহ' এবং সেখান থেকে 'শাল কোট' হয়ে গেছে।

এসব ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায়, হজরত হাকাম বিন আমর রা. এর উক্ত অভিযানটি এ এলাকার আশপাশেই ছিল। কেননা হিজরি ৪৭ সনে তিনি গুর নামক এলাকায় অবস্থান করেছিলেন, যেটি বর্তমান কোয়েটা থেকে ২৯৫ মাইল (৪৭৬ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত। তারপর হিজরি ৫০ এ তিনি কোহে আশাল আগমন করেন। ৪৭-৫০ এ তিন বছরে উল্লিখিত দূরত্বে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়।

কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোহে আশাল কি আসলেই বর্তমান কোয়েটা ছিল, না অন্যকোনো এলাকা? নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। তবে মোটা পশমি জুব্বা ব্যবহারের তথ্যটি থেকে জানা যায়, কোহে আশাল ছিল অত্যন্ত শীতপ্রধান অঞ্চল। আর বর্তমান কোয়েটার অবস্থাও ঠিক তাই। সুতরাং পশমি জুব্বার ব্যবহার নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। কিন্তু স্বর্ণের এত ছড়াছড়ির কী কারণ থাকতে পারে? তাহলে কি কোহে আশালের আশাপাশে কোথাও স্বর্ণের খনি ছিল? নাকি অধিক সম্পদশালীতার কারণে তারা স্বর্ণ-রূপার তৈজসপত্র ব্যবহার করত?

বর্তমানে কোয়েটার আশপাশে কোথাও স্বর্ণের খনি আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ক্রোমাইট, মারবেল ও অন্যান্য দামি পাথরের এখানে প্রচুর খনি রয়েছে। অন্যদিকে বলা হয়, চাগির নিকটবর্তী এলাকা 'সিন্ডাকে' স্বর্ণের খনি রয়েছে। কিন্তু সেটি কোয়েটা থেকে অনেক দূরে।

যাই হোক, এ সম্ভাবনা অবশ্যই উক্ত এলাকায় অনুসন্ধান চালানোর দাবি রাখে।

জানা ছিল না যে, আগামী দেড় শতাব্দী পরে এ অঞ্চলটিই ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির এমন উর্বর ভূমিতে পরিণত হবে, যেখান থেকে প্রকাশ পাবে উম্মাহর আলেমকুলের প্রথম সারিতে স্থান লাভকারী মুহাদ্দিসগণ।

আমুদরিয়ার ওই পারে

কিছুদিন হলো, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সেনাপতি হজরত হাকাম বিন আমর গিফারি রা. মুসলিমবিশ্বের এই শেষসীমান্ত পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি যখন আমুদরিয়ার তীরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন এর জলরাশি উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে তার সম্মুখে আছড়ে পড়ছিল। হজরত হাকাম বিন আমর দরিয়া পাড়ি দেন। তারপর তার ইশারায় তার গোলাম সাগরের তাজা ও মিঠা পানি নিজের ঢালে ভরে এনে তার সম্মুখে পেশ করে। তিনি সে পানি পান করেন এবং তার দ্বারা অজু করেন। তারপর এ পর্যন্ত মুজাহিদ বাহিনীর আগমনের আনন্দে দু' রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করেন।

মধ্যএশিয়ায় সেটিই ছিল উম্মতে মুহাম্মদিয়ার প্রথম যুদ্ধাভিযান।[৩১৭]

মোজা ফেলে পালাল বুখারার সম্রাজ্ঞী

হিজরি ৫৩ সনে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ ২৪ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে মধ্যএশিয়ায় অভিযান চালান। আরবের লোকেরা এ অঞ্চলটিকে বলত ما وراء النہر অর্থাৎ নদীর ও পার। আর পারস্যের লোকেরা বলত 'তুর্কিস্তান'।

এ অঞ্চলে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী জাতি তুর্কিদের একচেটিয়া আধিপত্য। সমরকন্দ, তিরমিজ ও খেওয়া ছিল এখানকার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শহর। তুর্কিদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল বুখারা, যার চাতুষ্পার্শ্বে ছিল মরু পাহাড়ি ও অঞ্চল। উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ উটের পিঠে আরোহণ করে সে মরু অঞ্চল অতিক্রম করেন। তুর্কিরা যখন তার মোকাবেলা করতে আসে, তখন সেখানে ভীষণ লড়াই হয়। তুর্কিদের মদদে বুখারার খান ও সম্রাজ্ঞী স্বয়ং রণাঙ্গনে নেমে আসে। কিন্তু পরিশেষে তাদের পরাজয়

---

[৩১৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/৫৬, হজরত জারির বিন আবদুল্লাহর আলোচনায়।

ঘটে। খান তার সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় দিগ্বিদিক ছুটতে গিয়ে সম্রাজ্ঞী তার মোজা ফেলে যায়। পরবর্তীতে সে মোজা দু' শত দিরহাম (প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকায়) বিক্রি হয়েছিল।

সম্রাজ্ঞী ছিল বেশ চতুর। সে বুখারা নগরীতে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল এবং উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি করে নিল। চুক্তি অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য বুখারা নগরীর দরজা খুলে দেওয়া হয়। স্বয়ং উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ গিয়ে এ প্রাচীন শহরের দেখাশোনা করেন। কিন্তু বুখারার আশপাশের তুর্কিদের সাথে কোনো চুক্তি হয়নি। তাই দু' বছর পর্যন্ত উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ এখানে অভিযান পরিচালনা করেন এবং বুখারার উপকণ্ঠে অবস্থিত নাসাফ ও বিগান্দ নামক এলাকা জয় করেন।[৩১৮]

বুখারা ও সমরকন্দ বিজেতা : হজরত সাঈদ বিন উসমান গনি রা.

তারপর হজরত উসমান রা. এর সুযোগ্য পুত্র হজরত সাঈদ রা. কে মধ্য এশিয়ার গভর্নর পদে নিযুক্ত করা হয়। এদিকে বুখারার সম্রাজ্ঞী তখনো তার কুটিলতা থেকে ফেরেনি। মুসলমানরা চলে গেলেই সে চুক্তি ভঙ্গ করত। আবার আসামাত্রই সন্ধি করে নিত।

অন্যদিকে তার আশকারা পেয়ে তুর্কি গোত্রগুলো বারবার বিদ্রোহ ও গোলযোগ করছিল। এ পরিস্থিতির কারণে হজরত সাঈদ বিন উসমান রা. আবার তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমবেত করতে থাকেন। এবার তিনি প্রসিদ্ধ ইসলামি সিপাহসালার হজরত মুহাল্লাব বিন আবু সুফরাকে সঙ্গে নিয়ে জাইহুন নদীর তীরে এসে অবস্থান নেন। অন্যদিকে নাসাফ, সুগদ ও কিশ এলাকার তুর্কি গোত্রগুলো ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। বুখারার সম্রাজ্ঞী তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছিল।

হজরত সাঈদ বিন উসমান বাতিলের শক্তির কাছে মাথানত করার মতো মানুষ ছিলেন না। তিনি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে আমুদরিয়া পাড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে বুখারার উপকণ্ঠে তুর্কিদের সাথে তুমুল

---

[৩১৮] আল কামিল ফিত তারিখ, ৫৩ হিজরি, ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৩৮৯, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২২২,

লড়াই হয়। উভয় বাহিনী জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে। কিন্তু এক সময় তুর্কিদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায়। জীবন বাঁচাতে রণাঙ্গন ছেড়ে তারা পালাতে শুরু করে।

বুখারার সম্রাজ্ঞী এ সময় তার চুক্তিভঙ্গের কারণে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। সে আশঙ্কা করছিল যে, এবার মুসলমানরা তাকে আর ক্ষমা করবে না। কিন্তু হজরত সাঈদ রা. অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয়ে এবারও তার সন্ধি প্রস্তাবে সাড়া দেন এবং তার অনেক অপরাধ সত্ত্বেও তাকে নিরাপত্তা দান করেন।

বুখারা নগরীকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে হজরত সাঈদ রা. তুর্কিদের অপর বৃহৎ কেন্দ্র সমরকন্দের দিকে অগ্রসর হন। তখন বুখারার সম্রাজ্ঞী তার সৈন্যবাহিনী তার সঙ্গে দিয়ে দেন। হজরত সাঈদ বিন উসমান অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে সমরকন্দের সম্মুখে ছাউনি ফেলেন।

ওদিকে প্রতিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল অসংখ্য এবং তাদের শহর-রক্ষা প্রাচীর ছিল অত্যন্ত মজবুত। কিন্তু হজরত সাঈদ রা. মোটেই বিচলিত না হয়ে কসম করে বলেন, এ শহর জয় না করে তিনি ফিরবেন না। তিনদিন ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। তৃতীয়দিন সমরকন্দের লোকেরা এত জোরালভাবে তির বর্ষণ করতে থাকে যে, হজরত সাঈদ বিন উসমান এবং হজরত মুহাল্লাব বিন আবু সুফরাও তা থেকে রক্ষা পাননি। উভয়ের একটি করে চোখ শহিদ হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও মুসলিম বাহিনী অবিচল থেকে লড়াই চালিয়ে যায়। অবশেষে তুর্কিরা পালিয়ে শহরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়।

এ সময় হজরত সাঈদ রা. জানতে পারেন, তুর্কিদের কয়েকজন রাজপুত্র এবং নেতা অন্য একটি দুর্গে ওত পেতে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি বাহিনী পাঠিয়ে সেই দুর্গটি ঘিরে ফেলেন। এ দৃশ্য দেখে সমরকন্দের তুর্কিরা ভীষণ ঘাবড়ে যায় এবং সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু ইতিপূর্বে কয়েকবার যেহেতু তুর্কিদের থেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, তাই এবার সন্ধির জন্য হজরত সাঈদ তিনটি শর্ত পেশ করেন। যথা :

১. ১৫ তুর্কি নেতা ও শাহজাদা মুসলমানদের কাছে বন্ধক থাকবে।
২. মুসলমানদের জন্য শহর খুলে দিতে হবে।
৩. শহরের অধিবাসীরা ৭ লক্ষ দিরহাম নগদ পরিশোধ করবে।

সমরকন্দের লোকেরা এ শর্তগুলো মেনে নিয়েই সন্ধি করে নেয়।

ফেরার পথে হজরত সাঈদ বিন উসমান রা. তিরমিজের পথ ধরেন। সেখানেও এক সম্রাজ্ঞী রাজত্ব পরিচালনা করছিল। সেও সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে এবং হজরত সাঈদও তা গ্রহণ করেন। সম্রাজ্ঞী তার হাতে শহর তুলে দেয়। আর এভাবেই মধ্যএশিয়ার সিংহভাগ হজরত মুয়াবিয়া রা. এর যুগে হজরত উসমান রা. এর সুযোগ্য পুত্রের হাতে বিজিত হয়।[৩১৯]

হজরত কুসাম বিন আব্বাস রা. এর শাহাদাত

অত্যন্ত চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ অভিযানে বনু হাশিমের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি হজরত কুসাম বিন আব্বাস রা.-ও অশংগ্রহণ করেছিলেন। আর এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, বনু হাশিমও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর খেলাফত মেনে নিয়েছিল। তাই তো তারা তার নেতৃত্বে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন।

এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এ অভিযানে একবার লড়াইয়ের পর যখন মুজাহিদদের মধ্যে গনিমতের সম্পদ বণ্টন শুরু হয়, তখন বাহিনীর প্রধান হজরত সাঈদ বিন উসমান রা. হজরত কুসাম বিন আব্বাস রা. কে তার শ্রেষ্ঠত্বের কারণে এক হাজারের অংক (যা বর্তমান হিসাবে কয়েক লাখ রুপি) প্রস্তাব করেন (যা বর্তমান সময়ের হিসাবে কয়েক লক্ষ টাকার সমপরিমাণ)। কিন্তু হজরত কুসাম বিন আব্বাস রা. নিষেধ করে বলেন, 'এমনটা করো না; বরং নিয়ম অনুযায়ী গনিমতের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (বাইতুল-মালের জন্য) রেখে অবশিষ্ট যা থাকে, তা মুজাহিদদের মধ্যে তাদের প্রাপ্য অংশ অনুপাতে বণ্টন করে দাও। আর আমাকে এবং আমার ঘোড়াকে (সাধারণ মানুষের মতো) একটি অংশই দাও'।[৩২০]

উক্ত ঘটনা থেকে সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষত বনু হাশিমের নির্মোহতার ধারণা পাওয়া যায় যে, তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই জীবনবাজি রেখে লড়াই করতেন। দুনিয়ার অর্থ-সম্পদের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ

---

[৩১৯] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৩৯৭, ৩৯৮,

[৩২০] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/৩৬৭, হজরত কুসাম বিন আব্বাস রা. র আলোচনা।

ছিল না। মধ্যএশিয়ার উক্ত অভিযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল যুদ্ধে হজরত কুসাম রা. অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবশেষে সমরকন্দের ভয়াবহ যুদ্ধে বীরত্বের স্বাক্ষর রেখে শাহাদাত বরণ করেন।[৩২১]

হজরত কুসাম রা. ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এর ছোট ভাই। সুতরাং সম্পর্কে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই হতেন। দৈহিক আকার-আকৃতিতেও নবীজির সঙ্গে তার বেশ মিল ছিল।[৩২২] নবীজি তাকে অনেক ভালোবাসতেন। অনেক সময় নবীজি নিজের বাহনে হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. কে পেছনে এবং হজরত কুসাম রা. কে সম্মুখে বসাতেন।[৩২৩] নবীজির পবিত্র দেহ কবরের শায়িত করার সৌভাগ্য যেসকল সাহাবির ভাগ্যে জুটেছিল, হজরত কুসাম ছিলেন তাদেরই একজন।[৩২৪]

এ ছাড়া হজরত আলি রা. এর সহযোগীদের মধ্যে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হজরত আলি রা. মদিনা থেকে কুফায় গমনকালে তাকেই মদিনার শাসক নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন।[৩২৫] হজরত আলি রা. এর খেলাফতকালে কোনো কোনো বছর তিনি হজের নেতৃত্বের দায়িত্বও পালন করেছিলেন।[৩২৬]

---

[৩২১] আল ইবার ফী খাবারি মান গাবার লিয যাহাবি, ৫৬ হিজরির আলোচনায়, তারিখে ইয়াকুবি, পৃষ্ঠা : ২০৩, 'হজরত মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান রা. এর যুগ' শিরোনামের অধিনে।

[৩২২] আল মুনতাব মিন যাইলিল মুযিল লিত তাবারি, পৃষ্ঠা : ৩৮,

[৩২৩] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৭০৬

[৩২৪] সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৬৬৪

[৩২৫] আল ফিতনাতু ওয়া ওয়াকআতুল জামাল, পৃষ্ঠা : ১০৮

[৩২৬] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯৮

আফ্রিকা অভিযান

মুসলিমবিশ্বের পশ্চিম দিকে ছিল আফ্রিকা মহাদেশের অবস্থান। আফ্রিকার যে প্রান্তটি রোমসাগরের সাথে সাথে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে, সেটি বেশ কয়েকটি রাজ্য আগলে রেখেছিল। হজরত উসমান রা. এর যুগে এ অঞ্চলে কিছু বিজয়াভিযান পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সেখানে মুসলমানদের মজবুত কোনো অবস্থান তৈরি হয়নি।

অন্যদিকে ইউরোপিয়ান সম্রাট ও রোম সম্রাট এখানকার কাফেরগোষ্ঠীর মদদ যোগাত, যাতে তারা মুসলমানদের অগ্রযাত্রায় বাধা হতে পারে। আফ্রিকার বিভিন্ন সরদারের পক্ষ থেকে মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত সন্ধির কারণে বেশ মর্মজ্বালা ছিল। তাই সে তাদেরকে পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছিল।

এহেন প্রেক্ষাপটে মিসর অঞ্চলে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত গভর্নর হজরত আমর ইবনুল আস রা. আফ্রিকার বিজয়াভিযানের জন্য তারই খালাতো ভাই হজরত উকবা বিন নাফে রহ. কে দায়িত্ব অর্পণ করেন।[৩২৭]

হজরত উকবা বিন নাফে রহ. এর বিজয়সমূহ

হজরত উকবা রহ. ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমরবিদ, দুঃসাহসিক এবং আবেদ ও দুনিয়াবিমুখ মানুষ। তিনি হজরত মুয়াবিয়া রা. এর খেলাফতের প্রথম বছরেই সৈন্য সমবেত করে আফ্রিকার মরুভূমি অতিক্রম করে লিবিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যান।

লিবিয়া ও মরক্কো জয় করে তিনি যখন ফিরছিলেন, তখন পেছন থেকে পরাজিত আফ্রিকানরা বিদ্রোহ করে বসে। হজরত উকবা সঙ্গে সঙ্গে ফিরতি যাত্রা স্থগিত করে তাদের উপর আক্রমণ করেন এবং শত্রুদের একটি বিরাট অংশকে হত্যা ও বন্দি করে দিদ্রোহের আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন।

---

[৩২৭] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৪

পরবর্তী বছর তিনি আরো অগ্রসর হন এবং এক ভয়াবহ লড়াইয়ের পর 'গুদামিস' জয় করে ছাড়েন।[৩২৮]

তারপর ৪৩ হিজরিতে তিনি অবশিষ্ট বাহিনী রেখে কেবল ৪০০ অশ্বারোহী, ৪০০ উষ্ট্রারোহী ও ৮০০ পানির মশক নিয়ে দক্ষিণ দিকে সুদান মরুভূমির দিকে বেরিয়ে পড়েন এবং 'বারকা'র আশপাশে 'ওয়াদ্দান' জয় করে স্থানীয় সরদারকে আটক করে নিয়ে আসেন।[৩২৯]

হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর মৃত্যু

মিসরের গভর্নর হজরত আমর ইবনুল আস রা. ৪২ হিজরির ঈদুল ফিতরের দিন ইনতেকাল করেন।[৩৩০]

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধে অংশ নেওয়ার কারণে হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর কার্যক্রম ও ব্যক্তিত্বের উপর প্রশ্নোবধক চিহ্ন দেওয়া হয়। আর বাতিলপন্থিরা কেবল তাদের যুক্তি বা দুর্বল বর্ণনার মাধ্যমে সে প্রশ্নের উত্তরে তাকে জালেম ও মুনাফিক মনে করে থাকে। অথচ তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহাবি। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন, 'আসের উভয় পুত্র- আমর ও হিশাম মুমিন'।[৩৩১]

হাফেজ জাহাবি রহ. লিখেছেন, হজরত আমর ইবনুল আস রা. ছিলেন কুরাইশের অন্যতম বিচক্ষণ এবং সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তীক্ষ্ণ মেধা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতায় তিনি ছিলেন প্রবাদতুল্য। দৈহিক গঠনে তিনি খর্বকায় ছিলেন। চুল-দাড়িতে লাল খেযাব ব্যবহার করতেন।[৩৩২]

যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো, তখন ভীষণ চিন্তিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তার ছেলে হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর রা. বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন? মৃত্যুকে ভয় করছেন?

---

[৩২৮] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৫

[৩২৯] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৬, মু'জামুল বুলদান : ৫/৩৬৬

[৩৩০] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৫

[৩৩১] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৮০৪২, সনদ হাসান। তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৯২, মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৫০৫৩, সনদ সহিহ।

[৩৩২] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/ ৫৪-৫৭

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, মৃত্যুকে নয়; বরং মৃত্যুপরবর্তী জীবনকে ভয় করছি।

আপনি তো উত্তম জীবন অতিবাহিত করেছেন।

একথা বলে ছেলে তাকে স্মরণ করাতে লাগলেন, তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, শামদেশের বিজয়াভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন, ইত্যাদি।

হজরত আমর ইবনুল আস রা. বলতে লাগলেন, তুমি তো এর চেয়েও বড় মর্যাদার বিষয়টি বললে না। সেটি হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেওয়া।

দেখো, আমার জীবনের তিনটি পর্ব অতিবাহিত হয়েছে। আমি খুব ভালো করেই জানি, কোন পর্বে আমি কেমন ছিলাম। প্রথমে আমি কাফের ছিলাম। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলাম। আমি যদি ওই সময় মারা যেতাম, তা হলে নিঃসন্দেহে জাহান্নামি হতাম।

তারপর যখন আমি আল্লাহর নবীর হাতে বাইয়াত হলাম, তখন সবার চেয়ে আমিই তাকে অধিক সমীহ করতাম। নবীজির প্রতি আমার এত সংকোচ ছিল, কোনো দিন দু'চোখ ভরে তাকে দেখতে পারিনি। আমি তার কাছে যা কিছু বলতে চাইতাম, তা খুলে বলতে পারতাম না। অবশেষে একদিন তিনি আল্লাহর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। আমি যদি সেই সময় মারা যেতাম, তা হলে মানুষ বলত, 'আমরের জীবন ধন্য হয়েছে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে, সৎপথে অবিচল থেকেছে এবং এভাবেই মৃত্যু বরণ করেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের আশা করা যায়'। কিন্তু তারপর আমি ক্ষমতা গ্রহণ ও এজাতীয় বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছি। জানি না, আজ এগুলো আমার জন্য উপকারী হবে না ক্ষতিকর। সুতরাং এখন যদি আমি মরে যাই, তা হলে আমার জন্য কেউ যেন ক্রন্দন না করে'।[৩৩৩]

---

[৩৩৩] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৭৭৮০, সনদ হাসান।

এক বর্ণনায় আছে, ছেলে বললেন, 'ভয় পাচ্ছেন কেন? আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আপনাকে কাছে রাখতেন এবং আমির বানাতেন'।

তিনি বললেন, বৎস, ছিলাম তো এমনই। কিন্তু তোমাকে বলি, আল্লাহর কসম, আমি জানি না, নবীজি এসব আমাকে ভালোবেসে করতেন, না আমার মন রক্ষার জন্য করতেন। তবে দুজন মানুষ সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিই যে, দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর নবী তাদেরকে ভালোবাসতেন। একজন সুমাইয়ার পুত্র (হজরত আম্মার বিন ইয়াসির), অপরজন ইবনে উম্মে আবদ (হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ)।

একথা বলে তিনি স্বীয় হাত চিবুকের নিচে রেখে দোয়া করতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের আদেশ করেছেন, কিন্তু আমরা তা পালন করিনি। আপনি আমাদের নিষেধ করেছেন, কিন্তু আমরা তা মানিনি। এখন আপনার ক্ষমা ছাড়া আমাদের আর কোনো আশ্রয় নেই'।

একথা বলতে বলতেই তার পবিত্র আত্মা প্রকৃত স্রষ্টার উদ্দেশে উড়ে গেল।[৩৩৪]

انا لله وانا اليه راجعون

এই ছিল একজন সাহাবিদের অবস্থা, যারা পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রেও ছিলেন সৎ ও নিষ্ঠাবান। শয়নে-স্বপনে আখেরাতই ছিল তাদের একমাত্র ভাবনার বিষয়। যদি কোনো ভুল হয়ে যেত, তা হলে তা স্বীকার করে নিতে এবং অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করার ক্ষেত্রে তারাই ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী।

হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা. এর জিহাদ

হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর স্থলে হজরত মাসলামা বিন মুখাল্লাদ রা. মিসর ও উত্তর আফ্রিকার গভর্নর হলেন। এ সময় রোম সম্রাট উইলিয়াম নামক এক সরদারকে আফ্রিকা পাঠিয়ে সেখানকার লোকদেরকে তার বশ্যতা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানায়। এক আফ্রিকান

---

[৩৩৪] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৭৭৮১, মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সনদ সহিহ।

সরদার হিবাবা এসে এ সংবাদ হজরত মুয়াবিয়া রা. কে জানিয়ে দেয়। তখন তিনি মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা. কে আফ্রিকায় আরো অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন।[৩৩৫]

দায়িত্ব পেয়ে তিনি আফ্রিকার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেন। এ সময় তিনি একটি পাহাড়ের চূড়ায় ক্যাম্প স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সেখানে এত পরিমাণে বৃষ্টি হতো যে, জায়গাটি 'জাবালুল মাতুর' তথা বৃষ্টির পাহাড় নামে পরিচিত হয়ে যায়।[৩৩৬]

তারপর হিজরি ৪৭ সনে আফ্রিকা অভিযানের জন্য হজরত রুওয়াইফি বিন সাবিত রা. কে সিপাহসালার বানিয়ে প্রেরণ করা হয়। তিনি ত্রিপোলি (লিবিয়ার রাজধানী) পৌঁছে যান এবং তা জয় করে ফিরে আসেন।[৩৩৭]

বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সমুদ্র যখন শান্ত থাকত, তখন ত্রিপোলির উপকূলে রোমানদের আক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে যেত। অবশ্য শীতের সময় সমুদ্র বিক্ষুব্ধ থাকার কারণে এ আশংকা থাকত না। হজরত মুয়াবিয়া রা. প্রতিবছর বসন্তে নতুন বাহিনী ত্রিপোলির সীমান্ত প্রহরার জন্য নিযুক্ত করে রাখতেন। তারপর যখন শীত শুরু হতো এবং সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠত, তখন বাহিনীর প্রধান স্বল্প সংখ্যক সৈন্য সাথে নিয়ে সেখানেই থেকে যেতেন, আর অবশিষ্ট বাহিনী ফিরে চলে আসত।[৩৩৮]

সুস বিজয়

হিজরি ৫০ সনে মিসরের তৎকালীন গভর্নর হজরত মাসলামা বিন মুখাল্লিদ রা. এর পক্ষ থেকে মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা. কে পুনরায় জিহাদের উদ্দেশ্যে আফ্রিকা পাঠানো হয়। এবার তার সঙ্গে ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর, হজরত আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের মতো কুরাইশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ।

---

[৩৩৫] আল বায়ানুল মাগরিব ফী আখবারিল উন্দলুস ওয়াল মাগরিব, মারাকিশ: ১/৮
নোট : কোনো কোনো কিতাবে এ সাহাবির নাম মুয়াবিয়া বিন খাদিজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধ হলো হুদাইজ। হয়তো কোনো রাবির ভুল ধারণা কিংবা অনুলিপির ভুলের কারণে খাদিজ হয়ে গেছে।

[৩৩৬] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৭

[৩৩৭] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৮

[৩৩৮] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ১২৯,

অন্যদিকে রোম সম্রাট চাচ্ছিল আফ্রিকায় তার কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে। তাই সে নাজফুর নামক জনৈক নবাবকে ৩০ হাজার দস্যু দিয়ে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা রুখে দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেয়। রোমের এ বাহিনী আফ্রিকার উপকূলে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. এক বিরাট অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তাদের দিকে ধেয়ে আসে। উপকূলীয় শহর সুস থেকে ১২ মাইল (১৯ কিলোমিটার) দূরে একটি টিলার উপর গিয়ে তারা থমকে দাঁড়ায়। সেখান থেকে উপকূলে রোমান বাহিনীর পূর্ণ অবস্থান দেখা যাচ্ছিল।

কিন্তু রোমান বাহিনীর সেনাপতি নাজফুর এ সংবাদ জেনে ফেলল যে, সাহাবায়ে কেরাম তাদের খুব কাছে এসে পড়েছেন। এ সংবাদ শুনে সে এত বেশি ঘাবড়ে গেল যে, তৎক্ষণাৎ জাহাজে চড়ে পালাতে শুরু করল। আর তার বাহিনী উপকূলেই পড়ে রইল।

এবার হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. অভিজ্ঞ যোদ্ধদেরকে নিয়ে সোজা সুস শহরের সম্মুখে উপকূলে এসে দাঁড়ান। একদিকে উন্মুখ হয়ে ছিল রোমান বাহিনী, অন্যদিকে ছিল শহরের দরজা। এদিকে আসরের নামাজের সময় হয়ে গিয়েছিল। হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. সেখানেই কাতার সোজা করে আসরের নামাজ আরম্ভ করে দিলেন।

রোমানরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। তারা নামাজের সময়টিকে আক্রমণের সুবর্ণ সুযোগ মনে করে অশ্বারোহী দলকে সম্মুখে পাঠিয়ে দিল। হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. ধীর-শান্তভাবে নামাজ আদায় করতে লাগলেন। দুশমনের এ কাপুরুষোচিত পরিকল্পনায় তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। দুশমনরা কাছে আসার সামান্য আগে তিনি সালাম ফিরিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন এবং চিৎকার করে আল্লাহু আকবার বলে রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অল্প সময়ের মধ্যেই রোমান সৈন্যরা দিগ্বিদিক পালাতে শুরু করল।

এদিকে হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা. আবদুল মালিক বিন মারওয়ানকে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের একটি ছোট দল দিয়ে জালুলা শহরের দিকে পাঠিয়ে দেন, যা ছিল কাইরাওয়ান শহর থেকে ২৪ মাইল (সাড়ে ৩৮ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত। আবদুল মালিক

জালুলা অবরোধ করে মিনজানিকের সাহায্যে প্রচুর পাথর বর্ষণ করেন। কিন্তু তাতেও শহর জয় করা যায়নি। শহরের সীমানা-প্রাচীর দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কোনো স্থান থেকে বিধ্বস্ত হচ্ছিল না। ফলে বিজয় বিলম্বিত হতে থাকল।

এদিকে প্রধান সেনাপতি মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা. এর প্রেরিত বড় সৈন্যবাহিনীও আবদুল মালিকের কাছে পৌঁছে যায়। তবু বিজয়ের কোনো দেখা মিলছিল না। আবদুল মালিক বিন মারওয়ান একদিন জালুলার উপর ভীষণ আক্রমণ চালালেন। কিন্তু শহরের লোকেরাও সফলভাবে তা মোকাবেলা করল। এমন সময় মুয়াবিয়া বিন হুদাইজের পক্ষ থেকে আবদুল মালিককে আদেশ পাঠানো হয় যে, অভিযান মুলতবি করে ফিরে আসো। আদেশ পালন করা ছাড়া আবদুল মালিকের কোনো উপায় ছিল না। তাই তিনি সৈন্যদেরকে ছাউনির দিকে ফিরে যাওয়ার আদেশ করে নিজে তাঁবুর দিকে চলে যান। একটু দূরে যাওয়ার পর তার মনে পড়ে, ধনুকটি রণাঙ্গনের একটি গাছে ঝুলিয়ে রেখে এসেছেন। ফিরে গিয়ে ধনুকটি হাতে নেওয়ার সময় হঠাৎ শহরের প্রাচীরের প্রতি চোখ পড়তেই তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। শহরের প্রাচীর এক স্থানে বিধ্বস্ত হয়ে আছে।

আবদুল মালিক সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে সৈন্যদেরকে ফিরে আসতে বলেন এবং পূর্ণশক্তি নিয়ে শহরের উপর আক্রমণ করেন। তুমুল লড়াইয়ের পর মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করে শহর জয় করে নেয়।[৩৩৯]

এ বিজয়ে এত পরিমাণে গনিমত অর্জিত হয় যে, প্রত্যেক মুজাহিদ দুই শত দিরহাম এবং প্রত্যেক অশ্বারোহী চারশত দিরহাম লাভ করে।[৩৪০]

এ সকল বিজয়াভিযানের একপর্যায়ে হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা. আবদুল মালিক বিন মারওয়ান রহ. কে সঙ্গে নিয়ে তিউনিস থেকে ৩২ মাইল (৫১ কিলোমিটার) পশ্চিমে উপকূলে অবস্থিত 'বানযির্ত' নামক প্রসিদ্ধ শহরটিও জয় করেন।[৩৪১]

---

[৩৩৯] আল বয়ানুল মুগরিব: ১/৮, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২১১
[৩৪০] মু'জামুল বুলদান : ২/১৫৬, জালুলা, আল বায়ানুল মুগরিব লিবনি আজারি : ১/৮
[৩৪১] মু'জামুল বুলদান : ১/৫০০

এ অভিযানের এক বছর পর হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা. আফ্রিকা থেকে ফিরে আসেন।[৩৪২]

আফ্রিকার মাটিতে প্রথম ইসলামি বসতি, কাইরাওয়ানের গোড়াপত্তন

তখন পর্যন্ত আফ্রিকায় মুসলমানদের আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের রাজত্বগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করা এবং তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অপতৎপরতা বন্ধ করা। তাই মুসলিম বাহিনী এখানে এসে পৃথকভাবে অবস্থান করতে শুরু করেনি। এর ফলে তখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি যুদ্ধাভিযান সত্ত্বেও আফ্রিকায় মুসলমানদের কোনো শহর বা বসতি গড়ে ওঠেনি। এতে অসুবিধা এই হচ্ছিল যে, মুসলিম সৈন্যরা এখান থেকে বিদায় নিতেই কোনো না কোনো সন্ত্রাসী লোকজন সমবেত করে বিদ্রোহ করে বসত। ফলে কিছুদিন পুনরায় মুসলমানদের এসে সে এলাকা আবার জয় করতে হতো।

অবশ্য মুসলমানদের এখানে এসে সম্পূর্ণরূপে বসবাস না করারও বেশ কিছু কারণ ছিল। যেমন,

- আফ্রিকা অঞ্চলটি ছিল শত শত মাইল মরুভূমি ও গভীর জঙ্গলজুড়ে বিস্তৃত। জনবসতি ছিল খুবই কম।
- তা ছাড়া সেখানে জীবন-জীবিকার উপায়-উপকরণ ও জীবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য ছিল না। ফলে রুচিশীল মানুষের জন্য এখানে বসবাস করা ছিল বেশ কষ্টকর। পক্ষান্তরে শাম, মিসর ও ইরাক ছিল বহু পূর্ব থেকে আবাদ শহর। ফলে জীবনযাপনের উপকরণাদিও সেখানে ছিল ভরপুর। সে কারণে মুসলমানরা খুব সহজেই সেখানে শহর, দুর্গ ও সেনাছাউনি স্থাপন করে নিয়েছিল।

যাই হোক, বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা বন্ধ করার জন্য আফ্রিকায় একটি ইসলামি শহরের গোড়াপত্তন করা ছিল অতীব জরুরি। অবশেষে ৫০ হিজরিতে এ মহান কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সেনাপতি হজরত উকবা বিন নাফে রহ.।

---

[৩৪২] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২১১

হজরত উকবা রহ. এর সম্পর্ক ছিল কুরাইশ গোত্রের শাখা বনু ফাহদের সঙ্গে। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১০ হিজরিতে। ৫০ হিজরিতে তিনি ছিলেন ৪০ বছরের একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি।

তখন বারকার উপকণ্ঠে ১০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে হজরত উকবা ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিলেন এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করছিলেন। এ সময় তিনি আফ্রিকার কয়েকটি শহরও জয় করেন এবং ইসলামি ভূখণ্ডের সীমানা সুদান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন।[৩৪৩]

তিনি তার বাহিনীর আমিরদের বৈঠকে বললেন, যখনই আমাদের কোনো সিপাহসালার বাহিনী নিয়ে আসে, এখানকার লোকেরা ইসলামের ছায়াতলে এসে পড়ে। কিন্তু মুসলিম বাহিনী বিদায় নিতেই তারা বিদ্রোহ করে বসে। সুতরাং আপনারা এখানে এমন একটি শহর আবাদ করুন, যা সব সময় মুসলমানদের জিহাদের কেন্দ্র হয়ে থাকবে।

সবাই তার সাথে একমত হলেন। কেউ কেউ মত ব্যক্ত করে বললেন, শহরটি সমুদ্র উপকূল-ঘেষে নির্মাণ করা হোক, যাতে সমুদ্র উপকূলের সুরক্ষাও নিশ্চিত হয়। কিন্তু হজরত উকবা রহ. বললেন, উপকূলে নির্মাণ করলে আশঙ্কা থাকবে, রোম সম্রাট হঠাৎ আক্রমণ করে শহর দখল করে নিতে পারবে। তাই উত্তম হবে উপকূল থেকে তিন দিনের দূরত্বে নির্মাণ করা, যাতে শত্রুদের নৌবাহিনী এসে পড়লেও যেন সরাসরি শহর পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে।

সবাই তার সাথে একমত হলেন।[৩৪৪]

হজরত উকবা বিন নাফে রহ. শহরের জন্য সাবখা হাওড়ের কাছের এলাকাটি মনোনীত করলেন।

তারপর ৫১ হিজরিতে মুসলমানরা এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল। ওই এলাকার গভীর বনাঞ্চল হিংস্র

---

[৩৪৩] আল কামিল ফিত তারিখ : ৩/৬৩, আল আ'লাম লিয যিরিকলি : ৪/ ২৪১, মু'জামুল বুলদান : ৪/৪২০

[৩৪৪] আল বায়ানুল মাগরিব : ১/৯, বর্তমান পৃথিবীতেও বড় কোনো শহর আবাদ করার ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা হিসেবে এদিকে বেশ লক্ষ রাখা হয়, যেন তা সীমান্ত থেকে নিরাপদ দূরত্বে নির্মাণ করা হয়।

জীবজন্তু, বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুতে ভরপুর। তার মধ্যে পা রাখার অর্থই ছিল মৃত্যুকে স্বাগত জানানো।[৩৪৫]

বনাঞ্চল ফাঁকা করে চলে গেল হিংস্র জীব-জন্তুর দল

এ পরিস্থিতি দেখে হজরত উকবা রহ. বাহিনীর নির্বাচিত কয়েকজন সদস্যকে সমবেত করলেন, যাদের মধ্যে ১৮ জন সাহাবি ছিলেন। সকলে এ বিপদ দূর হওয়ার জন্য দোয়া করলেন। হজরত উকবা রা. সোজা চলে গেলেন জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী সেই উপত্যকায়, যাকে শহর নির্মাণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে তিনি উঁচু আওয়াজে ঘোষণা করলেন, 'হে বনের পশুদল, হে সাপ ও বিচ্ছুরা, আমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথি। তোমরা এখান থেকে চলে যাও। কেননা আমরা এখানে বসবাস করব। এখন থেকে তোমাদের যাকে দেখা যাবে, তাকে আমরা মেরে ফেলব'।

এ ঘোষণা দেওয়ার পর দেখতে না দেখতেই গাছের ঝোঁপ-ঝাড় থেকে হিংস্র জন্তুরা এবং মাটির গর্ত থেকে সাপ-বিচ্ছুরা দল বেঁধে বেরিয়ে আসতে লাগল। ধীরে ধীরে বন ফাঁকা হয়ে গেল। বনের পশুরা আল্লাহর নবীর সাহাবিদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। যে বাচ্চারা চলতে পারত না, পশুরা তাদেরকেও সাথে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। বাঘ তার বাচ্চাকে কামড়ে ধরে দৌড়ে পালাচ্ছিল। সাপ তার বাচ্চাদেরকে পেঁচিয়ে ধরে গর্ত থেকে বেরি আসছিল।

হজরত উকবা রা. সৈন্যদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন, 'কেউ যেন এ প্রাণীদের গায়ে হাত না দেয়। এদেরকে নিরাপদে সরে যেতে দাও'।

এভাবে যখন বন ফাঁকা হয়ে গেল, তখন সাথিদের বললেন, 'এখন তোমরা আল্লাহর নামে প্রবেশ করো'।

মুসলমানরা বনে প্রবেশ করল। দেখা গেল সেখানে কোনো প্রাণীর চিহ্নও নেই। এই দৃশ্য দেখে জংলি বারবার গোত্রের অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলো। তারপর থেকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত সেই এলাকার আশপাশে কোনো কষ্টদায়ক প্রাণী দেখা যায়নি।[৩৪৬]

---

[৩৪৫] আল বায়ানুল মাগরিব : ১/৯

[৩৪৬] আল বায়ানুল মাগরিব : ১/৯

হজরত উকবা রা. এর আদেশে বৃক্ষ-লতা কেটে একটি বড় এলাকা পরিষ্কার করা হয়। সর্বপ্রথম একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তারপর তার আশপাশে মুজাহিদদের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি মহল্লায় নির্মাণ করা হয় একটি করে ছোট মসজিদ। শহরের প্রাচীরের সীমানা দেওয়া হয় সাড়ে চার মাইলব্যাপী (সোয়া সাত কিলোমিটার) এলাকা নিয়ে।

শহরের গোড়াপত্তন হওয়ার পর চারদিক থেকে মানুষ এখানে ছুটে আসতে থাকে। অল্পদিনের মধ্যেই এলাকাটি জনবসতিতে পূর্ণ হয়ে যায়। শহরের নাম রাখা হয় 'কাইরাওয়ান'।[৩৪৭]

আফ্রিকার মাটিতে এটিই ছিল মুসলমানদের প্রথম ছাউনি এবং প্রথম ইসলামি শহর।[৩৪৮]

হজরত উকবা বিন নাফে রহ. বিজিত এলাকাগুলোতে দাওয়াতের কাজও অব্যাহত রাখেন। যার ফলে আফ্রিকা মহাদেশে অতি দ্রুত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এবং অসংখ্য বারবার এবং অন্যান্য গোত্র ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।[৩৪৯]

হজরত আবু মুহাজির দিনার ও হাসসান বিন নুমান রা. র অভিযান

কয়েক বছর পর হজরত উকবা বিন নাফে রহ.কে কেন্দ্রে ডেকে নেওয়া হলো। তারপর ৫৪ হিজরিতে হজরত খালেদ বিন সাবিত ফাহমি এবং তারপরে আবু মুহাজির দিনার রহ. একের পর এক আফ্রিকার রণাঙ্গনে জিহাদের মহান খেদমত আঞ্জাম দেন। আর এর মাধ্যমে হজরত উকবা বিন নাফের বিজয়াভিযানের ধারা এগিয়ে নিয়ে যান।[৩৫০]

তারপর ৫৭ হিজরিতে হজরত হাসসান বিন নুমান রহ.কে নিযুক্ত করা হয়। এ বছরই আবেস বিন সা'দ উত্তর আফ্রিকার শহর আসতাজনার

---

৩৪৭ এটি মূলত ফারসি শব্দ-'কারওয়ান'-এর পরিবর্তিত রূপ।
৩৪৮ আল বায়ানুল মাগরিব : ১/১০৯, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২১০
৩৪৯ ফুতুহু মিসর ওয়াল মাগরিব লিআবিল কাসেম আল মিসরি : ৩/৪৫৪
৩৫০ তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২২৩

উপর আক্রমণ করেন।[৩৫১] আলজেরিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত বারবার গোত্রগুলো তার সাথে সন্ধি করে নেয় এবং কর পরিশোধ করতে থাকে। হজরত হাসসান বিন নুমান রা. হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মৃত্যু পর্যন্ত এ এলাকায় নিযুক্ত ছিলেন।[৩৫২]

হিজরি ৫৯ সনে আবু মুহাজির দিনার রহ. উত্তর আফ্রিকার উপকূলে রোমানদের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক নগরী কারতাজনায় আক্রমণ চালান। এখানে সারাদিন তুমুল লড়াই চলে। মুসলমানরা পেছনে সরে এসে আফ্রিকারই পূর্ববিজিত শহর তিউনিসের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে রাতের আঁধারে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন। তারপর খুব ভোরে শত্রুপক্ষের উপর চূড়ান্ত আক্রমণ চালান। স্থানীয় বাসিন্দারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে শহরের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দেয়। কারতাজনার পর হজরত আবু মুহাজির রহ. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানও জয় করেন, যার নাম ছিল 'মিলাহ'।[৩৫৩]

এভাবে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর যুগে প্রায় পুরো উত্তর আফ্রিকায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মুসলমানদের শক্ত অবস্থান গড়ে ওঠে।

---

[৩৫১] মু'জামুল বুলদান : ১/১৪২

[৩৫২] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২২৪

[৩৫৩] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, ৫৯ হিজরি।

রোমান সাম্রাজ্য ও মুসলিমবিশ্ব

ইসলামি খেলাফতের প্রতিপত্তি ও উত্থানের সম্মুখে পারস্য সম্রাট কিসরার দাপট ও ক্ষমতা কয়েক বছরের বেশি টিকতে পারেনি। হজরত উমর ফারুক রা. এর যুগে সাসানি সম্প্রদায়ের সিংহাসন জয় করা হয় এবং হজরত উসমান রা. এর যুগে তাদের সর্বশেষ সম্রাটকেও হত্যা করা হয়। তবু রোম সম্রাট এশিয়া থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়েও ইউরোপে পূর্ণ দাপট সহকারে টিকে ছিল। সেখানে তাদের কেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনোপল। রোম উপসাগরের কয়েকটি দ্বীপ ছিল তাদের দখলে। এসব দ্বীপে তাদের সেনাঘাঁটি ছিল। সে ঘাঁটি থেকে রোমন সৈন্যরা ইসলামি সীমান্তের উপর নজরদারি চালাত। তাই হজরত মুয়াবিয়া যেকোনোভাবে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে চাচ্ছিলেন। রোমানদের ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল কনস্টান্টিনোপলের প্রাসাদশৃঙ্গে কালিমার পতাকা উড্ডীন করা ছিল তার মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। বরং এটি ছিল তার শাসক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ। তবে খেলাফতের প্রথম বছর অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাগুলো নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং অন্যান্য রণক্ষেত্রে অবিচলতা অর্জন করতে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর একটু অবসরতার প্রয়োজন ছিল। তাই ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি রোমান সম্রাটের সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করে নিয়েছিলেন।[৩৫৪]

বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গেও বিশ্বস্ততা

যুদ্ধবিরতির উক্ত চুক্তির প্রস্তাব এসেছিল রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে। কেননা হজরত মুয়াবিয়া রা. শাসক হওয়ার কারণে সে ভীষণ সন্ত্রস্ত ছিল। কারণ, বিগত কয়েক বছর যাবৎ শামের সীমান্তে এবং রোম উপসাগরে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শক্তি ও ক্ষমতার প্রদর্শনী দেখে আসছিল। সুতরাং এমন একজন শক্তিশালী ব্যক্তির মুসলিমবিশ্বের পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করার কারণে সে যতই চিন্তিত হোক তা কম ছিল।

---

[৩৫৪] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৫

সন্ধির বিনিময়ে রোম সম্রাট প্রতিবছর মোটা অঙ্কের কর পরিশোধের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. যেহেতু রোমানদের ধোঁকাবাজি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাই চুক্তির সময় শর্ত করে দিলেন যে, জামানতস্বরূপ রোমানরা তাদের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে বন্ধক রাখবে। চুক্তি অনুযায়ী রোম সম্রাট তার কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়। বা'লাবাক্কা শহরের দুর্গে তাদেরকে বন্দি করে রাখা হয়।

এ সন্ধি দু'বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু রোমানদের তাদের চিরাচরিত স্বভাব অনুসারে দু'বছর পর বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে। হজরত মুয়াবিয়া রা. চাইলে এর জবাবে তাদের জামানতে রাখা লোকদের হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার সভাসদদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, কায়সারের ভুলের বদলায় এ নিরপরাধ লোকদের হত্যা করা জায়েজ হবে না। তিনি একটি ঐতিহাসিক বাক্য উচ্চারণ করে সেই লোকগুলোকে সম্পূর্ণ নিরাপদে মুক্ত করে দিলেন যে,

وفاء بغدر خير من غدر بغدر

বিশ্বাসঘাতকতার বদলা বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে বিশ্বাসঘাতকতার বদলায় বিশ্বস্ততা বজায় রাখাই উত্তম।[৩৫৫]

---

[৩৫৫] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ১৫৯, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৬

রোমানদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান

হিজরি ৪৩ সনে হজরত মুয়াবিয়া রা. রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। তারপর তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছেন। আর এজন্য তিনি শীত ও গ্রীষ্ম দুই ঋতুর জন্য আলাদা আলাদা বাহিনী প্রস্তুত করেন। এরা সব সময় রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে প্রস্তুত থাকত। এটি ছিল মুয়াবিয়া রা. এর এক অভিনব কৌশল। শামের উত্তর সীমান্তে এশিয়া মাইনরে (বর্তমান তুরস্ক) এ বাহিনী ছাউনি স্থাপন করে থাকত। এ এলাকার কিছু অংশ মুসলমানদের আর কিছু অংশ রোমানদের দখলে ছিল।

এ বিশেষ বাহিনী ছাড়াও হজরত মুয়াবিয়া সমুদ্র অভিযানের জন্য আলাদা বাহিনী গঠন করেছিলেন, যারা শাম ও আফ্রিকার সীমান্তে রোমান নৌবাহিনীর মোকাবেলায় ব্যস্ত থাকত। যেহেতু এশিয়া মাইনরের রণাঙ্গনে শীতের মৌসুমটি ছিল অত্যন্ত কঠিন সময়, তাই ঐতিহাসিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল সেই বাহিনীর বিবরণই তুলে ধরেছেন, যারা শীতকালের জন্য বিশেষভাবে প্রেরিত হয়েছিল।

শীতকালীন অভিযান

শীতকালের জন্য সর্বপ্রথম আলাদা বাহিনী গঠন করা হয় হিজরি ৪৩ সনে। সেনাপতি ছিলেন হজরত বুসর বিন আরতাত রা.। এ বাহিনী কনস্টান্টিনোপল উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। পুরো শীতকাল এরা রণাঙ্গনে কাটিয়েছিল।[৩৫৬]

৪৩ ও ৪৫ হিজরিতে শীতকালীন বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হয় হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. এর সুযোগ্য পুত্র হজরত আবদুর রহমান রা. এর হাতে। তিনি বাহিনী নিয়ে রোমানদের মোকাবেলা করেন।[৩৫৭]

---

[৩৫৬] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২৯৬, তারিখে ইবনে খালদুন : ৩/১১

[৩৫৭] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৭

তারপর হিজরি ৪৭-৪৯ সন পর্যন্ত কয়েকটি শীত মৌসুমে এশিয়া মাইনর ও এন্তাকিয়ার রণাঙ্গনে মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন হজরত মালেক বিন হুবাইর এবং হজরত আবদুর রহমান আল-কিনি রহ.।[৩৫৮]

একবার হজরত ইয়াজিদ বিন শাজারা আর-রুহাবিও শীতকালীন বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেছিলেন।[৩৫৯]

জিহাদের উদ্দেশ্যে অভিযাত্রাকারী এ বিরাট বাহিনী সীমান্ত এলাকায় গিয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যেত। অত্যন্ত দ্রুতগামী ঘোড়া দিয়ে ৪০-৫০ জন মুজাহিদ নিয়ে এক একটি দল তৈরি করা হতো। এমনই একটি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হজরত উবায়দা বিন কায়েস কিলাবি রহ.। তিনি তার বাহিনী নিয়ে 'শুমাসা' নামক দুর্গ জয় করেছিলেন। সেখান থেকে প্রত্যেক মুজাহিদ দুই শত দিনার গনিমত লাভ করেছিলেন।

তারই নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপলের উপকূলে আরো একটি দুর্গ বিজিত হয়েছিল, যার নাম ছিল মুদুন।[৩৬০]

জারির বিন আবদুল্লাহ রা. এর শীতকালীন অভিযান ও প্রত্যাবর্তন

একবার প্রসিদ্ধ সাহাবি হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালি রা.-ও রোমানদের বিরুদ্ধে শীতকালীন বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেছিলেন। কিন্তু অসহনীয় ঠান্ডাকে মুজাহিদ বাহিনীর জন্য ক্ষতিকর মনে করে তিনি দ্রুত রণাঙ্গন থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।

হজরত মুয়াবিয়া রা. যখন তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নবীর একটি বাণীকে আমার সম্মুখে রেখেছিলাম। নবীজি বলেছেন, 'যে মানুষের উপর দয়া করে না, আল্লাহ তার উপর দয়া করেন না।'

---

[৩৫৮] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০৮, ২০৯

[৩৫৯] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২২৩, তারিখে ইবনে খালদুন : ৩/১১
নোট : তারিখে ইবনে খালদুনের কোনো কোনো মুদ্রণে এখানে লেখা হয়েছে ইয়াজিদ বিন সামারা। এটি লেখার ভুল।

[৩৬০] তারিখে দিমাশক : ৪০/৪৭২, আতিয়া বিন কায়েস-এর জীবনী। আরো দ্রষ্টব্য : আল মা'রিফাহ ওয়াত তারিখ : ২/৩৯৮,
নোট : 'মুদুন' দুর্গকে কোনো কিতাবে 'মাদইয়ান' আবার কোনোটিতে 'আল মাদানি'ও বলা হয়েছে। এমনিভাবে 'শুমাসা' দুর্গকে কোথাও বলা হয়েছে 'সাসমা'।

হজরত মুয়াবিয়া রা. জানতে চাইলেন, এ হাদিস কি আপনি নিজ কানে শুনেছেন?

তিনি বললেন, জি হ্যাঁ, আমি নিজ কানে শুনেছি।[৩৬১]

মোটকথা, শীতকালে অভিযানে বের হওয়া এবং রণাঙ্গনে অবস্থান করাটা ছিল অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। এমনকি অনেক সময় এটা ছিল মৃত্যুর পরীক্ষা।

গ্রীষ্মকালীন কার্যক্রম

এ সময় গ্রীষ্মকালেও রোমানদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করা হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ বিন কায়েস আল ফাযারি এবং হজরত মালেক বিন হুবাইর রহ.।[৩৬২]

তবে গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছিলেন হজরত মালেক বিন আবদুল্লাহ খাসআমি রহ.। এমনকি গ্রীষ্মকালীন বিরাট অবদানের কারণে তিনি মালিকুস সাওয়ায়েফ অর্থাৎ গ্রীষ্মকালের মালিক উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৩৬৩]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লিখেছেন, 'হজরত মুয়াবিয়া রা. রোমানদের উপর মোট ১৬টি অভিযান পরিচালনা করেন। শীত ও গ্রীষ্ম দুই ঋতুর জন্য পৃথক পৃথক বাহিনী পালাক্রমে রোমানদের মোকাবেলার জন্য গমন করত।

রোমকদের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্য

এইসব অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজের সীমান্ত রক্ষা করা, শত্রুদের উপর চাপ সৃষ্টি করা, অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং তাদের শক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

---

[৩৬১] তারিখে ইবনে খালদুন : ৩/১১

[৩৬২] উসদুল গাবাহ : ৫/২৮, আল ইসাবাহ : ৫/৫৪১, ৫৪২, মালেক বিন আবদুল্লাহ বিন সিনান আল খাসআমির জীবনী।

[৩৬৩] মুসনাদে হুমাইদি : ২/৩৫২, জারির বিন আবদুল্লাহ রা. র জীবনী।

জীবনসায়াহ্নে হজরত মুয়াবিয়া রা. আপন পুত্র ইয়াজিদকে সর্বশেষ যে অসিয়তটি করেছিলেন, তা এই- 'রোমকদের টুটি চেপে ধরো'।[৩৬৪]

কনস্টান্টিনোপলের উপর চূড়ান্ত হামলা

হজরত মুয়াবিয়া রা. আট বছর পর্যন্ত ঝটিকা হামলার কৌশল অবলম্বন করার পর অবশেষে ৫০ হিজরিতে রোমকদের ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল কনস্টান্টিনোপলের উপর চূড়ান্ত হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।[৩৬৫] এ উদ্দেশ্যে তিনি নিজের ২৪ বছরের পুত্র ইয়াজিদকে বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নির্ধারণ করেন।[৩৬৬] আর হজরত আবদুর রহমান বিন খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. স্বেচ্ছাসেবকদের, উকবা বিন আমের রা. মিসরি বাহিনীর এবং হজরত ফাজালা বিন উবাইদ রা. শামের বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৩৬৭]

ইয়াজিদের নেতৃত্বের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মনোভাব

কিন্তু এ অভিযানের পূর্বে ইয়াজিদ কোনোদিন কোনো ক্ষুদ্র লড়াইতেও কোনো বিজয় অর্জন করেনি। তাই হঠাৎ করেই এমন গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের নেতৃত্ব তার হাতে ন্যস্ত করা এবং বহু প্রখ্যাত সেনাপতি ও প্রবীণ সাহাবির ইয়াজিদের অধীনস্থরূপে বাহিনীতে থাকা- এ দুটি বিষয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে ভালো লাগেনি। বিশেষত এজন্য যে, ইলম ও মর্যাদা এবং সততা ও তাকওয়ার মাপকাঠিতেও ইয়াজিদ অনেক পিছিয়ে ছিল।

কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের ইখলাস ও আন্তরিকতা এবং বিনয় ও আনুগত্যের অবস্থা এই ছিল যে, এ বিষয়-দুটিকে তারা একেবারেই আলোচনায় আনলেন না। যাদের অন্তরে একটু অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল,

---

[৩৬৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৪৩৫

[৩৬৫] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২১১। তারিখে তাবারিতে এ যুদ্ধের তারিখ ৪৯ হিজরি এবং কোনো কিতাবে ৫২ হিজরিও বলা হয়েছে। তবে বিভিন্ন ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় ৫০ হিজরি অগ্রগণ্য।

[৩৬৬] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৩৫২৩, উসদুল গাবাহ : ২/১২১, হজরত খালেদ বিন যায়েদ বিন কুলাইব (আবু আইয়ুব আনসারি)

[৩৬৭] আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, হাদিস : ১৭৯২৫, ১৮০৬০, ১৮১৯৫

তারাও এর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না। বরং নিজের অসন্তোষের জন্য তাওবা ও ইসতিগফার করে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইমাম সারাখসি রহ. লিখেছেন, "মুহাম্মদ বিন সিরিন রহ. থেকে বর্ণিত আছে, যখন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়াকে বাহিনীর আমির বানানো হলো, তখন হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. এর ভালো লাগেনি তার সাথে জিহাদে গমন করাটা। কিন্তু পরে তিনি এজন্য বেশ অনুতপ্ত হয়েছেন এবং তার সাথেই জিহাদে শরিক হয়েছেন"।[৩৬৮]

এ অভিযানের সময় হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও জিহাদের জন্য বের হতে প্রস্তুত ছিলেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

انفروا خفافا وثقالا

স্বচ্ছন্দে হোক বা দুঃখ-কষ্টে, জিহাদের জন্য বের হও।

আমি তো এই দুই অবস্থার কোনো একটিতেই আছি।[৩৬৯]

বড় বড় সাহাবি ও বিশিষ্ট তাবেয়িগণ এ অভিযানে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাদের মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৭০]

---

[৩৬৮]

عن محمد بن سيرين قال: استعمل يزيد بن معاوية على جيش فكره ابو ايوب الانصارى الخروج معه ثم ندم ندامة شديدة فغزا معه. (شرح السير الكبير للسرخسى: ٢٣٥/٢ باب الشهيد وما يصنع به)

[৩৬৯] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৫৯৩০

[৩৭০] তারিখুত তাবারি : ৫/২৩২

নোট : **হজরত হুসাইন রা. কি কনস্টান্টিনোপলের জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন?** প্রসিদ্ধ আছে যে, হজরত হুসাইন রা. কনস্টান্টিনোপলের জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রাচীন হাদিসের গ্রন্থাদি, কিংবা ইতিহাস ও তাবাকাতের কিতাবে কোথাও একথা উল্লেখ নেই। কথাটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন হাফেজ ইবনে কাসির রহ. অষ্টম শতাব্দীতে এবং তাও আবার সনদ ছাড়া। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৪৭৭)

এ বাহিনী রওনা করার পর হজরত মুয়াবিয়া রা. একটি বাহিনী দিয়ে হজরত সুফিয়ান বিন আওফ রা. কে রোম সাম্রাজ্য তথা এশিয়া মাইনরে রোমানদের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন এবং তাদেরকে জোর দিয়ে বলেন, তারা যেন তুওয়ানা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। হয়তো এ বাহিনী পাঠিয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর উদ্দেশ্য ছিল রোমানদেরকে ব্যস্ত রাখা, যাতে তারা কনস্টান্টিনোপল অভিমুখী বাহিনীর গতিরোধ করতে না পারে।

হজরত সুফিয়ান বিন আওফ রা. এর বাহিনী এশিয়া মাইনরে ফারকাদুনা পর্যন্ত চলে যায়। সেখানে পরিবেশ ও আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল। ফলে মুজাহিদ বাহিনী অনাহার, চর্মরোগ ও অন্যান্য বিপদে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।[৩৭১] তবু কনস্টান্টিনোপলের বাহিনী ফিরে আসা পর্যন্ত হজরত সুফিয়ান বিন আওফ রা. সেখানেই অবস্থান করেন এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তখন তার স্থলে হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসআদ আল ফাযারি রা. বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন।[৩৭২]

কনস্টান্টিনোপলের বাহিনীর কার্যবিবরণী

কয়েক মাসের পথ অতিক্রম করে কনস্টান্টিনোপল অভিমুখী বাহিনী এশিয়া মাইনর পাড়ি দিয়ে কনস্টান্টিনোপলের উপকূলে গিয়ে পৌঁছল। পথিমধ্যে হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া এসে তার খোঁজ-খবর নিলেন এবং বললেন, আপনার কোনো প্রয়োজন আছে কি?

সুতরাং সনদের বিচারে এ বিষয়টি ভিত্তিহীন। হতে পারে এটি একটি বানোয়াট কথা। কেননা হজরত হুসাইনের জন্য ইয়াজিদের অধীনে জিহাদে যাওয়া যদি কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা হতো, তাহলে প্রথম অথবা দ্বিতীয় যুগের কোনো না কোনো বর্ণনাকারী অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। অথচ বহু অনুসন্ধানের পরও এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

[৩৭১] তারিখে দিমাশক : ৬৫/৪০৫, তারিখে ইয়াকুবি, পৃষ্ঠা : ২০০

[৩৭২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/২৩৫, ৫২ হিজরির ঘটনাবলি।

তিনি বললেন, আমি যদি মারা যাই, তা হলে আমাকে গোসল ও কাফন পরিয়ে যতটা সম্ভব শত্রুর সীমানার মধ্যে নিয়ে যাবে। তারপর মানুষকে আদেশ করবে, যেন আমাকে সেখানে দাফন করে।[৩৭৩]

ইমাম সারাখসি রহ. বলেন, হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. এ অসিয়ত এজন্য করেছিলেন যে, তিনি দুশমনের নিকট থেকে অতি নিকটে গিয়ে জিহাদের অধিক থেকে অধিকতর সাওয়াব অর্জন করতে চাচ্ছিলেন।[৩৭৪]

অবশেষে মুসলমানরা কনস্টান্টিনোপল-প্রণালি অতিক্রম করে রোমকদের এ অজেয় ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাল। দুই বাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই হলো। হজরত আবদুল আজিজ বিন যুরারা রহ. প্রতিদিন শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে যেতেন। কিন্তু দিন শেষে গাজি হয়ে ফিরে আসতেন আর শাহাদাত না পাওয়ার জন্য বেদনাবিধুর কবিতা পাঠ করতেন। এভাবে একদিন যুদ্ধ চলাকালে তিনি রোমান সৈন্যদের কাতারে ঢুকে পড়লেন এবং লাশের স্তূপ করে ফেললেন। কিন্তু এক সময় রোমকরা চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরে। তারপর বর্শার আঘাতে তাকে শহিদ করে দেয়।

হজরত মুয়াবিয়া রা. যখন তার শাহাদাতের সংবাদ শুনলেন, তখন খুব ব্যথিত হলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, আরবদের যুবক যিনি ছিলেন, তিনি চলে গেলেন।

একথা শুনে হজরত আবদুল আজিজের বাবা জানতে চাইলেন, কে? আমার পুত্র নাকি তোমার?

হজরত মুয়াবিয়া বললেন, তোমার।

---

[৩৭৩] শরহুস সিয়ারিল কাবির লিস সারাখসি : ২/২৩৫, বাবুশ শহিদ ওয়া মা ইউসনাউ বিহি, উসদুল গাবাহ : ২/১২১

[৩৭৪] শরহুস সিয়ারিল কাবির লিস সারাখসি : ২/২৩৫, বাবুশ শহিদ ওয়া মা ইউসনাউ বিহি।

বাবা বললেন, প্রতিটি যুবককেই তো একদিন মৃত্যুর পেয়ালায় চুমুক দিতে হবে, যৌবনে হোক, কিংবা বার্ধক্যে।[৩৭৫]

কনস্টান্টিনোপলের সম্মুখে খোলা ময়দানেও যুদ্ধ হয়েছে। একদিন রোমানদের এক বাহিনী অনেক দীর্ঘ একটি সারি তৈরি করে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হলো। সেখানে মুসলমানদের নেতৃত্বে ছিলেন হজরত আবদুর রহমান বিন খালেদ রা.। অন্যদিকে মিসরের বাহিনীর আমির ছিলেন হজরত উকবা বিন আমের আল জুহানি রা. এবং শামের বাহিনীর আমির ছিলেন হজরত ফাজালা বিন উবায়েদ রা.।

রোমকদের উক্ত সারির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মুসলমানদেরও এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করা হলো। উভয় দল মুখোমুখি হতেই এক মুজাহিদ একাকী শত্রুদের কাতারের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার সাথি তাকে বাধা দেওয়ার জন্য চিৎকার করে বলতে লাগল, 'না, না, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। কিন্তু সে কোনো ভ্রুক্ষেপ করল না। বীরত্বের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন রেখে অল্প সময়ের মধ্যেই আবার আপন স্থানে ফিরে এলো।

তার অবস্থা দেখে লোকেরা অবাক হয়ে বলতে লাগল, এটা তো নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করার নামান্তর। এর পক্ষে তারা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করল-

ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিপতিত করো না।

পরে এ ঘটনা যখন হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. শুনলেন, তখন উক্ত আয়াতের সঠিক মর্ম বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'প্রিয় ভাইয়েরা, এ আয়াত তো আমাদের আনসারদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা যখন তার দীনের সাহায্য করলেন, ইসলামকে বিজয়দান করলেন, তখন আমরা গোপনে গোপনে পরামর্শ করলাম, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সব নষ্ট হয়ে গেছে। তাই চলো, এবার নিজেদের ধনসম্পদের খবর নিই, উন্নত করি। হতে পারে আল্লাহ তায়ালা আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন। তখন এ আয়াত নাজিল হলো। অর্থাৎ

---

[৩৭৫] আল কামিল ফিত তারিখ : ৪৯ হিজরির আলোচনা।

নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করার অর্থ ছিল আমরা জিহাদ ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ার ব্যস্ততায় মগ্ন হয়ে যাবো'।[৩৭৬]

এ রণাঙ্গনেই কিছুদিনের মাথায় হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. এর ইনতেকাল হয়।

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. ইমাম আহমাদ বিন হামবল রহ. এর সনদে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. এর প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত, বাহিনীর আমির ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া তখন তার সাক্ষাতে গেলেন। হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. বললেন, উম্মতের লোকদেরকে আমার সালাম বলবেন। আমি আল্লাহর নবী থেকে একটি হাদিস শুনেছি, যদি আমার অবস্থা এমন না হতো, তা হলে কখনোই তা বলতাম না। হাদিসটি হলো, নবীজি বলেছেন, যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যাবে যে, সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর নবী থেকে একটি হাদিস শুনেছি, যেটি এতদিন পর্যন্ত তোমার্দের থেকে গোপন করে আসছি। নবীজি বলেছেন, তোমরা যদি গুনাহ না করো, তা হলে আল্লাহ এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহও করবে এবং আল্লাহ তাদের ক্ষমাও করবেন'।[৩৭৭]

এরপর হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. এর মৃত্যু হয়ে যায়। ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া তার জানাজার নামাজ পড়ায়।[৩৭৮]

মুসলমান হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. এর অসিয়ত অনুযায়ী রাতের আঁধারে তার পবিত্র দেহ নিয়ে শত্রুদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। ধীরে ধীরে তারা কনস্টান্টিনোপলের গগণচুম্বী প্রাচীরের

---

[৩৭৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২৫১২, কিতাবুল জিহাদ, আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, হাদিস : ১৭৯২৫

[৩৭৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/২৫৩; হাফেজ ইবনে কাসির রহ. বলেন, আমার ধারণায় এটি এবং আগের হাদিসটি ইয়াজিদকে এক রকম 'ইরজা' (গুনাহ মাফের অতিমাত্রিক আশায়) লিপ্ত করার কারণ হয়েছিল। এ কারণেই সে এমন কিছু কাজ করেছিল, যার ফলে সমালোচিত হয়েছে।

[৩৭৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/২৫২

কাছে পৌঁছে যায়। তারপর অতি গোপনে সেখানে তাকে দাফন করে চলে আসে।

দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. এর কবর থেকে একটি আলোর ফোয়ারা বেরিয়ে আসমান পর্যন্ত উঠে যায়। রোমান সৈন্যরাও এ আশ্চর্য দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়। পরদিন তাদের দূত এসে জানতে চায়, এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমরা রাতে দাফন করে এসেছ?

উত্তরে বলা হয়, তিনি আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি।

হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. এর এ কারামাত দেখে বহু রোমান ইসলাম গ্রহণ করে।[৩৭৯] তারপর থেকে আবু আইয়ুব আনসারি রা. এর প্রতি রোমানদের এমন ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মে যে, কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত তারা তার কবরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে গেছে। এমনকি দুর্ভিক্ষের সময় তারা এখানে এসে প্রার্থনাও করত।[৩৮০]

মুসলমানরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে রাখে। কিন্তু কোনো ফল দেখা যায় না। অবশেষে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া সৈন্য নিয়ে ফিরে যায়।[৩৮১]

---

[৩৭৯] শরহুস সিয়ারিল কাবির লিস সারাখসি : ১/২৩৫

[৩৮০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/২৫৪

[৩৮১] তারিখে ইবনে খালদুন : ৩/১১

এশিয়া মাইনরের গুরুত্বপূর্ণ বিজয়সমূহ

এরপরও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পক্ষ থেকে শীত ও গ্রীষ্মকালে রোম সীমান্তে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। ৫৩ হিজরিতে হজরত আবদুর রহমান বিন উম্মুল হাকাম, ৫৪ হিজরিতে হজরত মুহাম্মদ বিন মালেক, ৫৬ হিজরিতে হজরত মাসউদ বিন আবু মাসউদ, ৫৭ হিজরিতে হজরত আবদুল্লাহ বিন কায়েস, ৫৮ হিজরিতে হজরত মালেক বিন আবদুল্লাহ খাসআমি এবং ৫৯ হিজরিতে হজরত আমর বিন মুররা আল মুহরি রহ. এসব অভিযানের নেতৃত্ব দান করেন।[৩৮২]

এসব অভিযানে এশিয়া মাইনরের কোনো কোনো দুর্গ রীতিমতো জয় করে সেখানে মুসলমানদের সীমান্ত চৌকিও নির্মাণ করা হয়। তন্মধ্যে এশিয়া মাইনরের এক প্রাচীন রোমান দুর্গ 'কায়সারিয়া' (এটি শামের কায়সারিয়া নয়) কে সাত বছর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখা হয়। এ দুর্গে ১ লক্ষ রোমান, ১ লক্ষ ইহুদি এবং ৩০ হাজার সামেরি বসবাস করত। হজরত আমর বিন তামিম এ অভিযানের নেতৃত্ব দান করেছিলেন। সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর মুসলমানরা বিজয় সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। এমন সময় বাহিনীর আমির এক গোপন সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়ে যান, যা দিয়ে উষ্ট্রারোহী ব্যক্তিও চলে যেতে পারে।

মুসলিম সেনাদল সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে দুর্গের ভেতর প্রবেশ করল। হজরত আমর বিন তামিম দুর্গের মিনারে আরোহণ করে ঘোষণা করে দিলেন, 'শুনে রাখ, কায়সারিয়া বিজয় হয়ে গেছে'।

এ ঘোষণা শুনে লোকেরা অস্ত্র ফেলে দিল। দুর্গের চূড়ায় ইসলামের পতাকা ওড়ানো হলো।[৩৮৩]

---

[৩৮২] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, ৫৩-৫৯ হিজরি, পৃষ্ঠা : ২১৯-২২৬

[৩৮৩] মু'জামুল বুলদান : ৪/৪২১, ৪২২

তারপর হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে ৫৯ হিজরিতে রোম সীমান্তের আরেক গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ 'কামুখ' বিজিত হয়। এ দুর্গের বিজয়ে এক মুজাহিদের প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার অবদানের কথা ভোলার মতো নয়। কেননা তিনি শত্রুদের তির ও পাথরের বৃষ্টির মধ্য দিয়ে একাকী ছুটে গিয়ে দুর্গের প্রাচীরে আরোহণ করেছিলেন এবং একাই সেখানে লড়াই করে শত্রুসৈন্যদের হটিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যরা দুর্গে প্রবেশ করে।[৩৮৪]

এসব অভিযানে বড় বড় আলেম ও কারিগণও অংশগ্রহণ করতেন এবং জিহাদের ময়দানেও তারা কুরআন ও হাদিসের পঠন-পাঠনের ধারা অব্যাহত রাখতেন।[৩৮৫]

---

[৩৮৪] আল কামিল ফিত তারিখ, ৫৯ হিজরি।

[৩৮৫] তারিখে দিমাশক : ৪০/৪৭৩, ৪৭৪, আতিয়া বিন কায়েস রহ. এর জীবনী, ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ২৩৩

রোম উপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে অভিযান

কনস্টান্টিনোপলের উপর হামলা ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা থেকে হজরত মুয়াবিয়া রা. বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ দুর্ভেদ্য ঘাঁটি জয় করতে হলে আশপাশের সমুদ্র পথ ও গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা জরুরি। তাই ৫২ হিজরিতে কনস্টান্টিনোপলের বাহিনী ফিরে যাওয়ার পরের বছরই হজরত মুয়াবিয়া রা. রোম উপসাগরের ইউরোপিয়ান দ্বীপপুঞ্জ দখলের অভিযান শুরু করেন। অবশ্য এ অভিযানের একটি উদ্দেশ্য এও ছিল যে, শামের সীমান্তকে সেইসব বহিরাগত আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখা, যা পরিচালনা করা হতো এসব দ্বীপ থেকে।

এ বিশেষ নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন হজরত জুনাদা বিন উমাইয়া রা.। তিনি ছিলেন অতুলনীয় এক জাহাজ-নির্মাতা। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি সর্বপ্রথম আক্রমণ চালান রোমানদের শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি রোডস দ্বীপে। প্রায় ষাট বর্গমাইলব্যাপী (৯৬ কিলোমিটার) এবং সবুজ-শ্যামলিমায় ভরা এ বিরাট দ্বীপটি এশিয়া মাইনরের (তুর্কি) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে আঙুর, যাইতুন ও অন্যান্য ফলের উৎপাদন হয়ে থাকে।

হজরত জুনাদা বিন উমাইয়া রা. হিজরি ৫৩ সনে এ দ্বীপে আক্রমণ করেন এবং বিজয়লাভ করেন। তারপর তিনি সেখানে একটি শক্তিশালী দুর্গে মুসলমানদের সেনাছাউনি প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানরা এখান থেকে রোম উপসাগরে ইউরোপিয়ান সামুদ্রিক কাফেলাগুলোর উপর নজরদারি করত। পুরো এলাকায় মুসলমানদের গুপ্তচর ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা শত্রুদের প্রতিটি নড়াচড়া সম্পর্কে অবগত করত। শত্রুদের কোনো জাহাজ যখনই সমুদ্র অতিক্রম করত, মুসলমানরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং সৈন্য ও সম্পদ সব লুট করে নিত। হাফেজ ইবনে কাসিরের উক্তি অনুযায়ী كانوا اشد شيئ على الكفار (এ বাহিনী কাফেরদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কঠোর ছিল)।[৩৮৬]

---

[৩৮৬] আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া : ১১/২৫৯, ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ২৩৩

পরবর্তী বছর হজরত জুনাদা বিন উমাইয়া রা. 'আরওয়াড' দ্বীপেও আক্রমণ চালান এবং জয় করে নেন। এখানে জিহাদকারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কারি হজরত মুজাহিদ বিন হুবাইর আল মুকরিও ছিলেন। তিনি এখানে পবিত্র কুরআন শিক্ষার ধারাবাহিকতা চালু করেন। তার প্রসিদ্ধ ছাত্র কারি তুবাই বিন আমের (হজরত কা'ব আহবার রহ. এর সৎপুত্র) এখানেই তার কাছে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন।[৩৮৭]

তারপর হিজরি ৫৫ সনে হজরত জুনাদা বিন উমাইয়া রা. আকরিতাশ (ক্রেট) দ্বীপে আক্রমণ চালান। তবে এখানে জয়লাভ করতে সক্ষম হননি।[৩৮৮]

এসব অভিযান চালাকালে সিসিলি ও মাহদিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত কাওসারা নামক দুর্গটিও বিজিত হয়। এমনই এক নৌবহরের নেতৃত্ব প্রদানকালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইয়াজিদ বিন শাজারা রা. শাহাদাত বরণ করেন।[৩৮৯]

এ ধরনের কয়েকটি অভিযানে হজরত আমর বিন ইয়াজিদ জুহানিও নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন।[৩৯০]

হজরত উমর ও মুয়াবিয়া রা. চীন ও ইথিওপিয়ায় হামলা করলেন না কেন?

মজার বিষয় হলো, হজরত উমর ফারুক রা. এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. খোরাসান, হিন্দুস্থান, মধ্যএশিয়া, আফ্রিকা, রোম উপসাগর এবং এশিয়া মাইনরে অভিযানের সীমানা বেশ প্রসারিত করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর পূর্বদিকে তুর্কিদের মূল ভূখণ্ড চীনে এবং পশ্চিমদিকে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল ইথিওপিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করেননি। এর কারণ কী?

- এর একটি কারণ ছিল আল্লাহর নবীর এ হাদিস :

---

[৩৮৭] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ২৩৩, মু'জামুল বুলদান : ১/১৬২

[৩৮৮] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ২৩৩, মু'জামুল বুলদান : ১/১৬২

[৩৮৯] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/৪৪৬, তারিখে দিমাশক : ৬৫/২২৪, ইয়াজিদ বিন শাজারার জীবনী।

[৩৯০] আল কামিল ফিত তারিখ, ৫৯ হিজরি।

اتركوا الترك ما تركوكم

অর্থাৎ তুর্কিরা যতদিন তোমাদের সাথে না জড়াবে, ততদিন তোমরাও তাদের সাথে জড়াবে না।[৩৯১]

একইভাবে অপর এক বর্ণনায় এসেছে :

اتركوا الحبشة ما تركوكم

হাবশিরা যতদিন তোমাদের সাথে না জড়াবে, ততদিন তোমরাও তাদের সাথে জড়াবে না।[৩৯২]

মূলত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হয়েছিল, কেয়ামতের পূর্বে এসব জাতির হাতে মুসলমানদের উপর ভীষণ বিপদ চেপে আসবে। তাই নবীজি সতর্কতা ও স্নেহপরবশ হয়ে বিনাপ্রয়োজনে এসব জাতির সাথে যুদ্ধে জড়াতে নিষেধ করেছেন। একারণেই হজরত উমর ফারুক রা. এদিকে কোনো বাহিনী প্রেরণ করেননি।

- এসব দেশে সৈন্য প্রেরণ না করার আরেকটি বড় কারণ ছিল, সে সময় রোমের সাথে যুদ্ধ চলছিল। তাই চীনে অথবা মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করার অর্থ ছিল উত্তর আফ্রিকা ও রোম উপসাগর থেকে সৈন্য কমিয়ে আনা। অথচ এটা ছিল নিশ্চিত বিপজ্জনক।

একারণেই হজরত মুয়াবিয়া রা. বলতেন, 'এই দুই নিদ্রাচ্ছন্ন জাতিকে জাগাবে না'।[৩৯৩]

এর থেকে এ শিক্ষাও লাভ করা যায় যে, অকারণে এমন শত্রুর সাথে যুদ্ধে জড়ানো উচিত নয়, যাকে বশে আনা কঠিন।

শামবাসীর জিহাদের আলোচনা হাদিসে

শামবাসীদের জিহাদ ও বিজয়াভিযানের প্রতি হাদিস শরিফেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন : একদিন হজরত মুয়াবিয়া রা. এ হাদিস

---

[৩৯১] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৩০২, কিতাবুল মালাহিম, বাবুন নাহয়ি আনিত তাহাইয়ুজে আত্ তুরকা ও ওয়াল হাবাশা।

[৩৯২] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৩০৯

[৩৯৩] لا تبعثوا الرابضين (معجم البلدان: ٢/٢٣)

শোনাচ্ছিলেন যে, নবীজি বলেছেন, 'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর আদেশের উপর অবিচল থাকবে। যারা তাদের সঙ্গে থাকবে না, অথবা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি এক সময় আল্লাহর সিদ্ধান্ত এসে পড়বে আর তখন তারা মানুষের উপর বিজয় লাভ করবে'।

একথা শুনে মালেক বিন মুখামির সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আমি হজরত মুআজ বিন জাবালকে বলতে শুনেছি, এরা হবে শামের অধিবাসী।

এ ব্যাখ্যা শুনে হজরত মুয়াবিয়া রা. অত্যন্ত আনন্দিত হন।[৩৯৪]

এসব অভিযান কি ডাকাতি ছিল?

হজরত উসমান রা. এর যুগ থেকে শুরু করে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমানরা হিন্দুস্থান, আফ্রিকা ও রোম উপসাগরে যেসব অভিযান পরিচালনা করেছে, তার অধিকাংশের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামকে রীতিমতো পরাজিত করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং অধিকাংশই ছিল ঝটিকা হামলা, যার দ্বারা শত্রুদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করা উদ্দেশ্য ছিল। পাশাপাশি তাদের শক্তির পরিমাপ করা, তাদের ভূখণ্ডের উত্থান-পতন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং গনিমতের সম্পদ অর্জন করা। আর এজাতীয় অভিযানের ফল পরবর্তীতে পৃথক ও সম্পূর্ণ বিজয়রূপে অর্জিত হতে থাকে।

প্রাচ্যবিদরা এসব অভিযানকে লুটতরাজ ও ডাকাতি বলে আখ্যায়িত করে থাকে। অথচ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অপব্যাখ্যা। ইতিহাস সাক্ষী, তৎকালীন সময়ে মুসলমানদের সাথে রোমান ও অন্যান্য জাতির মধ্যে সর্বদাই সামরিক বিরোধ লেগে থাকত। কখনো দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, আবার কখনো সভ্যতা ও সংস্কৃতির কারণে। (যতক্ষণ পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে কোনো চুক্তি না হতো, ততক্ষণ পর্যন্ত) উভয় পক্ষই অপর পক্ষকে হয়রানি ও কোণঠাসা করার পূর্ণ চেষ্টা করত। সুতরাং মুসলমানরা যেমনিভাবে রোমান, আফ্রিকান ও হিন্দুস্থানিদের ভূখণ্ডে হামলা করেছে, তেমনি এরাও দুদিন পরপরই ইসলামি ভূখণ্ডের সীমান্তে আক্রমণ চালিয়েছে।

---

[৩৯৪] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৯৩২

কয়েকটি আশ্চর্যজনক ঘটনা

- হজরত মুয়াবিয়া রা. এর যুগের একটি আশ্চর্য ঘটনা এই যে, একবার ইয়েমেনে থাকাকালে হজরত আবদুল্লাহ বিন কুলাবা রা. এর উট হারিয়ে গেল। তিনি উটের তালাশে একটি বনের মধ্যে ঘুরছিলেন। হঠাৎ তার সম্মুখে একটি শহরের মতো জায়গা দৃশ্যমান হলো। আসলে সেটি ছিল শাদ্দাদের কৃত্রিম জান্নাত। হজরত আবদুল্লাহ বিন কুলাবা সেখান থেকে কিছু মেশক, জাফরান এবং মণিমুক্তা উঠিয়ে নিলেন। তারপর যখন তিনি ফিরে চললেন, তখন শহরটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

  হজরত আবদুল্লাহ বিন কুলাবা রা. এই ঘটনা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে গিয়ে বর্ণনা করলেন। হজরত মুয়াবিয়া রা. তখন হজরত কা'ব আহবার রা. কে ডেকে এ আশ্চর্য ঘটনার রহস্য সম্পর্কে জানতে চাইলেন। হজরত কা'ব আহবার রা. বললেন, এটি ছিল শাদ্দাদের বানানো জান্নাত 'ইরাম'। আপনার শাসনামলে এক খর্বকায় ও লাল বর্ণের ব্যক্তি এটি দেখতে পাবে। লোকটির গালে ও ভ্রুতে তিল থাকবে এবং সে তার হারানো উট খুঁজতে বের হবে।

  একথা বলে হজরত কা'ব আহবার রা. পাশ ফিরে তাকাতেই হজরত আবদুল্লাহ বিন কুলাবার প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, 'আল্লার কসম, উনিই সেই ব্যক্তি।'[৩৯৫]

- একবার রোম সম্রাট তার দেশ থেকে দুজন লোক পাঠাল, যাদের একজন ছিল রোমের সবচেয়ে শক্তিশালী পালোয়ান, অপরজন ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ দেহের অধিকারী। এদেরকে পাঠিয়ে রোম সম্রাট হজরত মুয়াবিয়া রা. কে চ্যালেঞ্জ করল যে, আপনি যদি আপনার

---

[৩৯৫] তাফসিরে কুরতুবি : ২০/৪৭, তাফসিরুর রাযি, সুরাতুল ফাজর; সনদের বিচারে এ বর্ণনাটি দুর্বল। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ বিন কুলাবা অপরিচিত এবং সনদের একজন রাবি ইবনে লাহিআ।

দেশ থেকে এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং অধিক দীর্ঘকায় দুজন দেখাতে পারেন, তা হলে তো ঠিক আছে। নতুবা আপনাকে আমাদের সাথে তিন বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখতে হবে।

ঐ দুজন যখন দামেশকে এলো, তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. তাদের মোকাবেলা করার জন্য হজরত আলি রা. এর পুত্র হজরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া রহ. কে এবং হজরত আলি রা. এর দলের সাবেক সেনাপতি হজরত কায়েস বিন সা'দ রা. কে ডাকলেন। হজরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া রহ. ছিলেন তৎকালীন আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি, আর কায়েস বিন সা'দ রা. ছিলেন সবচেয়ে দীর্ঘ দেহের অধিকারী।

প্রথমে রোমের পালোয়ানের সাথে হজরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া রহ. শক্তিপরীক্ষা শুরু হলো। নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী আগে হজরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া রহ. মাটিতে বসলেন। রোমান পালোয়ান তার হাত ধরে তাকে ওঠানোর জন্য চেষ্টা শুরু করল। কিন্তু পূর্ণ শক্তিপ্রয়োগ করেও সে হজরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া রহ.কে বিন্দুমাত্র নড়াতে পারল না।

তারপর হজরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া উঠলেন, রোমি পালোয়ান বসল। এবার মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া রহ. তার হাত ধরে একটা ঝটকা মেরে টান দিতেই সে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল।

তারপর রোমের দীর্ঘদেহী লোকটির সাথে হজরত কায়েস বিন সা'দ রা. এর দেহের পরিমাপ করা হলো। দেখা গেল হজরত কায়েস রা. এর দেহ তার চেয়ে উঁচু।

এভাবে রোম সম্রাটের যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল।[৩৯৬]

---

[৩৯৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৩৬০, ৩৬১, কায়েস বিন সা'দ রা. র জীবনী।

৪. শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসক জীবনের চতুর্থ ও বৃহৎ লক্ষ্য ছিল স্থায়ীভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। আর এর জন্য সবচেয়ে জরুরি ছিল সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফ নিশ্চিত করা। এ বিষয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. এতটাই সজাগ ও সতর্ক ছিলেন যে, কখনো নিজের এবং কখনো তার আমিরদের স্বার্থ, প্রয়োজন এবং কখনো মানসম্মানও তিনি বিসর্জন দিতেন কেবল ইনসাফের দাবি পূরণ করার জন্য। নিম্নের ঘটনাগুলো একথাই প্রমাণ করে।

- মদিনায় হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কিছু জমি ছিল। কিন্তু হজরত উমর ফারুক রা. এর ভাতিজা হজরত আবদুর রহমান সে জমির মালিকানা দাবি করলেন এবং দামেশকে গিয়ে তিনি হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সাথে এ বিষয়ে কথা বললেন।

  হজরত মুয়াবিয়া রা. সব শুনলেন। তারপর অত্যন্ত উদারচিত্তে বললেন, এ ব্যাপারে হজরত ফাজালা বিন উবায়েদ রা. (দামেশকের তৎকালীন কাজি) যা রায় দেবেন, আমি তা-ই মেনে নেব।

  হজরত ফাজালা বিন উবায়েদ রা. উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে হজরত আবদুর রহমানের পক্ষে রায় দিলেন। হজরত মুয়াবিয়া রা. অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিলেন এবং সেই জমির দখল ছেড়ে দিলেন।[৩৯৭]

- মদিনার গভর্নর হজরত মারওয়ান বিন হাকাম একবার হজরত বিশিষ্ট সাহাবি হজরত সুহাইব রুমি রা. এর পুত্রের ভাতা বন্ধ করে দিল। কারণ, সেই পুত্র হজরত উসমান বিরোধী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

  হজরত মুয়াবিয়া রা. যখন এ ঘটনা জানতে পারলেন, তখন মারওয়ানকে পত্র-মারফত লিখে পাঠালেন, 'তুমি হজরত উসমান রা.

---

[৩৯৭] আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি : ৫/১৩২,

এর সাথে হজরত সুহাইবের পুত্রের আচরণের প্রতি লক্ষ রেখেছ বটে; কিন্তু নবীজির সঙ্গে এই পুত্রের বাবার সম্পর্কের কথা ভুলে গেছ। সুতরাং হজরত সুহাইবের পুত্রের ভাতা চালু করে দাও। তাকে সম্মান করো এবং তার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করো।[৩৯৮]

- হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ন্যায় ও ইনসাফের ছায়া দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সমান ছিল, সে মুসলমান হোক বা বিধর্মী। দামেশকে খ্রিষ্টানদের একটি গির্জা ছিল একেবারে মসজিদের সাথে লাগানো। হজরত মুয়াবিয়া রা. সেই মসজিদটি সম্প্রসারণের জন্য গির্জার জমি ক্রয় করতে চাইলেন। কিন্তু খ্রিষ্টানরা তাতে অস্বীকৃতি জানাল। হজরত মুয়াবিয়া রা. তাদের উপর কোনো রকম চাপ প্রয়োগ করলেন না। ফলে সেই মসজিদও সম্প্রসারিত করা হলো না।[৩৯৯]

- ন্যায় ও ইনসাফের দাবি সমুন্নত করার লক্ষ্যে হজরত মুয়াবিয়া রা. বড় বড় প্রসিদ্ধ সাহাবিকে বিভিন্ন শহরের কাজির পদে সমাসীন করেন, যাদের প্রত্যেকে ছিলেন বিজ্ঞ আলেম, অভিজ্ঞ ফকিহ, দুনিয়াবিমুখ ও খোদাভীরু এবং প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার গুণে অনন্য। সেই সাথে তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল সদা সত্য বলা ও সত্য প্রতিষ্ঠা করা। দামেশকের প্রধানবিচারপতি ছিলেন হজরত ফাজালা বিন উবায়েদ রা.।[৪০০] মদিনায় কাজি ছিলেন হজরত যায়েদ বিন সাবেত রা.। বসরায় ছিলেন হজরত ইমরান বিন হুসাইন রা.। আর কুফায় হজরত উমর ফারুক রা. এর যুগ থেকেই কাজির পদ অলংকৃত করে আসছিলেন হজরত শুরাইহ রহ.।[৪০১]

কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা

হজরত উমর ফারুক রা. এর যুগে গভর্নর ও কাজি এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের যে রীতি চালু করা হয়েছিল, হজরত মুয়াবিয়া রা. তাকে সেভাবেই অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি অত্যন্ত

---

[৩৯৮] আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি : ৫/১০৮,
[৩৯৯] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ১২৯,
[৪০০] উসদুল গাবাহ : ৪/৩৪৬
[৪০১] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২২৭, ২২৮

সূক্ষ্মভাবে তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা করতেন। অধিকাংশ কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবেই সৎ ও খোদাভীরু ছিলেন। তাই সর্বদা তাদের মধ্যে আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয় জাগরূক থাকত।

একবার ফিলিস্তিনের অফিসার হজরত আবু রাশেদ আল আযদি রহ. হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হজরত মুয়াবিয়া রা. তার কাছে বিভিন্ন বিষয়ের হিসাব জানতে চাইলেন এবং কিছু কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। হজরত আবু রাশেদ হঠাৎ কেঁদে উঠলেন।

হজরত মুয়াবিয়া জানতে চাইলেন, কাঁদছেন কেন?

তিনি বললেন, আখেরাতের জিজ্ঞাসাবাদের কথা আমার মনে পড়েছে।[৪০২]

এমন ন্যায়পরায়ণ শাসক আর এমন খোদাভীরু কর্মকর্তা হলে দেশে ন্যায় ও ইনসাফ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হবে না কেন?

আইন শৃঙ্খলা (পুলিশ) বিভাগ

দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজরত উমর ফারুক রা. এর যুগে যে পুলিশবিভাগ চালু করা হয়েছিল, হজরত মুয়াবিয়া রা. তাকে আরো উন্নত ও আধুনিক করে গড়ে তোলেন। যার ফলে খোরাসান থেকে মিসর পর্যন্ত কোথাও চুরি-চামারি বা ডাকাতি ও লুটতরাজের নামগন্ধও ছিল না। আইন-শৃঙ্খলা বিভাগের দায়িত্ব প্রথমে ছিল হজরত ইয়াজিদ বিন হাররার হাতে। তারপর হজরত কায়েস বিন হামযা এবং তারপর হজরত যায়েল বিন আমরের হাতে এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।[৪০৩]

ব্যক্তি-স্বাধীনতা

ন্যায় ও ইনসাফের এ বসন্তের ফলে সবখানে ছিল শান্তি ও নিরাপত্তা। মানুষের উপর কোনো রকম চাপ বা কঠোরতা ছিল না। বরং তাদের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছিল সুন্দর ও সুরক্ষিত পরিবেশ। প্রত্যেকের জন্য নিজ নিজ প্রয়োজন ব্যক্ত করা, মনের দাবি তুলে ধরা ও স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অধিকার ছিল।

---

[৪০২] আল ইসাবাহ : ৪/২৭৯, আবদুর রহমান বিন আবদ এর আলোচনা।

[৪০৩] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২২৮

একবার মদিনার গভর্নর মারওয়ান বিন হাকাম মসজিদে নববিতে উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ করে বললেন, এবার আপনাদের বেতন-ভাতায় কিছুটা ঘাটতি আছে। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. এর আদেশ, সর্বাবস্থায় সকলকে পূর্ণ বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে হবে। তাই ইয়েমেনের আমদানি থেকে সে ঘাটতি পূরণ করা হবে।

একথা শুনে উপস্থিত লোকেরা পরিষ্কার অস্বীকার করে বলল, ইয়েমেনের আমদানি ইয়েমেনবাসীরই অধিকার। হজরত মুয়াবিয়াকে বলুন, তিনি যেন জিজিয়ার আয় থেকে সে ঘাটতি পূরণ করে দেন।

মারওয়ান তাদের অভিমত মেনে নিল এবং হজরত মুয়াবিয়ার কাছে এ দাবি পৌঁছে দিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. অবশিষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করে দিলেন।[৪০৪]

---

[৪০৪] কিতাবুল আমওয়াল লিল কাসিম বিন সাল্লাম, পৃষ্ঠা : ৩৩০,

৫. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পঞ্চম লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার আরো উন্নত ও আধুনিক রূপ দান করা। তার চিন্তা ছিল অত্যন্ত সৃজনশীল। তাই ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী উপকারী ও সুবিধাজনক পরিবর্ধন আনতেন এবং নতুনত্ব সৃষ্টি করতেন। নিম্নে এ নতুনত্বের একটি ঝলক দেখুন।

সিলমোহর অধিদপ্তর : সরকারি লেখনী সংরক্ষণ বিভাগ

এতদিন পর্যন্ত সরকারি চিঠিপত্র এবং আদেশপত্র খোলা কাগজের মতো করে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। সে কাগজের নিচে খলিফা বা আমিরের সিল থাকাটাই যথেষ্ট মনে করা হতো।

একবার একটি ঘটনা ঘটল। হজরত মুয়াবিয়া রা. জনৈক ব্যক্তিকে এক লক্ষ দিরহাম বা দিনার তুলে নেওয়ার জন্য চিরকুট লিখে দিলেন। কিন্তু সেই লোকটি লেখা পরিবর্তন করে এক লক্ষের বদলে দুই লক্ষ তুলে নিয়ে গেল। যখন হজরত মুয়াবিয়ার সম্মুখে হিসাব এলো। তখন তিনি তদন্ত করলেন। দেখা গেল মূল লেখায় পরিবর্তন করে এক-এর স্থানে দুই লক্ষ তুলে নেওয়া হয়েছে।

তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. ভবিষ্যতে এমন ঘটনার দরজা বন্ধ করার লক্ষ্যে অভিনব পদ্ধতির সূচনা করলেন। তা হলো, প্রতিটি সরকারি লেখা বা আদেশপত্রকে মোহরাঙ্কিত খামে আবদ্ধ করে (সিল লাগিয়ে) পাঠানো শুরু হলো। যে দপ্তরে সরকারি আদেশপত্র মোহরাঙ্কিত করা হতো, তাকে দেওয়ানুল খাতাম বা মোহরাঙ্কিত করার দপ্তর বলে নামকরণ করা হলো।[৪০৫]

---

[৪০৫] তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা : ১৫৩,

এ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর হিময়ারি।[৪০৬]

প্রহরা বিভাগ

ইতিপূর্বে মুসলিম জাহানের খলিফাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আর ইসলামের দুশমনরা এটাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়ে হজরত উমর ফারুক, হজরত উসমান এবং হজরত আলি রা. কে শহিদ করে দিয়েছিল। একই কারণে হজরত হাসান রা. ও এক হামলায় আহত হয়েছিলেন। খোদ হজরত মুয়াবিয়া রা. এর উপরও প্রাণঘাতী আক্রমণ করা হয়েছিল।

এসব ঘটনায় গোটা মুসলিমবিশ্ব প্রকম্পিত হয়ে উঠত। তাই ভবিষ্যতে এজাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহিনীর নিয়ম প্রবর্তন করেন। আর এর মূল দায়িত্ব অর্পণ করা হয় হজরত আবু মুখারিকের হাতে।[৪০৭]

তারপর থেকে প্রত্যেক খলিফা এবং বাদশাহ এ বিভাগকে তাদের ব্যবস্থাপনার অংশ বানিয়ে নেয়।

আমির ও সেনাপতির নিরাপত্তা-ব্যবস্থা স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে। বদরযুদ্ধে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এবং আরো কয়েক স্থানে হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তা-রক্ষী হিসাবে সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং হজরত মুয়াবিয়া রা. এর উক্ত ব্যবস্থাপনা সুন্নাতের পূর্ণ অনুগামী হয়েছিল।

হিজাবা... খলিফার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় প্রদানের দায়িত্ব

ইতিপূর্বে যেকেউ সুযোগ পেলে খলিফার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারত। সাধারণ প্রয়োজন নিয়ে যেমন মানুষ যেত, তেমনি কেউ কেউ সময় নষ্ট করার জন্যও যেত। হজরত মুয়াবিয়া রা. সময়ের সদ্ব্যবহার ও উন্নত ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এতে

---

[৪০৬] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২২৮

[৪০৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৪৬৫

খলিফার সাথে সাক্ষাতের জন্য মানুষকে অনুমতি ও সময় নেওয়া আবশ্যক করে দেওয়া হতো। এ কাজের দায়িত্বশীলকে হাজিব এবং এই ব্যবস্থাটিকে 'হিজাবা' বলা হতো।[৪০৮]

উন্নয়ন ও গৃহায়ন

হজরত উমর ফারুক রা. এর ন্যায় হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দেশের সক্ষমতা ও প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করিয়েছেন। কয়েকটি সেনাছাউনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং নতুন করে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করিয়েছেন। শামের সীমান্তে তিনি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেছেন। এখানে রোমানদের বিলুপ্তপ্রায় দুর্গ 'জাবালা'কে তিনি নতুন করে নির্মাণ করে সেটিকে সেনাবাহিনীর বৃহত্তর কেন্দ্রে পরিণত করেছেন।

লাযিকিয়া ও আনতরতুস এলাকার নগরায়ন করেছেন।[৪০৯] হজরত মুয়াবিয়ার যুগেই মারআশের দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল, শক্ত ও দুর্ভেদ্য হওয়ার কারণে যা ছিল প্রবাদতুল্য।[৪১০] মারকিয়া ও বুলুইয়াসির বসতিও ছিল তার অবদান।[৪১১] তারই অনুমোদনে আফ্রিকায় কাইরাওয়ান নামের কেন্দ্রীয় ও সামরিক শহরের গোড়াপত্তন করা হয়।[৪১২]

হজরত মুয়াবিয়ার পূর্বে জাহাজ নির্মাণের কারখানা কেবল মিসরে ছিল। হিজরি ৪৯ সনে হজরত মুয়াবিয়া শামে কয়েকটি কারখানা চালু করেন। দূরদূরান্ত থেকে ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর ও প্রবীণ নাবিকদের সমবেত করা হয় এবং জর্দানের উপকূলে আক্কায় অত্যন্ত জোরদারভাবে জাহাজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়।[৪১৩]

মিসরে হজরত মুয়াবিয়ার গভর্নর হজরত মাসলামা বিন মুখাল্লাদ রা. (যিনি ৫৩ হিজরিতে এ পদে সমাসীন হয়েছিলেন) পূর্ণ সমারোহে উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা করেন। মিসরের ফুসতাত শহরটিকে একটি

---

[৪০৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৪৬৫

[৪০৯] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ১৩৫, মু'জামুল বুলদান : ১/২৭০

[৪১০] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ১৮৮,

[৪১১] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ১৩৫,

[৪১২] মু'জামুল বুলদান : ৪/৪২০

[৪১৩] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ১২০,

চমৎকার অবকাঠামো দান করেন। বর্ণিত আছে, ফুসতাতে এতবেশি মসজিদ ও মুয়াজ্জিন ছিল যে, আজানের সময় দূরদূরান্ত পর্যন্ত আজানের গুঞ্জরণ শোনা যেত।[৪১৪]

অন্যদিকে খোরাসানে হজরত আতা বিন সায়েব প্রাচীন শহর বলখের নদীর উপর তিনটি সেতু নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে যা 'কানাতিরে আতা' বা হজরত আতার নির্মিত সেতু নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।[৪১৫]

মুসলিমবিশ্বের কোনো কোনো শহরে এমন কিছু যুদ্ধবাজ জাতি ও দল ছিল, যারা এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। তাদের অব্যর্থ নিশানা নির্ণয়ের যোগ্যতা ও সমরপ্রতিভা থেকে উপকৃত হওয়া এবং তাদের উত্তম কর্মসংস্থানের জন্য হজরত মুয়াবিয়া রা. তাদেরকে বিভিন্ন এলাকায় স্থানান্তরিত করেন।

এ উদ্যোগের একটি উদ্দেশ্য ছিল যে, এদের মধ্যে যারা দাঙ্গাবাজ, তাদের উপর যেন নজরদারি করা যায়।

এরই ধারাবাহিকতায় 'যাত' (জাঠ) ও 'সিয়াবজি' সম্প্রদায়ের বহু মানুষকে 'এন্তাকিয়া ও তার আশপাশের উপকূলীয় শহরে নিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়।[৪১৬]

বা'লাবাক্কা, হিমস ও এন্তাকিয়ায় বসবাসরত পারসিক বংশোদ্ভূত লোকদেরকে জর্দানের উপকূল- সুয়ার ও আক্কায় স্থানান্তরিত করে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। বসরা ও কুফায় অবস্থানরত অনারব তিরন্দাজ জাতি এবং বা'লাবাক্কা ও হিমসের পারসিকদের এন্তাকিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিছু মিসরীয়কেও এসব উপকূলে নিয়ে আসা হয়। এদের কেউ কেউ ইউরোপীয় বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের সময় অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।[৪১৭]

---

[৪১৪] মু'জামুল বুলদান : ৪/২৬৫

[৪১৫] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ৩৯৬,

[৪১৬] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ১৬২,

[৪১৭] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ১২০, ১৬২,

৬. বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন

বিভিন্ন বিজয়াভিযান ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি খেলাফতের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রগুলোও হজরত মুয়াবিয়া রা. কে প্রতিহত করতে হয়েছিল। মূলত এজাতীয় ফেতনা ও বিশৃঙ্খলাগুলো নির্মূল করা ছিল হজরত মুয়াবিয়া রা. এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। আর ইতিহাস সাক্ষী যে, তিনি অত্যন্ত সফলভাবেই সমস্ত চক্রান্ত ও গোলযোগ নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছেন।

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর যুগে ষড়যন্ত্রকারী ও দাঙ্গাবাজ মূলত তারাই ছিল, যারা হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিল।

হজরত মুয়াবিয়া রা. খেলাফত লাভ করেছিলেন হজরত হাসান রা. ও তার সাথিদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। যার ফলে হিজাজ, শাম, মিসর ও আরবের অন্যান্য শহর, এককথায় গোটা মুসলিমবিশ্বে তার খেলাফতের কারণে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। শুধু ইরাকের বড় দুই শহর—কুফা ও বসরা ছিল ব্যতিক্রম।

কুফা ও বসরায় বাহ্যিকভাবে শৃঙ্খলা দেখা গেলেও এতদিন পর্যন্ত বিদ্রোহী দলগুলো এখানে গোপন কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল। তাই এ দুই শহরের প্রতি হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ছিল বিশেষ পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি। তিনি মনে করতেন, মুসলিমবিশ্বের পূর্ব সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে চাইলে এ দুই শহরে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। তাই কুফা ও বসরায় বিদ্রোহীদেরকে তিনি একদম মাথা তুলে দাঁড়াতে দেননি।

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর খেলাফত লাভ করার কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্রোহীরা প্রথমে কুফায় এবং পরে বসরায় নিজস্ব ক্ষমতায় জনসম্মুখে ধরা দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হজরত মুয়াবিয়া রা. পূর্ণ সফলতার সাথে এই দুই শহরকে দাঙ্গ-হাঙ্গামার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

কুফায় খারেজিদের বিদ্রোহ

সর্বপ্রথম অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করল কুফার খারেজিরা। এ দলটি লুকিয়ে লুকিয়ে সদস্য সংগ্রহ করে বহু মানুষকে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিল। ফলে পরপর তাদের কয়েকজন সরদার সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো। কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়ে গেল। খারেজিদের নামকরা কয়েকজন সরদার, ফারওয়া বিন নাওফেল, আবদুল্লাহ বিন আবুল হাওসা এবং হাওসারা বিন যিরা সে যুদ্ধে নিহত হলো। কিন্তু এ অভিশপ্ত লোকগুলো একজন নেতা মারা যাওয়ার সাথে সাথেই আরেকজনকে আমির বানিয়ে আবার হাঙ্গাম শুরু করত।

হজতর মুয়াবিয়া রা. দেখলেন ক্রমেই খারেজিদের উৎপাত বেড়ে চলেছে। তিনি হজরত মুগিরা বিন শুবা রা. কে কুফার গভর্নর বানিয়ে পাঠালেন। যার বীরত্ব ও দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কথা গোটা আরব স্বীকার করত।

হজরত মুগিরা রা. কুফায় এসে অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে সুকৌশলে খারেজিদের বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করলেন। খারেজিরা শাবিব বিন বাজারা,[৪১৮] মুঈন বিন আবদুল্লাহ, আবু মারয়াম, আবু লায়লার মতো সরদারদের ছত্রছায়ায় সমবেত হয়ে কয়েকবার মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলো। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

দুই বছর পর, ৪৩ হিজরিতে মুসতাওরিদ বিন আলকামার নেতৃত্বে খারেজিরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। মুসতাওরিদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, ৪৩ হিজরির পয়লা শাওয়াল শহরের লোকেরা যখন ঈদের নামাজের জন্য শহরের বাইরে যাবে, তখন হঠাৎ শহরের উপর আক্রমণ করে শহর দখল করে নেবে। কিন্তু হজরত মুগিরা বিন শুবা রা.

---

[৪১৮] এ ছিল সেই শাবিব, যে কিনা হজরত আলি রা. এর উপর প্রাণঘাতী আক্রমণের সময় আবু মুলজিমের সঙ্গে ছিল। ঐ ঘটনার পর সে আত্মগোপন করেছিল। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ক্ষমতা লাভ করার পর সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। (আল কামিল ফিত তারিখ : ৩/১১) অবশেষে ৪৯ হিজরিতে হজরত মুগিরা বিন শু'বা রা. র সঙ্গে মোকাবেলা করার সময় কুফার রাষ্ট্রীয় কোষাগারের কাছে সে নিহত হয়। (তারিখে খলিফা, পৃষ্ঠা : ২০৯)

যথাসময়ে এ ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খারেজিদের মূল পরামর্শশালায় ঝটিকা আক্রমণ চালালেন। মুসতাওরিদ পালিয়ে গেল। আর তার কয়েকজন সাঙ্গকে আটক করা হলো।

হজরত মুগিরা রা. জানতেন কুফার লোকদের মনমস্তিষ্কে এখনো খারেজি ও সাবায়িদের প্রভাব বিরাজমান। কুফারই কিছু কিছু মানুষের গোপন সহযোগিতায় দাঙ্গাবাজরা হাঙ্গামা করার চেষ্টা করছে। কারণ, এজাতীয় মানুষ শাসকদের নমনীয়তা থেকে অসৎ ফায়দা লুটতে চায়। ফলে সাধারণ মানুষের জন্য এরা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবু হজরত মুগিরা রা. চাচ্ছিলেন, কোনো রকম রক্তপাত ছাড়াই বিপদ কেটে যাক, দাঙ্গাবাজরা সুপথে ফিরে আসুক।

হজরত মুগিরা রা. কুফার লোকদেরকে সমবেত করে একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, 'হে লোকসকল, আমি তোমাদের জন্য শান্তি ও শৃঙ্খলা পছন্দ করি। তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদ থেকে বাঁচাতে চাই। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, আমার নম্র আচরণের ফলে হয়তো দাঙ্গাবাজরা বিগড়ে যাবে। আমার ভয় হয়, অজ্ঞলোকদের সাথে ভালো ও ভদ্র মানুষরা আমার অভিযানের শিকার না হয়ে পড়ে। সুতরাং তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই তোমরা তোমাদের অজ্ঞ লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখো। আমি জানতে পেরেছি, কিছু মানুষ অজ্ঞতা ও কপটতার বীজ বপন করছে। আল্লাহর কসম, যারা এমনটা করবে, তারা আরবের যে গোত্রেরই অধিবাসী হোক, আমি তাদের হত্যা করব এবং পরবর্তীদের জন্য তাদেরকে দৃষ্টান্তে পরিণত করব'।

হজরত মুগিরার এ কঠোর ভাষণে মানুষ বেশ ভীত হলো। প্রত্যেক গোত্রের সরদাররা নিজ নিজ গোত্র সম্পর্কে হজরত মুগিরাকে নিশ্চয়তা দিল যে, তারা কোনো বিদ্রোহে অংশ নেবে না।

এ প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সরদাররা যখন অধীনস্থদের বিদ্রোহ মনোভাব থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করতে লাগল, তখন খারেজিরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ফলে তাদের আমির মুসতাওরিদ তার বিশেষ অনুচরদের নিয়ে এলাকা ছেড়ে দূরে চলে গেল।

এবার হজরত মুগিরা রা. উপযুক্ত সুযোগ পেলেন। তিনি মা'কিল বিন কায়েস রহ. কে তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কয়েকটি

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত খারেজিদের বহু মানুষকে হত্যা করা হলো। শেষ লড়াইয়ের সময় মুসতাওরিদ চিৎকার করে মা'কিল বিন কায়েসকে শক্তিপরীক্ষার জন্য আহ্বান জানাল। তিনি তরবারি উঁচিয়ে মুসতাওরিদের দিকে ছুটে গেলেন। মুসতাওরিদ বর্শার আঘাতে মা'কিলকে শহিদ করে দিল। কিন্তু তিনি ভূপাতিত হওয়ার পূর্বক্ষণে আপন তরবারি মুসতাওরিদের মস্তকে বসিয়ে দিলেন। মুসতাওরিদের ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল এবং তার মৃত্যুর সাথে সাথেই খারেজিরা শোচনীয়ভাবে হেরে গেল। যে যেভাবে পারল, পালিয়ে বাঁচল। তারপর ইরাকে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এলো।[৪১৯]

সাবায়িদের গোলযোগ

হজরত মুগিরার দূরদর্শী উদ্যোগের ফলে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় খারেজিরা পরিপূর্ণ ব্যর্থ হলো। কারণ, তাদের কর্মপন্থা ষড়যন্ত্রমূলক ছিল না, ছিল প্রকাশ্য আন্দোলনমূলক। এর আগে হজরত আলি রা. এর যুগে তারা হঠাৎ করে জেগে উঠেছিল এবং সাথে সাথেই তাদেরকে নির্মূল করা হয়েছিল। এখন হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলেও কয়েকটি যুদ্ধের পর তাদের শক্তি বিলীন হয়ে গেল।

অন্যদিকে সাবায়িরা ভেতরে ভেতরেই কাজ করে যাচ্ছিল। কারণ, তাদের গোপন কাজ করাই ছিল তাদের স্বভাব। হজরত মুয়াবিয়া রা. ক্ষমতা লাভ করার পর তারা প্রায় দশ বছর পর্যন্ত গোপন ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে। এ দীর্ঘ সময়ে তাদের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল হজরত মুয়াবিয়া, তার প্রতিনিধি এবং তার বিশেষ সহযোগীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে এদের বদনাম করবে।

এটা ছিল সম্পূর্ণ সেই অপকৌশল, যা হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে চালানো হয়েছিল। এখানেও কয়েকটি বাস্তব ঘটনাকে বিষাক্ত সংযোজনে মিশ্রিত করা হলো। আবার কিছু ঘটনা বানিয়েও প্রচার করা হলো। পরবর্তীতে সেসব বানোয়াট বর্ণনাকে ষড়যন্ত্রকারীদেরই লেখকরা ইতিহাসের পাতায় জুড়ে দিয়েছে।

---

[৪১৯] তারিখুত তাবারি : ৫/১৬৫, ১৬৬, ১৭৩-১৭৯, ১৮১-২১০

বসরা ও কুফায় জিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানকে গভর্নর নিযুক্তীকরণ

জিয়াদ ছিল মূলত তায়েফের এক দাসীর পুত্র, যার নাম ছিল সুমাইয়া। জিয়াদের পিতা হজরত আবু সুফিয়ান রা. গোপনে এই দাসীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা কেউ জানত না।

যাই হোক, জিয়াদ ছিলেন হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বৈপিত্রেয় ভাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের সময় জিয়াদের বয়স ছিল দশ বা এগারো বছর। তবে আল্লাহর নবীর সাক্ষাৎ সে পেয়েছিল কি না তা প্রমাণিত নয়। তাই তাকে সাহাবিদের মধ্যে গণ্য করা হয় না।

তবে তীক্ষ্ণ মেধা, পরিপক্ক বিবেচনাশক্তি, সুচারু ব্যবস্থপনা, সমস্যা নিরসনের প্রতিভা, বাকপটুতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং উন্নত মনোবল ও সাহসিকতায় জিয়াদ ছিল অতুলনীয়। দাপ্তরিক কার্যক্রম, লেখালেখি, হিসাব রক্ষা ইত্যাদি বিষয়েও তার দক্ষতা ছিল। তার যৌবন কেটেছিল হজরত আবু মুসা আশআরি, হজরত মুগিরা বিন শুবা, হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এর ন্যায় যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের তত্ত্বাবধানে। জিয়াদ তাদের লিপিকার (সেক্রেটারি) ছিলেন।[৪২০]

হজরত উমর রা. জিয়াদকে বসরার জাকাত উসুলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যেই বসরা থেকে তদারকি করা হতো সীমান্ত এলাকা, উত্তর ও দক্ষিণ আফগানিস্তান এবং খোরাসানের জনপদগুলো।[৪২১]

হজরত আলি ও মুয়াবিয়া রা. এর মতবিরোধের সময় জিয়াদ ছিল হজরত আলি রা. এর পক্ষে। হজরত আলি তাকে পারস্যের গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। জিয়াদের প্রচেষ্টাতেই সেখানে বিদ্রোহী অপতৎপরতাগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৪২২]

যখন হজরত হাসান রা. খেলাফতের দায়িত্ব হজরত মুয়াবিয়া রা. এর হাতে ছেড়ে দিলেন, তখন জিয়াদ এক বছর পর্যন্ত পারস্যের কোনো এক

---

[৪২০] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৪৯৬, ৪৯৭,

[৪২১] আল ইসাবাহ : ২/৫২৮, তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত লিন নাবাবি : ১/১৯৯

[৪২২] তারিখুত তাবারি : ৫/১৩৭, ১৩৮

দুর্গে আবদ্ধ হয়ে ছিলেন। এ সময় সে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর হাতে বাইয়াত হয়নি। এক বছর অপেক্ষা করার পর জিয়াদ আনুগত্য স্বীকার করে শামে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে চলে আসেন।[৪২৩]

জিয়াদের সংস্কার ও অবদান

হজরত মুয়াবিয়া রা. ৪৫ হিজরিতে জিয়াদকে বসরার গভর্নরপদে নিযুক্ত করেন। তখন বসরার ব্যবস্থাপনাগত অবস্থা অগোছাল ছিল। জিয়াদ গভর্নর হয়ে সেখানকার নিয়ম ও শৃঙ্খলায় আমূল পরিবর্তন এনে বসরাকে একটি আদর্শ নগরীতে পরিণত করেন। খোরাসানকে চারটি জেলায় বিভক্ত করে প্রত্যেক জেলার জন্য পৃথক পৃথক জেলাপ্রশাসক নিযুক্ত করেন।[৪২৪]

এ ছাড়াও যোগাযোগ-ব্যবস্থাও জিয়াদ অত্যন্ত দ্রুতগামী করে তোলেন।

যেহেতু বসরা ছিল খারেজি ও সাবায়িদের পুরাতন ঘাঁটি, আর এরা তখনো গোপনে কাজ করে যাচ্ছিল এবং যেকোনো সময় হাঙ্গামা বাধানোর আশঙ্কা ছিল, তাই জিয়াদ রাত্রিকালীন কারফিউ জারি করলেন। এশার নামাজের দুই ঘণ্টা পর থেকে ফজর পর্যন্ত এ কারফিউ জারি থাকত। এ সময় সাধরণ মানুষের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া কঠোরভাবে নিষেধ ছিল।

এ আইনের ফলে শহরে এমন শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এলো যে, কারো কোনো জিনিস যদি রাস্তায় পড়ে যেত, তা হলে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কেউ ধরত না। রাতেরবেলা মহিলারা একাকী ঘরের দরজা খোলা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ত। জিয়াদ বলতেন, খোরাসানে যদি কারো রশিও হারিয়ে যায়, তা হলে আমি বলে দিতে পারব, কে নিয়েছে।

জিয়াদ সাহাবায়ে কেরামকে উচ্চপদে সমাসীন করলেন। হজরত ইমরান বিন হুসাইন, হজরত আনাস বিন মালিক, হজরত হাকাম বিন আমর, হজরত সামুরা বিন জুনদুব, হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা প্রমুখ সাহাবিকে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসালেন। শহরের আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার জন্য চার হাজার পুলিশ নিযুক্ত করলেন। সরকারি

---

[৪২৩] তারিখুত তাবারি : ৫/১৭৬-১৭৮

[৪২৪] তারিখুত তাবারি : ৫/২১৬-২১৭

নিরাপত্তাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল পাঁচশত। এভাবে বসরা একটি পূর্ণ নিরাপদ শহরে পরিণত হলো।[৪২৫]

৫০ হিজরিতে কুফার গভর্নর হজরত মুগিরা বিন শুবা রা. ইনতেকাল করলেন। হজরত মুয়াবিয়া রা. তখন জিয়াদকে বসরার সাথে সাথে কুফারও গভর্নর বানিয়ে দিলেন। আর সেটাই ছিল কোনো আমিরের একসাথে এই দুই শহরের দায়িত্ব লাভ করার প্রথম ঘটনা। জিয়াদ অত্যন্ত সফলভাবে একসাথে উভয় শহর সুচারুরূপে পরিচালনা করেছিলেন। শীতকালে তিনি বসরায় থাকতেন এবং গ্রীষ্মকালে থাকতেন কুফায়।[৪২৬]

---

[৪২৫] তারিখুত তাবারি : ৫/২২২, ২২৩
[৪২৬] তারিখুত তাবারি : ৫/২৩৪

মুয়াবিয়া রা. শাসনামলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর যুগে দুটি এমন ঘটনা ঘটেছে, যাকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ হজরত মুয়াবিয়া রা. কে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ দিয়ে থাকে। ঘটনা-দুটি হলো,

১. হুজর বিন আদি রা. এর ঘটনা।

২. ইয়াজিদকে পদে বসানো।

সাধারণত এ ঘটনা-দুটিকে একপেশেভাবে পর্যালোচনা করা হয়; অথচ ইনসাফের দাবি এই যে, সকল বর্ণনা সামনে রেখে সর্বদিক থেকে বিবেচনা করা হবে, যাতে সত্য বিষয়টি সামনে এসে যায়। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা ইনসাফ ও সতর্কতার সঙ্গে এ বিষয়-দুটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

হুজর বিন আদি রা. এর ঘটনা

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে ধৈর্যের এবং সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা ছিল কুফার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরোধিতা, যারা আল্লাহর নবীর সোহবত লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। এদের মধ্যে হজরত আমর ইবনুল হামিকও ছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আমর ইবনুল হামিক রা. কে যৌবন দ্বারা উপকৃত হতে থাকার দোয়া করেছিলেন। ফলে বৃদ্ধ বয়সেও তাকে দেখতে যুবকের মতো মনে হতো।[৪২৭]

উক্ত বিরোধিতাকারীদের প্রধান ছিলেন হজরত হুজর বিন আদি, যিনি ইলম ও মর্যাদা এবং দুনিয়াবিমুখতা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তার মর্যাদা ছিল অনন্য।[৪২৮]

---

[৪২৭] মা'রিফাতুস সাহাবা : ৪/২০০৬, আল ইসাবাহ : ৪/৫১৪

[৪২৮] আল ইসতিয়াব : ১/৩২৯, উসদুল গাবাহ : ১/৬৯৭, আল ইসাবাহ : ২/৩৭

নোট : অধিকাংশ আলেম হজতর হুজর বিন আদিকে সাহাবি বলেছেন। তবে কেউ কেউ তাবেয়িও বলেছেন। নিম্নে কয়েকজনের মত উল্লেখ করা হলো। যথা :

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, ইবনে সা'দ ও হাকেম রহ. মুসআব আয যুবাইরি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হজরত হুজর বিন আদি রা. তার আপন ভাই হানির সঙ্গে গোত্রীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তবে এরপর তিনি লিখেছেন, ইমাম বুখারি, ইবনে আবি হাতেম, খলিফা বিন খাইয়াত এবং ইবনে হিব্বান হুজর বিন আদিকে তাবেয়িদের মধ্যে গণ্য করেছেন। (দ্রষ্টব্য : আল ইসাবাহ : ২/৩২, ৩৩,

আল্লামা ইবনে আবদুল বার রহ. লিখেছেন, كان حجر من فضلاء الصحابة অর্থাৎ হুজর বিন আদি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত। (দ্রষ্টব্য : আল ইসতিয়াব : ৩/৪৬২)

হাফেজ যাহাবি রহ. লিখেছেন, له صحبة ووفادة অর্থাৎ হুজর বিন আদি সাহাবি ছিলেন এবং আল্লাহর নবীর দরবারে আগমন ঘটেছিল। (দ্রষ্টব্য : সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৪৬৩)

আল্লামা ইবনে আসিরও একই কথা বলেছেন। (দ্রষ্টব্য : উসদুল গাবাহ : ১/৬৯৭)

যাই হোক, মোটকথা ষড়যন্ত্রকারীদের অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে এরা কুফায় বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করেছিল। তাদের কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য কুফার গভর্নর হজরত হুজর বিন আদি রা. কে তার সাথি-সঙ্গী সহকারে আটক করে কুফা থেমে দামেশকে পাঠিয়ে দেয়। অন্যদিকে হজরত আমর ইবনুল হামিক রা. পালিয়ে গিয়ে মুসেলের পাহাড়ি অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। কিন্তু দুর্ঘটনাবশত সেখানে বিষাক্ত সাপের ছোবলে তার মৃত্যু হয়।

এদিকে হজরত হুজর বিন আদি রা. কে দামেশকে নিয়ে যাওয়ার পর, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে তাকে তার সাতজন সঙ্গী সহকারে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। এটি ছিল হিজরি ৫১ সনের ঘটনা। এ ঘটনায় সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দারুণভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন।

এখন এ ঘটনার আসল রহস্য কী? কেন এমন ঘটেছিল? ঘটনার বিস্তারিত বিবরণই-বা কী? উত্তর- এসবের অধিকাংশ তথ্যই দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত। তাবারিতে ذكر مقتل حجر بن عدى واصحابه শিরোনামের অধীনে প্রায় ২৫-৩০ পৃষ্ঠার আলোচনা করা হয়েছে, যা পাঠ করলে যেকোনো পাঠকের মনে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বিরুদ্ধে মারাত্মক ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়।

হুজ্র বিন আদির সাহাবি হওয়া নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি সাহাবা-যুগের একজন বিশিষ্ট আলেম ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তার অনেক ভক্ত ছিল। হজরত আলি রা. এবং হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. এর সূত্রে তার থেকে কিছু হাদিসও বর্ণিত আছে। একটি হাদিসে মারফুও বর্ণনা করেছেন। (দ্রষ্টব্য : আল ইসাবাহ : ২/৩৩, বাইরুত)

কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয় যে, কিছু কট্টরপন্থি মানুষ হুজ্র বিন আদিকে গুণ্ডা, বদমাশ এবং দুষ্কৃতিকারী বলে আখ্যায়িত করেছে; শুধু এই অপরাধে যে, তিনি উমাইয়া বংশের বিরোধিতা করতেন।

যাই হোক, আমরা উল্লিখিত হাফেজ যাহাবির মতকে অগ্রগণ্য মনে করে হুজ্র বিন আদির নামের সাথে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' লিখেছি। তবে তাবেয়ি হওয়ার মতও যথাস্থানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

সে যাই হোক, এ মতবিরোধ থেকে আমরা আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছি। তিনি সাহাবি হোন বা তাবেয়ি, একথা নিশ্চিত যে, তিনি একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং তার সমালোচনা করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

এসব বর্ণনার সারকথা হলো, হজরত মুয়াবিয়া রা. হুজর বিন আদিকে সম্পূর্ণ অবৈধ ও অন্যায়ভাবে হত্যা করেছেন। হুজর বিন আদির অপরাধ কেবল এই ছিল যে, মুয়াবিয়া রা. এর গভর্নরদেরকে মসজিদের মিম্বরে বসে আলি রা. এর বিরুদ্ধে গালমন্দ করতে দেখলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এমনিভাবে ইবনে জিয়াদ খুতবা দীর্ঘ করে নামাজ বিলম্বিত করত। হুজর বিন আদি এ নিয়ে তার সাথে বিতর্ক করেছিলেন।

এসব কর্মকাণ্ডের কারণে হজরত মুয়াবিয়া রা. হুজর বিন আদিকে তার সাথিদের সহকারে হত্যা করেছিলেন, যা ছিল একটি জঘন্য অত্যাচার।

এই হলো আবু মিখনাফের বর্ণনার সারসংক্ষেপ। কিন্তু ইনসাফের দাবি হচ্ছে, হুজর বিন আদির মর্যাদা ও সম্মানের সাথে সাথে হজরত মুয়াবিয়ার অবস্থানও ভালোভাবে বোঝা উচিত।

হজরত হুজর বিন আদি রা. সম্পর্কে আমরা এ সুধারণাই রাখতে চাই যে, তিনি তার দীনি ও শরয়ি দায়িত্ব মনে করেই হজরত মুয়াবিয়া রা. এর গভর্নরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। অন্যদিকে হজরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কেও আমরা এ ছাড়া কোনো চিন্তা করতে পারি না যে, তিনি শরয়ি ও জাতীয় দায়িত্ব মনে করেই হুজর বিন আদি ও তার সাথিদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন।

দুর্বল বর্ণনাগুলো এ ঘটনার সূত্রপাত ও তার কারণ উল্লেখ করে বলছে যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর গভর্নররা হজরত আলি রা. এর বিরুদ্ধে গালমন্দ করার কারণে এ গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সহিহ ও হাসান পর্যায়ের বর্ণনাগুলো এ তথ্য অস্বীকার করে।

তা হলে আসল ঘটনা কী ছিল? চলুন, হাতের নাগালে ইতিহাসের যে তথ্যগুলো পাওয়া যায়, তার আলোকে ঘটনার একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করি।

১. ঘটনার প্রেক্ষাপট

দীর্ঘদিন থেকে কুফার খেলাফত বিরোধী চক্রের কিছু লোক হজরত হুজর বিন আদি রা. এর পদলেহী হয়ে তাকে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসকদের বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছিল। আর এটা স্বাভাবিক যে, যারা কোনো বিশেষ চিন্তার মানুষের মধ্যে থাকে এবং সব সময় একতরফা

কথা শোনে, তাদের জন্য ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রকৃত রহস্য ও অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভ করা সম্ভব হয় না। হজরত হুজর বিন আদি রহ. ছিলেন এমনই একজন বুজুর্গ। কেননা তিনি চলাফেরা করতেন হজরত আলি রা. এর প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি প্রদর্শনকারী দল 'শিয়ানে আলি'র তত্ত্বাবধানে। আর এ দলটি বনু হাশিমের পরিবর্তে বনু উমাইয়ার শাসন মেনে নিতে পারছিল না।

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'হজরত হুজরের আশপাশে শিয়ানে আলির কয়েকটি দল ঘুরঘুর করত। এরা তার সমর্থন যোগাত এবং তার হাত দিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করত। এরা হজরত মুয়াবিয়া রা. কে গালমন্দ করত এবং তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করত'।

এ বক্তব্য থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, হজরত হুজর বিন আদি নিজের অজান্তে অন্যদের হাতে ব্যবহৃত হচ্ছিলেন।

২. সন্ধির প্রতি অনাস্থা

হজরত আলি রা. এর প্রতি অতিভক্তিশীল ওই দলটির প্ররোচনার ফলে হজরত হুজর রা. শুরু থেকেই হজরত হাসান রা. এর পক্ষ থেকে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সঙ্গে সন্ধি করার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিলেন। হজরত হাসানের এ সিদ্ধান্তের কারণে হজরত হুজর আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'হে প্রিয় রাসুলের পৌত্র, হায়, যদি আপনার এ সিদ্ধান্ত দেখার আগেই আমার মরণ হতো! আপনি তো আমাদেরকে ইনসাফ থেকে তাড়িয়ে জুলুমের দিকে ঠেলে দিয়েছেন'।

হজরত হুজরের এই মন্তব্য হজরত হাসানের কাছে বেশ খারাপ লেগেছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি দেখলাম, অধিকাংশ মানুষই সন্ধির প্রতি আগ্রহী এবং যুদ্ধের প্রতি অনাগ্রহী। আমি তাদেরকে তাদের অপছন্দনীয় বিষয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করাটা ভালো মনে করিনি'।

হুজর বিন আদি এখান থেকে নিরাশ হয়ে হজরত হুসাইন রা. এর কাছে গেলেন এবং তাকেও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চাইলেন। তিনি নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন, কুফায় আমার ভক্তবৃন্দ দ্বারা আমি আপনাকে পূর্ণ সামরিক সহযোগিতা করব।

কিন্তু হজরত হুসাইন রা.-ও তার চিন্তার সাথে একমত ছিলেন না। তিনি বললেন, 'দেখুন, আমরা (হজরত মুয়াবিয়া রা. এর হাতে) বাইয়াত হয়ে গেছি। আমাদের মধ্যে সন্ধি ও চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তা ভঙ্গ করার কোনো সুযোগ নেই।[৪২৯]

মোটকথা হজরত হাসান ও হুসাইন রা. হজরত মুয়াবিয়ার সঙ্গে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করতে সম্মত হলেন না। তাই ওই দলের লোকেরা উক্ত মহান ব্যক্তিদের প্রতিও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এমনকি তাদের কোনো কোনো বেফাস মুখের লোক তো হজরত হাসান রা. কে এভাবে সম্বোধন করে ফেলল, يا مذل المؤمنين অর্থাৎ মুমিনদের লাঞ্ছিতকারী।[৪৩০]

৩. হজরত হুসাইন রা. এর সাথে পত্রালাপ

যতদিন হজরত হাসান রা. জীবিত ছিলেন, ততদিন ওই দলের লোকেরা কিছুই করার সাহস পায়নি। কিন্তু ৫০ হিজরিতে তিনি ইনতেকাল করার পরই ষড়যন্ত্রকারী দলটি হজরত আলির প্রতি অতিভক্তির নামে আবারও ডানা মেলতে শুরু করে। হুজর বিন আদির ন্যায় কয়েকজন বুজুর্গকে তারা আবারও ব্যবহার করতে শুরু করে। এই বুজুর্গগণ তার সরল হৃদয়, অনন্য ইখলাস এবং সকলের প্রতি সুধারণার কারণে এই দলের নেতাদের ভক্ত ও অনুরক্ত এবং প্রকৃত মুজাহিদ ভাবছিলেন। হজরত হুজরের এক বন্ধু জা'দাহ বিন হুবাইর মাখযুমি হজরত হুসাইন রা. কে (যিনি মদিনায় অবস্থান করছিলেন) কুফা থেকে পত্র প্রেরণ করে, যাতে লেখা ছিল, 'আমাদের সকল দলের দৃষ্টি আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা আর কাউকে আপনার সমকক্ষ মনে করি না। আপনার ভাই হজরত হাসান রা. যুদ্ধ পরিহার করার যে চেষ্টা করেছেন, আমাদের লোকেরা সে সম্পর্কে অবগত। তারা আরো জানে যে, আপনি আপনার বন্ধুদের জন্য অত্যন্ত কোমল, শত্রুদের জন্য কঠোর এবং আল্লাহর কাজে নির্ভীক। আপনি যদি এই ব্যাপারটি (খেলাফত) চান, তা হলে আমাদের কাছে এসে পড়ুন'।

এই চিঠির উত্তরে হজরত হুসাইন রা. অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদেরকে নিষেধ করেন। সাথে সাথে এ আবেগতাড়িত চিন্তাকে শান্ত করার জন্য

---

[৪২৯] আল আখবারুত তিওয়াল, আবু হানিফাহ আদ-দীনয়াওয়ারি, পৃষ্ঠা : ২২০

[৪৩০] আল আখবারুত তিওয়াল, পৃষ্ঠা : ২২১

তিনি বলেন, 'আমার ভাই যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, আমার মতে তার তাওফিক আল্লাহ তায়ালাই তাকে দান করেছিলেন। তিনি তার পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সঠিক ছিলেন।'

হজরত হুসাইন রা. আরো লিখে পাঠালেন, 'যতদিন আমি জীবিত আছি, আল্লাহ তায়ালা হজরত মুয়াবিয়াকে কোনো বিপদে আক্রান্ত হতে দেবেন না'। [৪৩১]

৪. ফেতনাবাজ লোকদের পরিমণ্ডলের প্রভাব

এমন উত্তরের পর তো হজরত হুজর বিন আদির সম্পূর্ণ নীরব ও নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ফেতনাবাজদের খপ্পর থেকে তিনি বের হতে পারলেন না, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গোলযোগ সৃষ্টি করা। হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এর উক্তি অনুযায়ী এই লোকগুলো হজরত উসমান রা. কে গালমন্দ করত। তাকে অত্যাচারী বলত। বিভিন্ন শাসক ও আমিরের উপর অভিযোগ তুলত। সামান্য অজুহাতে আমিরদের সমালোচনায় মেতে উঠত। এজাতীয় কাজে সর্বদা তারা বাড়াবাড়ি করত। হজরত আলির প্রতি অতিভক্তি পোষণকারীদের দল ভারী করত এবং দীনি বিষয়ে চরমপন্থা অবলম্বন করত।[৪৩২]

মনে হয় এরা ছিল সরলপ্রকৃতির মুসলমান, যারা মূলত সাবায়িদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছিল। হজরত হুজর বিন আদি এবং হজরত আমর ইবনুল হামিক রা. সুধারণাবশত এবং ভুল বুঝে এই লোকগুলোর তত্ত্বাবধান করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এ দুই মহান ব্যক্তির ইখলাস, ইলম ও আল্লামুখিতার ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাদের কার্যক্রম উম্মাহর নিরাপত্তার জন্য ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। এ কারণেই উম্মাহর অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ি এবং স্বয়ং হাসান-হুসাইন রা. এ দুই সম্মানিত ব্যক্তির কার্যক্রমকে সমর্থন বা সহযোগিতা করেননি। অথচ তারা এদেরকে ভালোবাসতেন এবং এদের প্রতি সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

---

[৪৩১] আল আখবারুত তিওয়াল, পৃষ্ঠা : ২২১, ২২২

[৪৩২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/২৩৯

৫. প্রতিবাদী আন্দোলনের সূচনা

অবশেষে সেই হৃদয়বিদারক সময়টি এসে পড়ল, যখন চলমান শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষ প্রকাশ্যে আন্দোলন শুরু করল। কুফার গভর্নর হজরত মুগিরা বিন শুবা রা. এক শুক্রবারে জুমার নামাজের খুতবা প্রদান করছিলেন। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি হজরত উসমান রা. এর জন্য রহমতের দোয়া করলেন এবং তার হত্যাকারীদের জন্য বদদোয়া করলেন। এ সময় হজরত হুজর বিন আদি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হজরত মুগিরা বিন শুবার বিরুদ্ধে চিৎকার করে স্লোগান তুললেন। স্লোগানের আওয়াজ এত জোরে হলো যে, মসজিদের বাইরেও তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। তারপর হজরত মুগিরাকে লক্ষ করে বলতে লাগলেন, 'ঐ মিয়া, বুড়া হওয়ার কারণে তুমি এটাও বুঝতে পারছ না যে, কার মহব্বত নিয়ে মরছ। আমাদের অজিফা চালু করার আদেশ দাও। তুমিই আমাদের অজিফা বন্ধ করে রেখেছ। অথচ তোমার এর কোনো অধিকার নেই। তোমার পূর্বে কোনো শাসকই আমাদের অজিফার প্রতি লালসা করেনি। আমিরুল মুমিনিনের (হজরত আলি) বিরুদ্ধে সমালোচনা করার এবং অপরাধীদের (উমাইয়া বংশ) প্রশংসা করার তোমার বড় শখ দেখছি!'

হজরত মুগিরা রা. অত্যন্ত সহনশীলতার সঙ্গে তার এসব তিক্ত কথা শুনলেন। কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। চুপচাপ ঘরে চলে গেলেন। সাথিরা অনেক পীড়াপীড়ি করল, হুজ্র বিন আদিকে অবশ্যই সাবধান করা উচিত। কিন্তু হজরত মুগিরা বিন শুবা ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল মেজাজের মানুষ। তিনি শুধু এতটুকু বললেন, 'যারা ভুল করে, আমি তাদের ক্ষমা করে দিই'।[৪৩৩]

৬. কুফায় জিয়াদের নিয়োগ ও হুজর বিন আদির সঙ্গে আচরণ

৫০ হিজরিতে হজরত মুগিরা বিন শুবার ইনতেকাল হয়ে গেল। তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বসরার শাসক জিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানের অসাধারণ পারদর্শিতা ও দক্ষতা দেখে তাকে কুফারও গভর্নর বানিয়ে দিলেন।[৪৩৪]

---

[৪৩৩] তারিখুত তাবারি : ৫/২৫৪, ২৫৫

[৪৩৪] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২১০

ইতিমধ্যে কুফায় হজরত হুজরের চারপাশে প্রচুর সংখ্যক বিদ্রোহী সংঘবদ্ধ হয়েছিল। তারা হজরত হুজরকে তাদের শায়েখ ও নেতা বলে দাবি করছিল এবং শাসনক্ষমতার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তারা তাকে বলছিল যে, 'বর্তমান শাসকদের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করার আপনিই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি'।[৪৩৫]

এদিকে হজরত হুজরের সঙ্গে জিয়াদের পূর্বসম্পর্ক ছিল। কেননা একসময় তারা উভয়ই হজরত আলি রা. এর নৈকট্যভাজন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজকাল এখন হজরত হুজ্‌র কী চান এবং তার আশপাশে সংঘবদ্ধ লোকগুলো কী চায়, সে সম্পর্কে জিয়াদ খুব ভালোই জানতেন। কুফার জন্য তাকে নিযুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যও ছিল হজরত হুজ্‌রকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে প্রতিহত করা। কেননা তাকে প্রতিহত করতে না পারলে পূর্বসীমান্তের এ গুরুত্বপূর্ণ শহরটি পুনরায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার কেন্দ্রে পরিণত হওয়া ছিল নিশ্চিত বিষয়।

শুরুতে জিয়াদ হজরত হুজরের সম্মান ও মর্যাদায় কোনো ত্রুটি করেননি। সর্বাত্মকভাবে তিনি তাকে কাছে টানার চেষ্টা করেছেন। জিয়াদ তাকে বলেছিলেন, 'আপনি আমার এ সিংহাসনে বসুন, আপনার সমস্ত প্রয়োজনের দায়িত্ব আমার'।[৪৩৬]

কিন্তু শাসকশ্রেণির সাথে হজরত হুজরের কর্মপন্থা বরাবরই ছিল সাংঘর্ষিক।

৭. কুফায় জিয়াদের প্রথম ভাষণ এবং হজরত হুজর রা. এর অসন্তোষের মৌলিক কারণ

জিয়াদ তার প্রথম ভাষণে কুফাবাসীকে নিরাপত্তাপ্রিয় এবং আনুগত্য প্রদর্শনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বললেন, 'আমরা যাচাই করেছি, আমাদেরও যাচাই করা হয়ে গেছে। আমরা অধীনস্থ হয়েও থেকেছি, শাসনও পরিচালনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, পরবর্তীদের অবস্থা সেই নিয়মের আলোকেই সংশোধন করা সম্ভব, যার আলোকে সংশোধন হয়েছিল

---

[৪৩৫] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/২১৮, তারিখে দিমাশক : ১২/২১৭, হুজ্‌র বিন আদির জীবনী।

[৪৩৬] তারিখে দিমাশক : ১২/২১৫, ২১৬, হুজ্‌র বিন আদির জীবনী।

পূর্ববর্তীদের অবস্থা। আর তা এমন অখণ্ড আনুগত্য, যাতে মানুষের ভেতর ও বাহির একই কথা বলে। উপস্থিত-অনুপস্থিত যেখানে একই মনের হয় এবং হৃদয় ও ভাষা অভিন্ন হয়। আমরা আরো দেখেছি, মানুষের সংশোধনের জন্য এমন কোমল হওয়া উচিত, যাতে দুর্বলদের শঙ্কা থাকে না। আবার এমন কঠোরও হওয়া উচিত, যাতে জুলুম হবে না। আল্লাহর কসম, আমি আপনাদের বিষয়ে যে কাজের দায়িত্বশীল হবো, তাকে আমি পূর্ণ করেই ছাড়ব'।

এরপর সে উমাইয়া শাসকদের নিয়ম মতো হজরত উসমান বিন আফফান রা. এবং তার সাথিবর্গের আলোচনা করেন এবং তাদের প্রশংসা করেন। আর যারা তাকে হত্যা করেছিল, তাদের জন্য বদদোয়া করেন এবং তাদের উপর অভিসম্পাৎ করেন।

তখন হজরত হুজ্র বিন আদি রা. দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ করেন।[৪৩৭]

আসল ব্যাপার এই যে, হজরত হুজ্র জানতেন যে, হজরত মুয়াবিয়ার সঙ্গীরা হজরত আলি রা. কে উসমান রা. এর হত্যাকারী বলেই বিশ্বাস করে। সুতরাং উমাইয়া বংশের লোকেরা যখনই হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের অভিশাপ দেয়, তখন এর দ্বারা হজরত আলি রা. ও তার সঙ্গীরাই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকেন। আর এটা তো স্পষ্ট যে, হজরত আলি রা. এর একজন ভক্ত যখন এ বিষয়টি জানতে পারেন, তখন হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করলে তা সহ্য করতে পারবেন না। হজরত হুজ্র যেহেতু এ বিষয়টি জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন, তাই তিনি হজরত মুগিরা রা. এর খুতবার মধ্যেও হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের জন্য বদদোয়া করার সময় প্রতিবাদ করেছিলেন। জিয়াদের ক্ষেত্রেও তিনি সেটাই করেছেন।

৮. জিয়াদের পক্ষ থেকে বিরোধ মীমাংসার প্রচেষ্টা এবং সংলাপ

হজরত হুজর রা. এর ভুল ধারণা দূর করার জন্য জিয়াদ অবশ্যই চেষ্টা করেছেন। তাকে নিরালায় ডেকে জিয়াদ বলেছিলেন, 'হে আবু আবদুর রহমান, আপনি জানেন যে, হজরত আলির সঙ্গে আমার কেমন আন্তরঙ্গ

---

[৪৩৭] তারিখুত তাবারি : ৫/২৫৫, ২৫৬, আবু আওয়ানা থেকে বর্ণিত, তারিখে দিমাশক : ১২/২১৭, হুজ্র বিন আদির জীবনী।

সম্পর্ক ছিল। তাই আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আপনি কোনো অপছন্দনীয় কাজ করবেন না'।[৪৩৮]

কিন্তু হজরত হুজরের ভুল ধারণা এতে দূর হলো না। পরে জিয়াদ আবারও চেষ্টা করলেন। এবার স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'দেখুন, একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমি এবং আপনি হজরত আলি রা. এর সঙ্গে কেমন (বিশ্বস্ত ও উৎসর্গপ্রাণ) ছিলাম, তা আমিও জানি, আপনিও জানেন। কিন্তু এখন অবস্থা ভিন্ন। আপনার স্বভাবের ক্ষিপ্রতার কথা আমার জানা। সুতরাং আপনি আপনার জিহ্বা সংযত করুন এবং নিজের ঘরে আরাম করে বসুন। এই অজ্ঞদের থেকে সাবধান থাকুন। এরা যেন আপনাকে তাদের সমমনা বানাতে না পারে। আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমার হাতে আপনার রক্তের একটি ফোঁটাও যেন না ঝরে'।

হজরত হুজ্‌র রা. বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি'।

কিন্তু যখন তিনি তার ঘরে যান এবং দাঙ্গাবাজ লোকেরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিয়াদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের অবস্থা শোনে, তখন তারা আবারও তাকে জিয়াদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দেয়। তারা বলে, 'সে তো আপনার প্রতি কোনো কল্যাণকামনা করেনি'।

ফলে জিয়াদের কথোপকথন এবং ভীতিপ্রদর্শন, সব ব্যর্থ হয়ে যায়।[৪৩৯]

৯. জিয়াদের বসরা গমন এবং কুফার অবস্থার পরিবর্তন

জিয়াদের নিয়ম ছিল, ছ' মাস কুফায় থাকতেন, আর ছ' মাস বসরায়। যখন তার বসরা গমনের সময় হলো, তখন তার সবচেয়ে বড় আশঙ্কা এটাই ছিল যে, পেছনে হজরত হুজ্‌র বিন আদি কোনো হাঙ্গামার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেন। আর অবস্থা এমন ছিল যে, হজরত হুজ্‌র যদি শান্ত থাকতেন, তা হলে অন্যদের থেকে তেমন কোনো আশঙ্কা ছিল না। কেননা আসল দাঙ্গাবাজদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। কিন্তু হজরত হুজ্‌র বিন আদি রা. এর ভক্তবৃন্দের দল ছিল বেশ ভারী। তাতে হজরত

---

[৪৩৮] তারিখে দিমাশক : ১২/২১৪

[৪৩৯] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/২১৮,

আমর ইবনুল হামিক রা. এর মতো সাহাবি, হজরত রিফাআ বিন শাদ্দাদের মতো বিশিষ্ট তাবেয়ি এবং বহু সহিহ আকিদাসম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান মুসলমান শামিল ছিলেন। এরা সবাই হুজর বিন আদির ইলম, মর্যাদা এবং দুনিয়াবিমুখিতা ও খোদাভীতির দ্বারা সীমাহীন প্রভাবিত ছিলেন। সুতরাং হজরত হুজ্‌র রা. যদি কোনো পদক্ষেপ নিতেন, তা হলে আশঙ্কা ছিল যে, বহু মানুষ চিন্তাভাবনা ছাড়াই তার অনুসরণ করত। আর এভাবে মুসলমানদের ঐক্য ভেঙ্গে যেত। এর ফলে হয়তো আবারো হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের মতো, কিংবা জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনের মতো কোনো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যেত। তাই জিয়াদ বসরা যাওয়ার সময় হজরত হুজ্‌র বিন আদির সঙ্গে বিস্তারিত কথোপকথন করেন। প্রথমে তিনি চেষ্টা করেন তাকে বুঝিয়ে নিজের সাথে বসরা নিয়ে যাবেন। জিয়াদ তাকে বললেন, 'আপনার সাথে আমার উত্তম আচরণ আশা করি আপনি দেখতে পেয়েছেন। আমি চাই, আপনি আমার সাথে বসরায় চলুন। আপনাকে পেছনে রেখে যাওয়া আমার কাছে ভালো লাগছে না। কেননা হয়তো আমার বসরায় যাওয়ার পর আপনার সম্পর্কে আমার কাছে এমন কোনো সংবাদ পৌঁছবে, যা আমার অপছন্দ হবে। সুতরাং আপনি যদি আমার সঙ্গে থাকেন, তা হলে এমন কোনো বিষয় আমার অন্তরে আসবে না।

দেখুন, হজরত আলি রা. সম্পর্কে আপনার আবেগ ও অনুভূতির কথা আমি জানি। আমার হৃদয়েও এমন আবেগ ও অনুভূতি ছিল। কিন্তু আমি যখন দেখলাম আল্লাহ তায়ালা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ হজরত মুয়াবিয়া রা. এর হাতে দিয়ে দিয়েছেন, তখন আমি আল্লাহর উপর তো কোনো অভিযোগ করতে পারি না। বরং আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উপরই সন্তুষ্ট। হজরত আলি এবং তার সঙ্গীদের ব্যাপারটি যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে, আমি তো তা-ও দেখেছি (হজরত হাসান রা. শাসনক্ষমতা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর হাতে সঁপে দিয়েছেন)। সুতরাং আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি এমন কোনো বিষয়ের দায় কাঁধে নেবেন না, যাতে সামান্য জড়িয়ে পড়াও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় (অর্থাৎ শাসকশ্রেণির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার তত্ত্বাবধান করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাণনাশের কারণ হয়ে থাকে)।

হজরত হুজর বিন আদি রা. অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে জিয়াদের সাথে বসরায় যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন।[৪৪০]

জিয়াদ হজরত আমর বিন হুরাইস রা. কে স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে বসরা চলে যান। আর এদিকে ঘটনা তা-ই ঘটে, যার আশঙ্কা তিনি করেছিলেন। হজরত আলির প্রতি অতিভক্তির দাবিদারদের দল ক্রমেই ভারী হতে থাকে। হজরত হুজ্‌র যখন জামে মসজিদে গমন করতেন, তখন এরা প্রকাশ্যে তার সঙ্গে থাকত।[৪৪১] হজরত আমর বিন হুরাইস রা. এ পরিস্থিতি দেখে হজরত হুজ্‌র বিন আদির কাছে বার্তা পাঠান, 'আমি যতদূর জেনেছি, আপনি নিজের ব্যাপারে আমির (জিয়াদ)কে জামানত দিয়েছেন। যদি তা-ই হয়ে থাকে, তা হলে আপনার চারপাশে এরা কারা? কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, হজরত হুজ্‌র বিন আদি বার্তাবাহককে ধমক দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেন।[৪৪২]

ধীরে ধীরে কুফার কতিপয় কারি সাহেবও এ অযাচিত সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। আর এভাবে দাঙ্গাবাজদের জনবল এত বেড়ে যায় যে, কুফার প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। স্থলাভিষিক্ত শাসক হজরত আমর বিন হুরাইস রা. এর কোনো আদেশই আর কার্যকর হতে পারছিল না।[৪৪৩]

১০. হজরত হুজ্‌র রা. এর প্রতিবাদী সংগ্রাম এবং কুফায় জিয়াদের জরুরি প্রত্যাবর্তন

একদিন হজরত আমর বিন হুরাইস মসজিদে খুতবা প্রদান করছিলেন। এমন সময় হজরত হুজ্‌র বিন আদি ও তার সঙ্গীরা তাকে দোষারোপ করে এবং তার গায়ে পাথর নিক্ষেপ করে।[৪৪৪]

---

[৪৪০] তারিখে দিমাশক : ১২/২১৬, বুগয়াতুত তলাব : ৫/২১১৪, ২১১৫, ইমাম হাকেম তার মুসতাদরাকেও এ বর্ণনাটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন, হাদিস : ৫৯৭২

[৪৪১] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/২১৮; তারিখে দিমাশক : ১২/২১৭, বুগয়াতুত তলাব : ৫/২১১৫

[৪৪২] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/২১৮, তারিখে দিমাশক : ১২/২১৭, বুগয়াতুত তলাব : ৫/২১২১

[৪৪৩] তারিখে দিমাশক : ১২/২১৬, বুগয়াতুত তলাব : ৫/২১২০

[৪৪৪] তারিখে দিমাশক : ১২/২১৪

অবশেষে হজরত আমর বিন হুরাইস নিরুপায় হয়ে জিয়াদকে লিখে পাঠান-'হজরত হুজর ও তার অনুসারীরা আমাকে অসহায় করে দিয়েছে। এখন আপনি যা ভালো মনে করেন, তা-ই করুন'।

সাথে তিনি একথাও লিখে দেন- 'যদি আপনার কুফানগরীর কোনো প্রয়োজন থাকে, তা হলে যা করার জলদি করুন'।

এ বার্তা পেয়েই জিয়াদ দ্রুত কুফায় ফিরে আসে।৪৪৫ জিয়াদের আগমনের খবর পেয়ে হজরত হুজ্‌র বিন আদি রা. তিন হাজার সশস্ত্র মানুষ নিয়ে বাইরে আসেন এবং মসজিদে উপস্থিত হন। জিয়াদ মসজিদে খুতবা প্রদান করতে চাচ্ছিলেন। কেবল এতটুকু বললেন যে, নিঃসন্দেহে এটা আমিরুল মুমিনিনের অধিকার..., অমনি হজরত হুজ্‌র বিন আদি চিৎকার করে ওঠেন- মিথ্যা, মিথ্যা। সাথে এক মুষ্ঠি পাথর নিক্ষেপ করেন। জিয়াদ মিম্বার থেকে নেমে নামাজ আদায় করে ঘরে চলে যান।[৪৪৬]

১১. সমঝোতার শেষপ্রচেষ্টা

পরিস্থিতি বেশ উত্তেজনাকর হয়ে উঠেছিল। বিরোধের অঙ্গারগুলো যেকোনো সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হতে পারত। জিয়াদ আরেকবার সমঝোতার চেষ্টা করলেন। জিয়াদ তিনজন বিশিষ্ট সাহাবি : হজরত আদি বিন হাতিম তায়ি, হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালি এবং হজরত খালেদ বিন উলফুতা রা. কে প্রধান বানিয়ে কুফার সম্ভ্রান্ত লোকদের একটি প্রতিনিধি দলকে হজরত হুজ্‌র বিন আদির কাছে পাঠালেন। উদ্দেশ্য ছিল, তারা যেন তাকে দাঙ্গাবাজদের নেতৃত্ব প্রদান থেকে বিরত থাকেন। সাথে সাথে আমিরদের বিরুদ্ধে কথা বলতে নিষেধ করবেন। কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, এরা যখন হজরত হুজ্‌র বিন আদির কাছে পৌঁছলেন এবং তাদের দাবি বর্ণনা করতে শুরু করলেন, তখন হজরত হুজ্‌র বিন আদি তাদের কথা শ্রবণের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখালেন না। শেষে এই প্রতিনিধি দল ফিরে গিয়ে জিয়াদকে সব ঘটনা বলল। পাশাপাশি এ ব্যাপারে তাকে নমনীয়তা অবলম্বন করার

---

[৪৪৫] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/২১৮, তারিখে দিমাশক : ১২/২১৬, ২১৮

[৪৪৬] তারিখে দিমাশক : ১২/২১৪, হুজ্‌র বিন আদির জীবনী।

উপদেশ দিল। কিন্তু জিয়াদ ছিলেন কঠোর মেজাজের অনমনীয় শাসক। এজাতীয় ক্ষেত্রে তিনি ছাড় দেওয়ার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বললেন, 'এখনো যদি আমি তার সাথে নম্র আচরণ করি, তা হলে আমি আবু সুফিয়ানের পুত্র নই'।[৪৪৭]

১২. হুজর বিন আদিকে গ্রেফতারের ব্যবস্থা

জিয়াদ তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে কুফার লোকদেরকে লক্ষ করে বলল, 'সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। রহমত বর্ষিত হোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। পরকথা এই যে, মনে রাখবেন, জুলুম ও বিদ্রোহের পরিণতি বড়ই করুণ হয়ে থাকে। এই দাঙ্গাবাজ লোকগুলো দল পাকিয়ে বিপথগামী হয়েছে। তারা নিজেদের ব্যাপারে আমাকে নিরাপদরূপে পাওয়ার কারণে নির্ভীক হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম, হে লোকসকল, তোমরা যদি সোজা না হও, তবে রোগের চিকিৎসায় উপযুক্ত ঔষধই আমি ব্যবহার করব'।[৪৪৮]

পুলিশ-অফিসার শাদ্দাদ হেলালি হুসাইন বিন আবদুল্লাহ নামের জনৈক সৈনিককে পাঠান হুজ্‌র বিন আদিকে আমিরের প্রাসাদে ডেকে আনার জন্য। কিন্তু হজরত হুজ্‌র রা. আসতে অস্বীকার করেন। শাদ্দাদ হেলালি তখন গ্রেফতারের জন্য বাহিনী পাঠালেন। কিন্তু হজরত হুজ্‌র রা. এর সাথিরা তাদেরকে হুমকি-ধমকি দিয়ে ফিরিয়ে দেয়।[৪৪৯]

এদিকে জিয়াদ কুফার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমবেত করেন এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় একটি ভাষণ প্রদান করেন। তাতে তিনি তাদেরকে আদেশ দিয়ে বলেন, প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনকে হুজ্‌র বিন আদি থেকে পৃথক করে দেওয়ার চেষ্টা করে।

এ কৌশলটি বেশ ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। কুফার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বোঝানোর ফলে অধিকাংশ লোক হুজ্‌র বিন আদির সঙ্গ ছেড়ে চলে আসে।

---

[৪৪৭] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/২১৮, ২১৯

[৪৪৮] তারিখুত তাবারি : ৫/২৫৬

[৪৪৯] তারিখুত তাবারি : ৫/২৫৭, তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/২১৯,

তারপর পুলিশ বাহিনী হুজ্র বিন আদিকে গ্রেফতারের জন্য পুনরায় চেষ্টা করে। তখন দু'দলের মধ্যে লড়াই বেধে যায়। কিছু মানুষ আহত হয়। পুলিশ বাহিনী হজরত হুজ্র বিন আদিকে যদিও গ্রেফতার কারতে ব্যর্থ হয়, তবে এর ফলে তার সহযোগী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরই মধ্যে হজরত হুজ্র বিন আদি পালিয়ে তার গোত্রের এলাকায় গিয়ে আত্মগোপন করেন। তার গোত্রের নাম ছিল কিন্দা।

পুলিশের ব্যর্থতার পর জিয়াদ স্থানীয় গোত্রসমূহের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। তারপর তাদেরকে হুজ্র রা. এর সন্ধানে কিন্দা পাঠিয়ে দেন। তারা সেখানে যাওয়ার পর আরো একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। কিন্তু সেখানেও হজরত হুজ্রকে গ্রেফতার করা যায়নি।

হজরত হুজরের চারপাশে সংঘবদ্ধ হওয়া লোকগুলো ছিল চরম ধোঁকাবাজ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তারা দ্রুত শটকে পড়ল। অবশিষ্ট রইল হজরত হুজরের কেবল ঘনিষ্ঠ সাথিরা। হজরত হুজ্র তাদেরকে বিপদে ফেলাটা ভালো মনে না করে তার কাছ থেকে সরিয়ে দেন।[৪৫০]

১৩. হজরত হুজ্র রা. এর গ্রেফতার ও অপরাধপত্র প্রস্তুতীকরণ

অবশেষে একদিন ঘটনাক্রমে জিয়াদ জেনে ফেললেন যে, হজরত হুজ্র কোথায় আছেন। জিয়াদ একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে পাঠিয়ে হজরত হুজ্রকে তার কাছে উপস্থিত হতে বলেন। হজরত হুজ্র জিয়াদের কঠোর মেজাজের কথা জানতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জিয়াদ তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে ছাড়বে না। তাই বিভিন্নজনের পরামর্শে তিনি হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালি রা. কে সুপারিশের জন্য প্রেরণ করেন। হজরত জারির রা. জিয়াদের কাছে গিয়ে শর্ত রাখেন যে, জিয়াদ হজরত হুজ্রকে হত্যা করবেন না। বরং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন হজরত মুয়াবিয়া রা.।

জিয়াদ এ শর্ত মঞ্জুর করেন। ফলে হজরত হুজ্র বিন আদি প্রশাসনের হাতে আত্মসমর্পণ করেন।[৪৫১]

---

[৪৫০] তারিখুত তাবারি : ৫/২৫৭-২৬২

[৪৫১] তারিখে দিমাশক : ১২/২১৬, হুজ্র বিন আদির জীবনী।

এখান থেকে মনে হয়, হজরত হুজ্র বিন আদি নিজের অপরাধ সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি পূর্ণ নিরাপত্তা পূর্ণ আটকের পর তিনি নিজে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং জিয়াদকে বলেন, আমি হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বাইয়াতের উপর আছি, আমি তার থেকে বিমুখ হইনি।

জিয়াদ ভাবলেন, প্রথমত হজরত হুজরের বিদ্রোহের প্রমাণ খলিফার দরবারে পেশ করা দরকার। তাই তিনি কুফার ৭০জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সমবেত করে তাদের থেকে হুজ্র রা. এবং তার সাথিদের বিপক্ষে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করলেন। এদের মধ্যে হজরত আমর বিন হুরাইস, হজরত খালেদ বিন উরফুতা, হজরত ওয়ায়েল বিন হুজ্র, হজরত কাসির বিন শিহাবও ছিলেন।[৪৫২]

তারপর জিয়াদ সকল সাক্ষী এবং হজরত হুজ্র বিন আদি এবং তার সাথিদেরকে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে খেলাফতের রাজধানী দামেশকে পাঠিয়ে দেন।[৪৫৩] সাথে একথাও লিখে দেন যে, আপনার সাথে কথা বলা পর্যন্ত অপরাধীদের জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে।[৪৫৪]

১৪. মামলা সম্পর্কে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর চিন্তাভাবনা

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সম্মুখে অপরাধ সম্পর্কে সাক্ষীদের প্রমাণপত্র পাঠ করা হলো। পাশাপাশি সাক্ষীরা তাদের বক্তব্য প্রদান করলেন।[৪৫৫] হুজর এবং তার সাথিদের দামেশকের উপকণ্ঠে 'মারজে আযরা' নামক স্থানে রাখা হয়। এ এলাকাটি হজরত উমর ফারুক রা. এর যুগে হজরত হুজর বিন আদিই জয় করেছিলেন। হজরত মুয়াবিয়া রা. যখন অপরাধীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন, তখন হুজর রা. 'আমিরুল মুমিনিন' বলে সালাম করলেন।

---

[৪৫২] তারিখুত তাবারি : ৫/২৬৮, ২৬৯, তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/২১৯
[৪৫৩] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/২১৯
[৪৫৪] বুগয়াতুত তলাব : ৫/২১১৬, ২১১৮
[৪৫৫] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/২১৯

হজরত মুয়াবিয়া বিরক্তিমাখা চেহারায় বললেন, 'এখনো আমি (তোমার কাছে) আমিরুল মুমিনিন?

হজরত হুজর বিন আদি রা. তখন বাইয়াতের উপর আছেন বলে স্বীকারোক্তি প্রদান করলেন। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না।[৪৫৬]

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে শাস্তি প্রদানের অধিকারও ছিল, ক্ষমা করে দেওয়ার সুযোগও ছিল। শাস্তি প্রদান সম্পর্কে আল্লাহর নবীর এ হাদিস উপস্থিত ছিল,

> من اراد ان يفرق هذه الامة وهى جميع فاضربوا بالسيف كائنا ما كان
>
> এই উম্মত যখন একতাবদ্ধ থাকবে, তখন যদি কেউ এদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়, তা হলে তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করো, চাই সে যে-ই হোক।[৪৫৭]

অন্যদিকে হজরত হুজরের মর্যাদা ও অবস্থান, ভুলের শিকার হয়ে বিদ্রোহে শরিক হওয়া এবং এখন বাইয়াতের উপর থাকার স্বীকারোক্তি প্রদান করা, এ বিষয়গুলো হজরত মুয়াবিয়া রা. কে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিল। তাই ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমাও করতে পারতেন। তার ব্যক্তিগত ইচ্ছাও ছিল ক্ষমা করে দেওয়া। তবে এ আশঙ্কাও তার মনে ছিল যে, ক্ষমা করে দিলে দাঙ্গাবাজরা হয়তো আবারো তার নেতৃত্বে হাঙ্গামা বাধাতে পারে। এই দোদুল্যমানতার কারণেই হজরত মুয়াবিয়া জিয়াদকে লিখে পাঠালেন যে, 'হুজ্‌র এবং তার সঙ্গীদের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য এবং সাক্ষীদের কথার উপর চিন্তাভাবনার পর আমার কাছে কখনো মনে হয় তাকে হত্যা করাই উত্তম। আবার কখনো মনে হয় ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম'।[৪৫৮]

---

[৪৫৬] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৫৯৮১, বুগয়াতুত তলাব : ৫/২১১৬, ২১১৯ কোনো বর্ণনায় আছে, হজরত মুয়াবিয়া রা. র অপরাধীদেরকে দেখারও ইচ্ছা হচ্ছিল না। তাই তিনি বলেছিলেন, لا احب ان اراهم 'আমি তাদের চেহারা দেখতে চাই না'। (দ্রষ্টব্য : তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/২১৯) কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি অপরাধীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

[৪৫৭] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৯০২, কিতাবুল ইমারাহ, হুকমু মান ফার্‌রাকা আমরাল মুসলিমিন।

[৪৫৮] তারিখুত তাবারি : ৫/২৭২

অন্যদিকে হজরত মুয়াবিয়া রা. তার আমিরদেরকে সমবেত করে পরামর্শ চাইলেন। তখন হজরত আমর ইবনুল আসওয়াদ, হজরত আবু মুসলিম খাওলানি, ইয়াজিদ বিন আসাদ এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদের মত ছিল, তাকে শাস্তি দিলে যথাযথ হবে। তবে ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম।[৪৫৯] কিন্তু এ চারজন ব্যতীত অন্য সবার জোরালো দাবি ছিল অপরাধীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক।[৪৬০]

ইত্যাবসরে জিয়াদের উত্তরও এসে পৌঁছল। তিনিও মৃত্যুদণ্ড প্রদানের উপর জোর দিয়ে লিখলেন, 'আমি বড় অবাক হচ্ছি যে, এ ব্যাপারে আপনার দোদুল্যতা কেন হচ্ছে? যদি আপনার এ শহরের (কুফার) প্রয়োজন থাকে, তা হলে হুজ্‌র ও তার সাথিদেরকে আমার কাছে ফেরত পাঠাবেন না'।[৪৬১]

১৫. মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকর করা হলো

তাকদিরের অমোঘ সিদ্ধান্ত এমনই ছিল। তাই হজরত মুয়াবিয়া রা. তার স্বভাবজাত ধৈর্য ও সহনশীলতার বিপরীতে জিয়াদের মতকেই মেনে নিলেন এবং হজরত হুজ্‌র ও তার সঙ্গীদেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলেন। অপরাধীরা মারজে আজরা নামক স্থানে বন্দি অবস্থায় ছিল এবং সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছিল। সেখানেই তাদের শিরশ্ছেদ করা হয়।[৪৬২]

হত্যার পূর্বে হজরত হুজর বিন আদির সর্বশেষ আমল ছিল দু'রাকাত নামাজ।[৪৬৩] নামাজ থেকে অবসর হয়ে তিনি বললেন, 'আমার বেড়ি খুলবে না, আমাকে গোসল দেবে না, বরং আমার রক্ত ও বেড়ি সহকারেই আমাকে দাফন করবে। আগামীকাল এই বেশেই আমি মুয়াবিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই'।

এরপর তাকে হত্যা করা হয়।[৪৬৪]

---

[৪৫৯] তারিখে দিমাশক : ১২/২২০, ২২৪, বুগয়াতুত তলাব : ৫/২১১৭, সনদ- হাসান।

[৪৬০] তারিখে দিমাশক : ১২/৩০৩, সনদ- হাসান লি গাইরিহি।

[৪৬১] তারিখুত তাবারি : ৫/২৭২, ২৭৩

[৪৬২] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/২১৯

[৪৬৩] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৫৯৮১

[৪৬৪] ফকিহগণ শহিদের কাফন ও গোসল সম্পর্কে মারফু হাদিসের পাশাপাশি হজরত হুজ্‌র বিন আদির উক্ত উক্তির মাধ্যমেও প্রমাণ পেশ করে থাকেন। ইমাম সারাখসি রহ.

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর সুপারিশ

হজরত হুজ্র রা. এর গ্রেফতারের সংবাদে ইরাক থেকে হিজাজ পর্যন্ত শোকের ছায়া নেমে এলো। তাকে আটক করার সংবাদ পেয়েই উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. হজরত আবদুর রহমান বিন হারেসকে দামেশকের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে হজরত মুয়াবিয়ার কাছে সুপারিশ করে হজরত হুজ্র ও তার সঙ্গীদের জীবন রক্ষা করতে পারেন।

আবদুর রহমান বিন হারেস উম্মুল মুমিনিনের চিঠি নিয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে যখন পৌঁছলেন, তখন জল্লাদ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য শিরশ্ছেদের স্থানে চলে গিয়েছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. উম্মুল মুমিনিনের চিঠি পাঠ করেই দ্রুত একজন দূতকে এ আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন, যেন সকল অপরাধীর জীবন রক্ষা করা হয়। কিন্তু সে দূত সেখানে পৌঁছার আগেই হজরত হুজ্র বিন আদি রা. এবং তার সাত সঙ্গীর শিরশ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। অবশিষ্ট ছয়জন তখনো জীবিত ছিল। তাই তাদেরকে মুক্তি প্রদান করা হয়।[৪৬৫]

সহিহ বর্ণনা এবং তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দুর্বল বর্ণনাসমূহের আলোকে এই ছিল হজরত হুজ্র রা. এর ঘটনা সম্পর্কে একটি বাস্তবমুখী পর্যালোচনা। এ পর্যবেক্ষণ পাঠ করলে, যেকেউ বুঝতে পারবে যে, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বানোয়াট বর্ণনাগুলোতে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্য কী কী মিথ্যার সংমিশ্রণ করা হয়েছে।

আবু মিখনাফের আস্থাহীন বর্ণনা

আবু মিখনাফ ও হিশাম কালবির বর্ণনায় বলা হয়েছে, যে ছ'জন বেঁচে গিয়েছিল, তাদেরকে মূলত বড় বড় ব্যক্তিদের সুপারিশে মুক্তি দেওয়া

বলেন, وهكذا نقل عن حجربن عدى. (দ্রষ্টব্য : আল মাবসুত : ২/৫০) এমনিভাবে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ.কে যখন জিজ্ঞস করা হতো, শহিদকে কি গোসল করানো হবে?

উত্তরে তিনি হুজ্র বিন আদির এ কথা শুনিয়ে দিতেন-

لا تطلقوا عنى حديدا ولا تغسلوا عنى دما. ادفنوا نى فى وثاق ودمى. (مصنف ابن ابى شيبة، ح: ٣٢٨٠٥، ط الرشد)

[৪৬৫] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/২১৯, ২২০,

হয়েছিল। আর সাতজনকে হত্যা করা হয়েছিল, তাদের পক্ষে সুপারিশ করার মতো কেউ ছিল না।

উক্ত বর্ণনায় একথাও বলা হয়েছে যে, জল্লাদ প্রত্যেক অপরাধীর শিরশ্ছেদ করার সময় তাতে হজরত আলির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছিল। কেননা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর আদেশ ছিল, যে ঘৃণা প্রকাশ করবে তাকে মুক্তি দিয়ে দেবে। অথচ এটা কেবল আবু মিখনাফ থেকেই বর্ণিত।

এমনিভাবে কোনো কোনো অপরাধীকে ঘৃণা প্রকাশ না করার কারণে কুফায় পাঠিয়ে জীবিত দাফন করার কথাও আবু মিখনাফের বানোয়াট বর্ণনায় পাওয়া যায়।[৪৬৬]

হুজ্‌র রা. এর হত্যার ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেয়িদের অভিমত

হজরত হুজ্‌র রা. এর শিরশ্ছেদের ফলে গোটা মুসলিমবিশ্বে শোকের আবহ সৃষ্টি হয়েছিল। হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. আগে থেকেই হুজ্‌র রা. এর খোঁজখবর রাখতেন। যখন তার শিরশ্ছেদের খবর শুনলেন, এত কাঁদলেন যে, শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো।[৪৬৭] এমনিভাবে খোরাসানের সিপাহসালার হজরত রাবি বিন জিয়াদ হারেসির কাছে যখন এই হত্যার সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি লোকজনকে জড়ো করে নিজের মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে শুরু করলেন। তারপর, কী আশ্চর্য! দোয়া শেষ করে মজলিস থেকে ওঠার আগেই তার রুহ দেহ ছেড়ে চলে গেল।[৪৬৮]

---

[৪৬৬] এই অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাগুলো আছে তাবারিতে : ৫/২৭৫-২৭৭ পর্যন্ত।

[৪৬৭] তারিখে দিমাশক : ১২/২১০, তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি: ৪/১৯৪,

[৪৬৮] তারিখুত তাবারি : ৩/২১০;

মুফতি তাকি উসমানি এসব ঘটনার উপর মন্তব্য করে বলেছেন, 'হুজ্‌র বিন আদি একজন বড় ইবাদতকারী ও নির্মোহ মানুষ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর এটা স্বাভাবিক যে, ঘটনার পূর্ণ বিবরণ না জানা অবস্থায় কেউ যদি শোনে যে, হুজ্‌র বিন আদিকে হত্যা করা হয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই সে দুঃখ ও আফসোস প্রকাশ করবে। কিন্তু এ আফসোস ও পরিতাপ এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কী করে প্রমাণ হতে পারে, যার সম্মুখে ৪৪ জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন? এবং তারা সকলে এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, হুজ্‌র বিন আদি বিদ্রোহ করেছিলেন? (হজরত মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক, পৃষ্ঠা : ৯৩)

হজরত হুজ্‌র বিন আদির মৃত্যুতে দারুণভাবে বেদনাহত হয়েছিলেন তার আপন বোন। ভাইয়ের বিরহ-বেদনায় কাতর হয়ে তিনি শোকগাথা রচনা করেছিলেন, তা ছিল অত্যন্ত ব্যথাতুর ও অশ্রুসিক্ত। আরবিসাহিত্যে সেই কবিতাগুলোকে মনে করা হয় সাহিত্য ও অলংকারের উৎকৃষ্ট নমুনা। নিম্নে তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করা হলো।

ترفّع أيها القمر المنير ❁ تبصَّر هل ترى حجراً يسير

হে উজ্জ্বল চাঁদ, তুমি আরো ঊর্ধ্বে ওঠো, আরো ঊর্ধ্বে, তারপর বল, তুমি কি হুজ্‌রকে চলতে দেখছ?

يسير إلى معاوية بن حرب ❁ ليقتله كما زعم الأمير

যে চলেছে মুয়াবিয়া ইবনে হারবের দিকে, কারণ, তিনি হুজ্‌রকে হত্যা করবেন, যেমনটি দাবি করেছেন আমির (জিয়াদ)।

وأصبحت البلاد له محولاً ❁ كأن لم يحيها زمنٌ مطر

হুজ্‌রের পুরো শহর বিরান হয়ে গেছে, যেন কোনো দিন বর্ষণকারী পানি তাকে জীবন দান করেনি।

ألا يا حجر حجر بن عديٍ ❁ تلقّتك السلامة والسرور

শোন হে হুজ্‌র, হে হুজ্‌র বিন আদি, পরকালে তুমি সুখে-আনন্দে থাক।

فإن تهلك فكلُّ عميد قومٍ ❁ إلى هلكٍ من الدنيا بصير

তুমি যদি বিনাশ হয়ে যাও, তাতে এমন কী হয়েছে? প্রতিটি জাতির নেতাকেই তো দুনিয়া থেকে বিনাশের দিকেই যেতে হবে।[৪৬৯]

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বেদনা ও পরিতাপ

হজরত মুয়াবিয়া রা. নিজেও কিছুদিন পর বুঝতে পেরেছিলেন যে, হুজ্‌র বিন আদির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদানের সময় কঠোর মেজাজের পরামর্শদাতাদের মত তার উপর প্রবল হয়ে গিয়েছিল। অন্যথায় তাকে ক্ষমা করে দেওয়া কিংবা বেশি থেকে বেশি বন্দি করে রাখাই ছিল উত্তম।

---

[৪৬৯] বুগয়াতুত তলাব : ৫/২১২৪; তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/২২০

হজরত আয়েশা রা. এর দূত আবদুর রহমান বিন হারেস যখন হজরত মুয়াবিয়াকে বললেন, আপনি হুজ্‌র বিন আদিকে কারাগারে বন্দি করলেন না কেন? হয়তো সে প্লেগ ইত্যাদি কোনো মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত।

হজরত মুয়াবিয়া রা. পরিতাপের স্বরে বললেন, কারণ, আমার পরামর্শদাতাদের মধ্যে তোমার মতো কেউ ছিল না।[৪৭০]

একইভাবে উমাইয়া বংশের স্তম্ভ মারওয়ান বিন হাকাম হুজ্‌র বিন আদির সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে হজরত মুয়াবিয়া রা. কে লিখে পাঠালেন, 'আপনার চিন্তা ও দূরদর্শিতা এবং সহনশীলতা কোথায় চলে গিয়েছিল, যা আপনার থেকে আশা করা হচ্ছিল?

হজরত মুয়াবিয়া রা. উত্তরে লিখলেন, 'কারণ, তুমি আমার কাছে ছিলে না'।[৪৭১]

কিন্তু এর সাথে সাথে হজরত মুয়াবিয়া একথা চিন্তা করছিলেন যে, হজরত হুজ্‌র বিন আদিকে ছেড়ে দিলে আবারো হানাহানি ও রক্তপাতের এক নতুন ধারার সূচনা হয় কি না। তাই তিনি একথাও বলতেন যে, 'এক লক্ষ মানুষ নিহত হওয়ার চেয়ে একজন নিহত হওয়া ভালো'।[৪৭২] অর্থাৎ তিনি ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে মুসলিম উম্মাহকে এক নতুন গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা করার জন্যই এই তিক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অন্যথায় হজরত হুজ্‌র রা. এর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত কোনো রেশারেশি ছিল না, আবার হজরত হুজরের সম্মান ও মর্যাদাও তার কাছে অজ্ঞাত ছিল না।

হজরত মুয়াবিয়া রা. দীর্ঘদিন পর্যন্ত হজরত হুজ্‌র বিন আদির শিরশ্ছেদের কথা স্মরণ করতে থাকেন। আসলে এটি ছিল দায়িত্ব ও সম্পর্কের এক কঠিন পরীক্ষা এবং অন্তর ও আত্মার এক গভীর আঘাত।[৪৭৩]

---

[৪৭০] আল ইসতিয়াব : ১/৩২৯, তাহযিবুল কামাল : ১৭/৪২, ৪৩,

[৪৭১] তারিখে দিমাশক : ১২/২৩০

[৪৭২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/২৩৯

[৪৭৩] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৫৯৮০

قال الروى: وما دخلنا معه عليه (اى مع جرير على معاوية) الا ذكر قتل حجربن عدى

হজরত আয়েশার অসন্তোষ এবং হজরত মুয়াবিয়ার অপারগতা প্রকাশ

এ নির্মম ঘটনার পর হিজরি ৫৬ সনে হজরত মুয়াবিয়া যখন হজের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং মদিনায় উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন হজরত আয়েশা রা. হজরত মুয়াবিয়ার উক্ত সিদ্ধান্তের কারণে অত্যন্ত অসন্তোষ ও ক্রোধ প্রকাশ করেন।

হজরত মুয়াবিয়া রা. বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করে বলেন, 'প্রিয় মা জননী, এক ব্যক্তিকে হত্যা করে সকলের জীবন রক্ষা করা আমার কাছে উত্তম মনে হয়েছে তাকে ছেড়ে দিয়ে সকলকে ধ্বংস করার চেয়ে। প্রিয় মা জননী, আমার আশঙ্কা ছিল, বিষয়টা আরো বড় আকার ধারণ করতে পারে এবং এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, যখন রক্তপাত ঘটতে থাকবে এবং হালাল ও হারামের সীমারেখা মুছে যাবে। হজরত হুজর ও আমার বিষয়টি আপনি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন'।

উম্মুল মুমিনিন বললেন, 'আল্লাহর কসম, আপনার বিষয় আমি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়েছি'।[৪৭৪]

---

[৪৭৪] তারিখে দিমাশক : ১২/২২৯, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/২৪২, সনদ হাসান।

নোট : উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. ও হজরত মুয়াবিয়া রা. র উক্ত কথোপকথন থেকে বুঝে আসে যে, অনেক সময় শাসকবর্গকে এমন এমন অবস্থা মোকাবিলা করতে হয়, যেখানে তারা আল্লাহ ও তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়ে যায়। কিন্তু তার সে অপারগতা ও বাধ্যবাধকতা আদলতের সাক্ষ্য-প্রমাণের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয় না। সুতরাং আদালতের নিয়ম অনুসারে সাক্ষ্য উপস্থিত করে সে অপরাগতার জেরা করা হয়, তাহলে তা ভুল প্রমাণিত হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তাদের বিশ্বাস থাকে যে, এ সিদ্ধান্ত না নিলে দেশের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে, তাহলে তার জন্য সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে সে নিজর বিবেকের কাছে যেমন অপারগ বলে গণ্য হবে, তেমনি আল্লাহর দরবারেও তাকে অপারগ বলে গণ্য করার আশা করা যায়। যদিও মানুষের দৃষ্টিতে সে অভিযোগের উপযুক্ত হয়ে যায়।

সম্ভবত একারণেই হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. র সঙ্গে কোনো ফিকহি আলোচনা করেননি এবং তার গৃহীত সিদ্ধান্তের পক্ষে কোনো শরয়ি দলিল পেশ করেননি। বরং আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি থেকে তিনি যা অনুভব করেছিলেন, সেদিকে ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত থেকেছেন। যদিও স্বয়ং উম্মুল মুমিনিন ও

হজরত মুয়াবিয়া রা. যখন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন একদিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াজিদ তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য এলেন। তার পিতা ইয়াজিদ হুজ্‌র বিন আদিকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য হজরত

সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টিতে এ আশঙ্কা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া যা জরুরি মনে করেছেন, তা-ই করেছেন। তাই তিনি হজরত আয়েশার সঙ্গে কথোপকথন শেষ করেছেন এই বাক্যটি দিয়ে- 'হজরত হুজ্‌র ও আমার বিষয়টি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন'।

বস্তুত হজরত মুয়াবিয়ার এ অনুভূতির সঙ্গে হজরত আয়েশাও একমত পোষণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি আপনার বিষয় আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়েছি। অর্থাৎ বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি হজরত মুয়াবিয়ার উক্ত সিদ্ধান্তের সাথে যতই মতবিরোধ পোষণ করুন, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতির ক্ষেত্রে তিনিও হজরত মুয়াবিয়াকে সুযোগ দিয়ে দিয়েছেন।

আব্বাসি খলিফা মামুনুর রশীদের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি উক্ত স্পর্শকাতর বিষয়েরই এক চমৎকার উপস্থাপনা, যেখানে তিনি বলেছেন, 'অনেক সময় শাসকরা বিশেষ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে এমন কিছু করে, যে সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কখনোই ন্যায়ানুগ মত পোষণ করতে পারে না। জনসাধারণ শুধু এতটুকু দেখে যে, উজির বা স্থলাভিষিক্ত শাসক এমন বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছে যে, তার ঋণ থেকে শাসক কখনোই মুক্ত হতে পারবে না। ফলে নিঃসঙ্কোচে তারা বুঝে নেয় যে, শাসক যা করেছে, কেবল হিংসা ও বদমেজাজির কারণেই করেছে। অথচ তারা বুঝতে পারে না যে, সেই বিশেষ ব্যক্তিদের কিছু কাজ এমন ছিল, যা তাদের দেশকেই ধ্বংস করার সমতুল্য।

এহেন পরিস্থিতিতে শাসকরা দুটি অপারগতার মধ্যে ফেঁসে যায়। একদিকে সে সাধারণ মানুষের সম্মুখে সেই রহস্য প্রকাশও করতে পারে না, অন্যদিকে সেই উজির বা স্থলাভিষিক্তকে ক্ষমাও করতে পারে না। নিরুপায় হয়ে তাকে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যা বাহ্যিকভাবে করা অনুচিত। শাসকও জানে, সাধারণ মানুষ তো ভালো, বিশেষ লোকেরাও তাকে ক্ষমা করবে না। তবু নিরুপায় অবস্থায় কারো মন্তব্য বা সমালোচনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। (দ্রষ্টব্য : আল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন লিল জাহিয: ৩/২৪২)

কিন্তু এর অর্থ কখনোই এমন নয় যে, আজকাল বিভিন্ন দেশের মুসলিস শাসক ও নেতৃবর্গ যেভাবে শুধু সন্দেহ ও সংশয়ের ভিত্তিতে বিরোধীদলের লোকদেরকে বিচারবহির্ভূতভাবে বন্দি, হয়রানি, এমনকি হত্যা করে, সেটাও সঠিক। ইসলামি শরিয়ত তাদেরকে সে অনুমতি কখনোই দেয়নি।

হজরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে তো আমরা সুধারণা পোষণ করছি এ জন্য যে, তিনি নিজে একজন মুজতাহিদ ছিলেন। আজ কি কোনো মুজতাহিদ শাসক আছে? সুতরাং কেউ যদি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চায়, তাহলে কমপক্ষে শরিয়ত ও আইনে পারদর্শী ব্যক্তিদের সাথে অবশ্যই পরামর্শ করা উচিত।

মুয়াবিয়াকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। হজরত মুয়াবিয়া রা. সে বিষয়টি স্মরণ করে বললেন, 'আল্লাহ তোমার পিতার প্রতি রহম করুন, তিনি হুজ্‌র বিন আদির ব্যাপারে আমাকে কল্যাণমূলক পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন।'[৪৭৫]

হজরত হুজর বিন আদি রা. এর সম্মান ও মর্যাদা এবং তার শিরশ্ছেদের নির্মম ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আলেমগণ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন। বিশেষত এ কারণে যে, তিনি একটি ব্যাখ্যার ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছিলেন এবং নিজ চিন্তা অনুসারে তিনি সত্যের জন্যই লড়াই করেছিলেন। তদুপরি তিনি বাইয়াত নবায়ন করে যেন নিজের কৃত ভুলের কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সুতরাং তার কৃতকর্মের নিষ্ঠা সম্পর্কে কথা বলা উচিত নয়। তার হত্যা নিশ্চয় একটি বড় আঘাত ছিল। কিন্তু হয়তো এটি তার ভুলত্রুটির ক্ষমার মাধ্যম এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে।

মুফতি তাকি উসমান লিখেছেন, 'হজরত হুজ্‌র বিন আদি যেহেতু একজন বড় আবেদ ও নির্মোহ মানুষ ছিলেন, আর সে কারণে তার থেকে এমন আশা করা যাচ্ছিল না যে, হজরত মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে তিনি যা কিছু করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া; তাই প্রবল ধারণা এই যে, তিনি হয়তো কোনো ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই এমনটি করেছিলেন। সুতরাং তার সম্পর্কে কথা বলার সময় আদব ও সম্মান বজায় রাখা উচিত। হয়তো উপরোক্ত কারণেই কোনো কোনো আলেম, যেমন : শামসুল আইম্মা সারাখসি রহ. তার মৃত্যু সম্পর্কে 'শাহাদাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন'।[৪৭৬]

হজরত হুজ্‌র বিন আদির সাথে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কঠোর আচরণ ছিল তার ব্যক্তিগত চিন্তা অনুযায়ী ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে নিরাপত্তা-ঝুঁকিমুক্ত ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং এ সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে তার সমালোচনা ও নিন্দা করা উচিত নয়।

[৪৭৫] তারিখে দিমাশক : ১২/২৩১, তা'জিলুল মানফাআতি লিবনি হাজার : ২/৩৬৮,

[৪৭৬] হজরত মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক, পৃষ্ঠা : ২২৬, ২২৭

তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এ ব্যাপারে অবশ্যই দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাদের কেউ হজরত মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করেননি। কেননা সিদ্ধান্তের বিচ্যুতি ও জুলুম-নির্যাতনের মধ্যকার পার্থক্য তারা খুব ভালো করে জানতেন।

আল্লাহ তায়ালা হজরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এবং হজরত হুজ্‌র বিন আদি উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং উত্তরোত্তর তাদের মর্যাদা সমুন্নত করুন। আমিন।

২. ইয়াজিদের মনোনয়ন

যেকোনো দূরদর্শী শাসকের ন্যায় হজরত মুয়াবিয়া রা. চাচ্ছিলেন, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র উভয় দিক থেকেই মুসলিমবিশ্ব হোক সুদৃঢ় ও সুসংহত। এজন্য তিনি রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় এমন কিছু পরিবর্তন আনা আবশ্যক মনে করছিলেন, যার ফলে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দূর হয়ে যাবে। আর এ কারণেই তিনি আরবজাতির নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্বকে সুবিন্যস্ত ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি নিজ গোত্রীয় শক্তির উপরই বেশি আস্থা রেখেছিলেন, যার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উমাইয়া বংশের আধিপত্য।

ইসলামি খেলাফতের পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, ক্ষমতার পালাবদলই গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই হজরত মুয়াবিয়া রা. আশঙ্কা করছিলেন, তার মৃত্যুর পর আবার এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় কি না; তাই তিনি তার হাত থেকে ক্ষমতার পালাবদলকে এমন সব ঝামেলা থেকে দূরে রাখতে চাচ্ছিলেন, যার ফলে মতবিরোধ ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় একটি বিষয় এই যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. তৎকালীন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কোনো আইন ও বিধান প্রয়োজনসাপেক্ষে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। শরিয়তের পক্ষ থেকেও এর অবকাশ ছিল।[৪৭৭]

---

[৪৭৭] আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. লিখেছেন, 'হজরত উমর ফারুক রা. যখন শামের সফরে গেলেন এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. র সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. এর রাজকীয় জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে বললেন, মুয়াবিয়া, এসব তো পারস্য সম্রাটদের প্রথা, এগুলো আপনার এখানে?

হজরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, আমিরুল মুমিনিন, আমরা দুশমনদের সীমান্তে বসবাস করি। তাদের মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে আমাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি ও জিহাদি সাজসজ্জা দেখাতে হয়।

উপরোক্ত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হজরত মুয়াবিয়া রা. তার শাসনামলের ১৬শ বছর (৫৬ হিজরিতে) এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ নিলেন। অর্থাৎ আপন পুত্র ইয়াজিদকে তার স্থলাভিষিক্ত বলে মনোনীত করলেন।

এখন এখানে প্রশ্ন হতে পারে, সাহাবায়ে কেরামের মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ইয়াজিদের মতো একজন নিম্ন মর্যাদা ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার এমন কী প্রয়োজন ছিল?

আসলে হজরত মুয়াবিয়া দেখতে পাচ্ছিলেন যে, তার শাসনক্ষমতার সিংহভাগ ভিত্তি হচ্ছে উমাইয়াবংশ এবং শামবাসীর শক্তির উপর। সে কারণে তার বংশের বাইরে থেকে কোনো উত্তম ব্যক্তিকে যদি মনোনয়ন দেওয়া হয়, তা হলে এরা গোত্রীয় পক্ষপাতের কারণে তাকে মেনে নিতে পারবে না। ফলে উম্মাহ গৃহযুদ্ধের আবারও শিকার হয়ে পড়বে।[৪৭৮]

একথা শুনে হজরত উমর রা. নীরব রইলেন। হজরত মুয়াবিয়ার কথা তিনি খণ্ডন করেননি। কারণ, হজরত মুয়াবিয়া আসলে একটি সঠিক কারণ ও দীনী উদ্দেশ্য উল্লেখ করে তার কাজের প্রমাণ পেশ করেছিলেন।

সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিনা ব্যাখ্যায় বর্জন করাই যদি রাজতন্ত্র খারাপ হওয়ার উদ্দেশ্য হতো, তাহলে হজরত মুয়াবিয়া রা. র উক্ত উত্তর হজরত উমর রা. কে আশ্বস্ত করতে পারত না। বরং তিনি হজরত মুয়াবিয়াকে সব বর্জন করার আদেশ করতেন।

অতএব, 'এগুলো তো পারস্য সম্রাটদের প্রথা' - একথা বলে হজরত উমর রা. র উদ্দেশ্য ছিল, রাজ্য পরিচালনায় পারসিকদের অনুসৃত ও অভ্যস্ত রীতিনীতি। যার ভিত্তিই ছিল জুলুম, বাড়াবাড়ি, সৃষ্টিকুলের অধিকার লুণ্ঠন করা এবং আল্লাহ থেকে উদাসীন থাকা। আর হজরত মুয়াবিয়া রা. এ কথার উত্তরে বলে দিলেন যে, আমার উদ্দেশ্য পারস্য সম্রাটের রীতিনীতি অনুসরণ করা নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। (তারিখে ইবনে খালদুন : ১/২৫৪, মুকাদ্দামাহ, ফসল-৮, বাবুন ফি ইনকিলাবিল খিলাফাতি ইলাল মুলকি)

[৪৭৮] পরবর্তী যুগের ইতিহাস হজরত মুয়াবিয়া রা. র উক্ত আশঙ্কাকে সম্পূর্ণ সঠিক বলে প্রমাণিত করেছিল। সুতরাং হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. যখন খলিফা হলেন, তখন গোটা মুসলিমজাতি তার হাতে বাইয়াত করেছিল, কিন্তু উমাইয়া বংশের আমিররা তাকে মেনে নিতে পারেনি, বরং তারা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. সাহাবি হওয়ার মর্যাদা, তার ইলম ও শ্রেষ্ঠত্বকে তারা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা

অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর উক্ত পদক্ষেপের দুটি দিক ছিল। যথা :

এক. একজন শাসকের জন্য তার মৃত্যুপরবর্তী সময়ের জন্য স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা, যাতে উম্মাহর ঐক্য অটুট থাকে। এদিকটি সম্পূর্ণ সঠিক ছিল।

দুই. দ্বিতীয় দিক ছিল নিজ সন্তানকে স্থলাভিষিক্ত বানানো। এই দ্বিতীয় দিকটিতে হজরত মুয়াবিয়া রা. থেকে ইজতিহাদি ভুল হয়ে গিয়েছিল। কেননা ব্যবস্থাপনাগত সিদ্ধান্ত ও রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এ পদক্ষেপটি সঠিক প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান, আন্তরিক ও উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামী ছিলেন। অবশ্যই তার কাছে এমন দলিল ছিল, যার ভিত্তিতে তিনি পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন। সর্বোপরি তার এ সিদ্ধান্ত শরিয়তের বৈধতার সীমারেখার মধ্যেই ছিল।

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দৃষ্টিতে তার পরবর্তী খলিফার জন্য শামবাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। কেননা তা না হলে খেলাফতের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রেই বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ দেখা দিতে পারে এবং এর ফলে গোটা মুসলিমবিশ্ব প্রভাবিত হয়ে পড়তে পারে। এ দিকটি বিবেচনা করে মুয়াবিয়া রা. ক্ষমতার পালাবদলের বিষয়টি নিজের হাতে রাখলেন এবং তার একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের পরামর্শে আপন পুত্রকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করলেন।

এর দ্বারা যদিও খেলাফত-ব্যবস্থা রাজতন্ত্রের দিকে সরে যাচ্ছিল এবং শাসনক্ষমতা একটি পৈত্রিক সম্পদে পরিণত হচ্ছিল, তবু হজরত মুয়াবিয়া মনে করছিলেন, শাসন পরিচালনার মূল লক্ষ্য তথা 'ইসলামি শরিয়ত রাষ্ট্রীয় বিধানের উৎস' হিসেবে সমুন্নত থাকলে পৈত্রিকসূত্রে শাসনক্ষমতা লাভ করারও সুযোগ আছে। কেননা কুরআন ও হাদিসের কোথাও স্পষ্টভাবে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। বরং কিছু কিছু

চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে দীর্ঘ নয় বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর হরজত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. কে শহিদ করে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেই তারা ক্ষান্ত হয়।

আয়াত থেকে রাজতন্ত্র ও পৈত্রিকসূত্রে শাসনক্ষমতা লাভের বৈধতাও প্রমাণিত হয়। যেমন :

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ

আর সুলাইমান হলো দাউদের উত্তরসূরি।[৪৭৯]

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا۔

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ নির্বাচন করেছেন।[৪৮০]

আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. হজরত মুয়াবিয়া রা. এর উক্ত সিদ্ধান্তের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন, 'হজরত মুয়াবিয়া রা. কে যে বিষয়টি অন্যদের পরিবর্তে নিজ পুত্রকে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা হলো উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি ধরে রাখা। তা ছাড়া বনু উমাইয়াবংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকলেই এ সিদ্ধান্তের ব্যাপার একমত ছিলেন। কেননা তখন তারা নিজেদের ব্যক্তি ছাড়া কারো ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিল না। আর বনু উমাইয়া ছিল কুরাইশের সবচেয়ে শক্তিশালী জনগোষ্ঠী। অধিকাংশ মুসলমানের সম্পর্ক তখন তাদের সঙ্গেই ছিল। আর এসব দিক সামনে রেখেই হজরত মুয়াবিয়া রা. ইয়াজিদকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং উত্তমের স্থলে অনুত্তমকে নির্বাচন করেছিলেন। সুতরাং হজরত মুয়াবিয়া রা. উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কেননা শরিয়তে ঐক্য ও সংহতির গুরুত্ব অপরিসীম'।[৪৮১]

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. লিখেছেন, 'হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মতে ইয়াজিদ খেলাফত পরিচালনার জন্য উপযুক্তই ছিল। মূলত পুত্রের প্রতি পিতার অসীম স্নেহ-মায়া এবং ইয়াজিদের জাগতিক সম্মান ও মর্যাদা, তার রাজপুত্রসুলভ বৈশিষ্ট্য, সমরবিদ্যায় পারদর্শিতা, শাসনপরিচালনার

---

[৪৭৯] সুরাতুন নামল, আয়াত ১৬

[৪৮০] সুরা বাকারা, আয়াত ২৪৭

[৪৮১] তারিখে ইবনে খালদুন : ১/২৬৩, মুকাদ্দামা।

যোগ্যতা ও প্রতিভা এবং দায়িত্ব পালনের নিপুণতার কারণেই হজরত মুয়াবিয়া তাকে মনোনীত করেছিলেন। তার ধারণা ছিল সাহাবায়ে কেরামের সন্তানদের মধ্যে আর কেউ এভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা করতে সক্ষম হবে না'।[৪৮২]

ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে মনোনয়নের কারণ

সম্ভবত প্রথম দিকে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর চিন্তায় ইয়াজিদকে তার স্থলাভিষিক্ত করার কোনো ইচ্ছা ছিল না। নিম্নের ঘটনা থেকে বিষয়টির ধারণা পাওয়া যায়।

একবার ইরাকের প্রশাসক জিয়াদ হজরত কাবিসা বিন জাবেরকে কোনো এক কাজে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে দামেশকে পাঠালেন। হজরত কাবিসা কথাবার্তার ফাঁকে হজরত মুয়াবিয়াকে প্রশ্ন করলেন, আপনার পরে খেলাফতের এ মহান দায়িত্ব কে পালন করবেন?

হজরত মুয়াবিয়া বললেন, পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি মুসলমানদের জামাতের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। তখন হয়তো তারা বেছে নেবে কুরাইশের যুবক আবদুল্লাহ বিন আমেরকে, অথবা সম্ভ্রান্ত নেতা হাসান বিন আলিকে, অথবা কুরআনপাঠক, দীনের আলেম এবং শরিয়তের দণ্ডবিধির ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর মারওয়ান বিন হাকামকে, অথবা বিজ্ঞ ফিকাহবিদ আবদুল্লাহ বিন উমরকে, অথবা বেছে নেবে তীক্ষ্ণ মেধাবী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ বিন যুবাইরকে'।[৪৮৩]

---

[৪৮২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৩০৮, دار هجر

[৪৮৩] তারিখে আবি যুরআ আদদিমাশকি (মৃত্যু ২৮১ হিজরি): ১/৫৯২,

عن عبد الله بن مبارك بسند صحيح، رجاله رجال البخارى ومسلم. الا احمد بن شبوبه وهو ثقة ايضا، ونقله الحافظ ابن كثير ف البداية والنهاية: ١١/ ٣٢٠

নোট : প্রসিদ্ধ আছে যে, ইয়াজিদকে স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মনোনয়নের মূল কারণ ছিল ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করা। হজরত মুয়াবিয়া হরজত মুগিরা বিন শু'বা রা. র প্ররোচনায় পড়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা হজরত মুগিরা বিন শু'বা রা. র মৃত্যু হয়েছিল ৫০ হিজরিতে। আর ইয়াজিদের মনোয়নের বিষয়টি শুরু হয়েছিল ৫৬ হিজরিতে।

এ ছাড়া আরো বলা হয় যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. নানা রকম কলাকৌশল ও ভয়-ভীতি দেখিয়ে পুত্রের পক্ষে জনমত আদায় করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর,

ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায়, এটি হজরত হাসান রা. এর জীবদ্দশার ঘটনা (অর্থাৎ ৪৯ হিজরি বা তারও আগের)। সুতরাং বোঝা গেল, ওই সময় পর্যন্ত হজরত মুয়াবিয়া রা. এর চিন্তায় খেলাফতের বিষয়টি শুরাব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদন করা ছাড়া অন্যকোনো বিষয় ছিল না এবং তার মতে খেলাফত পাওয়ার অধিকার অন্যদেই ছিল।

অতএব, বলা যায়, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর চিন্তায় ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফারূপে নির্বাচনের ইচ্ছা এসেছে এর পরবর্তী বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনা অবলোকনের ফলে। তারপর বহু চিন্তাভাবনার পর তিনি তা বাস্তবায়ন করেছেন। সম্ভবত চিন্তাভাবনার এ সময়টা ছিল ৪৯-৫২ হিজরি পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে হজরত হাসান রা. দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আর যারা তার সঙ্গে মহব্বতের দাবিদার ছিল, তারা তার কর্মপন্থার বিপরীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে। তখন কুফায় বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দেয়। তারপর ৫১ হিজরিতে হজরত হুজর বিন আদির মতো বিশিষ্ট বুজুর্গের মূল্যবান জীবন সেই হাঙ্গামার বলি হয়। সম্ভবত এসব অবস্থার কারণেই হজরত মুয়াবিয়া রা. খেলাফতের নাজুক বিষয়টি শুরাকমিটির হাতে ন্যস্ত করতে আগ্রহী হতে পারছিলেন না।

এ সময়ের মধ্যেই ইয়াজিদ কনস্টান্টিনোপলের গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করে। ৫১ হিজরিতে হজের নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্বও পালন করে। আর এ দ্বারা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বিশ্বাস হয়ে যায় যে, ছেলের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা আছে। অবশেষে এ সব বিষয়

হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ও হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. এবং হজরত হুসাইন রা. র মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিভিন্নভাবে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন এবং প্রলোভন দেখিয়েছেন। এমনকি তাদের মাথার উপর অস্ত্র হাতে জল্লাদ নিযুক্ত করে দিয়েছেন, যেন এরা অস্বীকার করলেই শিরশ্ছেদ করে ফেলা হয়। তারপর উন্মুক্ত মজলিসে গিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, উক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বাইয়াত হয়েছেন। কিন্তু এসব বর্ণনা অত্যন্ত দুর্বল, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ অংশের শেষে 'সাহাবা-যুগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের সমাধান' শিরোনামে আমরা এজাতীয় বর্ণনার রহস্য উন্মোচন করব ইনশাআল্লাহ।

এ বিষয়ে হজরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানির অমূল্য রচনা 'হজরত মুয়াবিয়া রা. আওর তারিখি হাকায়েক' [ইতিহাসের কাঠগড়ায় হজরত মুয়াবিয়া- মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ অনূদিত] নামক গ্রন্থটি অবশ্যই অধ্যয়ন করা উচিত। কেননা তাতে উপরোক্ত আপত্তিসমূহের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সামনে রেখেই তিনি ইয়াজিদকে তার পরবর্তী খলিফারূপে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে এ বিষয়ে তিনি কয়েকজন আমিরের সাথে পরামর্শও করেছেন।

ইমাম তাবারি বর্ণনা করেছেন, 'হজরত মুয়াবিয়া রা. যখন ইয়াজিদের পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন, তখন জিয়াদকে চিঠি লিখে পরামর্শ চাইলেন। জিয়াদ তখন উবাইদ বিন কা'বকে ডেকে বিষয়টি জানালেন এবং বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন আশঙ্কা করছেন, মানুষ এ বিষয়ে তার বিরোধিতা করতে পারে। অথচ তিনি সকলের সমর্থন চান। আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। জানতে চাচ্ছেন আমার অভিমত কী। এখন ব্যাপার হলো, এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর দায়-দায়িত্ব অতি মহান। অথচ ইয়াজিদের মধ্যে কিছুটা বেপরোয়া ভাব আছে। তা ছাড়া শিকার ধরার প্রতিও তার বেশ আগ্রহ। সুতরাং তুমি আমিরুল মুমিনিনের কাছে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে ইয়াজিদ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করো। বলে দাও, ব্যাপারটি নিয়ে তিনি যেন তাড়াহুড়া না করেন।

সব শুনে উবাইদ বললেন, দেখুন, আমিরুল মুমিনিনকে তার পুত্র সম্পর্কে ক্ষুব্ধ করা সমীচীন মনে হচ্ছে না। তার চেয়ে বরং আমি ইয়াজিদের সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করে বলি, আমিরুল মুমিনিন তাকে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনীত করার জন্য শলাপরামর্শ করছেন। সুতরাং তিনি যেন তার বাজে অভ্যাসগুলো পরিহার করেন, যাতে মানুষ তার দোষ ধরার এবং বিরোধিতা করার সুযোগ না পায়।

জিয়াদ তার মতটি পছন্দ করেন এবং উবাইদকে ইয়াজিদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তারপর এই উবাইদের বুঝানোর কারণে জিয়াদ তার অনেক কার্যক্রম ছেড়ে দেন'।[৪৮৪]

ইয়াজিদের মনোনয়নের ব্যাপারে মদিনার বিশিষ্ট সাহাবিদের সংযম ও সাবধানতা

মুসলিমবিশ্বের রাজনৈতিক অঙ্গনে মদিনার বিশিষ্ট সাহাবিদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাই হজরত মুয়াবিয়া রা. তাদেরকে ইয়াজিদের

---

[৪৮৪] তারিখুত তাবারি : ৫/৩০৩

মনোনয়নের পক্ষে আনার জন্য চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইরাকের গভর্নর জিয়াদকে মদিনায় পাঠান, যাতে তিনি মদিনাবাসীকে এই প্রস্তাবের পক্ষে নিয়ে আসেন। জিয়াদ মদিনায় গিয়ে এক মজলিসে ভাষণের মাধ্যমে লোকদেরকে সম্মত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রা. দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ করে বলেন, 'হে বনু উমাইয়া, তোমরা আমাদের তিন দাবির যেকোনো একটি গ্রহণ করে নাও। হয়তো আল্লাহর নবীর আদর্শ গ্রহণ করো, অথবা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর অনুসরণ করো, অথবা হজরত উমর ফারুক রা. এর সুন্নাত অনুসরণ করো। ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় এদের প্রত্যেকের সম্মুখেই এসেছিল। এদের প্রত্যেকের ঘরে এই দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল। তা সত্ত্বেও তারা বিষয়টি মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। আর তোমরা রোম সম্রাটের রীতি চালু করতে চাচ্ছ। তাদের দেশে এক সম্রাট মরলে, আরেকজন চড়ে বসে'।[৪৮৫]

কিছুদিন পর হজরত মুয়াবিয়া একই দায়িত্ব মারওয়ানকে অর্পণ করেন। মারওয়ানকে ৫৪ হিজরিতে দ্বিতীয়বার মদিনার গভর্নর-পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তখন মারওয়ান ইয়াজিদের মনোনয়নের পক্ষে দলিল হিসাবে বলেন, 'এটা তো হজরত আবু বকরের সুন্নাত'।

হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রা. তখন আপত্তি করে[৪৮৬] বলেন, 'এটা তো রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের রীতি। হজরত আবু বকর তো তার পরিবার, এমনকি তার গোত্রও বাদ দিয়ে বনু আদির এক ব্যক্তিকে

---

[৪৮৫] আত তারিখুল কাবির লিবনি আবি খাইসামাহ, আস সাফারুস সালিস : ২/৭১, হাদিস : ১৭৮৭, মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ আল জুমাহি (মৃত্যু : ১২০ হিজরি) থেকে নির্ভরযোগ্য রাবীদের সনদে বর্ণিত।
যিয়াদের মদিনায় আগমনের উক্ত ঘটনা ৫৩ হিজরি বা তার আগের ছিল। কেননা যিয়াদের মৃত্যু ৫৩ হিজরিতেই হয়েছিল। (তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২১৯)

[৪৮৬] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৮২৭, কিতাবুত তাফসির, অধ্যায়: 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে উফ বলল'। বিভিন্ন ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায়, এ ঘটনা ৫৪ হিজরিতে ঘটেছিল।

(হজরত উমর রা. কে) শুধু এই দেখে নির্বাচন করেছিলেন যে, তিনি এ পদের উপযুক্ত ছিলেন'।[৪৮৭]

ইয়াজিদের বাইয়াতে মদিনার বিশিষ্ট সাহাবিদের অনীহা

হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রা. ছাড়াও হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর এবং হুসাইন বিন আলি প্রমুখ ইয়াজিদের পক্ষে বাইয়াত হতে অনীহা প্রকাশ করেন।[৪৮৮]

এ ছাড়া উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গ তথা আশারায়ে মুবাশ্‌শারার শেষ দুই ব্যক্তি, অর্থাৎ হজরত সাঈদ বিন যায়েদ এবং হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এর অভিমতও এ বিষয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। খেলাফতে রাশেদার আমলে কার্যকরকৃত একটি মূলনীতি অনুযায়ী এ মহান ব্যক্তিবর্গের সম্মতি ছাড়া খেলাফত সংঘটিত হতে পারত না।[৪৮৯]

কিন্তু এ দুই মহান ব্যক্তি ইয়াজিদের পক্ষে বাইয়াত হতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। মারওয়ান দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা. এর জন্য অপেক্ষা করেন।[৪৯০] অবশেষে তাকে ডাকার জন্য এক শামি সৈন্য যায়। হজরত সাঈদ এই বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন যে, 'অচিরেই

---

[৪৮৭] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩০৫৬৭, আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি : ৬/৪৫৮, ১১৪২৭, মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ আল জুমাহি (মৃত্যু : ১২০ হিজরি) থেকে মুরসাল সনদে বর্ণিত। তাফসিরে ইবনে আবি হাতিম : ১২/২২৪, ইসমাইল ইবনে আবি খালিদ থেকে বর্ণিত।

[৪৮৮] আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল লি আহমাদ, রিওয়াতু ইবনিহি আবদুল্লাহ, তরজমা : ৪৭৪৮

[৪৮৯]

عن عبد الرحمن بن ابزی۔عن عمر۔: قال: هذا الامر فی اهل بدر ما بقی منهم احد، ثم فی اهل احد ما بقی منهم احد (طبقات ابن سعد: ۳۴۲/۳)

নোট : হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এবং হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা. মদিনা থেকে তিন মাইল (পৌনে ৫ কিলোমিটার) দূরে আকিক নামক জনপদে বসবাস করতেন। সেখানেই তাদের মৃত্যু হয়েছিল। (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল জানাইয, বাবু মা জা আ ফী দাফনিল মাইয়িত) আকিক নামক এলাকাটির ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য দ্রষ্টব্য : মু'জামুল বুলদান : ৪/১৩৯

[৪৯০] আল আহাদ ওয়াল মাসানি, হাদিস : ২২৬, আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ১/১৫০

আসব'।[৪৯১] শামি সৈনিকটি ধমক দিয়ে বলে, আপনি চলুন, নয়তো আপনার গর্দান উড়িয়ে দেব'। কিন্তু হজরত সাঈদ মোটেই বিচলিত হন না[৪৯২] এবং মারওয়ানের কাছেও যান না।[৪৯৩]

একইভাবে হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. ও নির্জনতা অবলম্বন করেন।[৪৯৪]

ইয়াজিদের বাইয়াত থেকে বিমুখতা প্রদর্শনকারী সাহাবিদের যুক্তি-প্রমাণ

বস্তুত উপরোক্ত ব্যক্তিগণের ইয়াজিদের মনোনয়ন গ্রহণ না করার পেছনে কারণ ছিল। তা এই যে, তাদের মতে ক্ষমতা পরিবর্তনের এ পন্থাটি সঠিক ছিল না। সন্তানকে ক্ষমতার উত্তরাধিকারী বানানোর উপর যদিও কোনো স্পষ্ট ও অকাট্য নিষেধাজ্ঞা ছিল না, তবু শরিয়তের কিছু বিধান দ্বারা এ পন্থাটি অসমীচীন হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন :

- আদালতের কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুত্রের পক্ষে পিতার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। সুতরাং উম্মাহর বিষয়েও পিতার পক্ষ থেকে পুত্রের উপযুক্ততার সাক্ষ্যও সন্দেহজনক হবে।
- এমনিভাবে পিতা তার পুত্রকে জাকাত দিলে জাকাত আদায় হয় না। কেননা ধনি পিতার উপর উম্মাহর অভাবীদের হক আছে। আর

---

[৪৯১] আত তারিখুল আওসাত লিল বুখারি : ১/১১২

[৪৯২] তারিখে দিমাশক : ২১/৮৮, সনদ সহিহ।

[৪৯৩] আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, হাদিস : ৫৮৫৩, সনদ হাসান।

[৪৯৪] ব্যাপকভাবে এ ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. ইয়াজিদের মনোনয়নের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু সহিহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, হজরত সা'দ রা. হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা. র কাফন-দাফন ও গোসলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর এটাও প্রমাণিত যে, হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা. ইয়াজিদের মনোনয়নের সময় জীবিত ছিলেন। সুতরাং এর দ্বারা হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এরও তখন জীবিত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায়। দ্রষ্টব্য : মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ১১১৩৯, সনদ সহিহ, আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, হাদিস : ১৪৬৯,

وذكره البخارى فى الصحيح تعليقا. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.

উম্মাহর নেতৃত্বদানও একটি আমানত। সুতরাং এটিকে পুত্রের হাতে সঁপে দেওয়া অন্তত সন্দেহজনক তো হবেই।

- সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এজাতীয় কোনো বিষয় আল্লাহর নবী কিংবা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত ছিল না। বরং তারা তাদের সন্তান ও আত্মীয়স্বজনকে পদ দেওয়ার ক্ষেত্রে পেছনে রাখতেন এবং ত্যাগ ও কোরবানীর ক্ষেত্রে সামনে রাখতেন। আর হজরত মুয়াবিয়ার প্রস্তাবিত এ নতুন রীতি ছিল বাদশাহি নিয়মের মতো। যেখানে শাসনক্ষমতা একটি পৈত্রিক সম্পত্তির রূপে থাকে এবং যোগ্যতার বিচার না করেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের হাতে ক্ষমতার পালাবদল হতে থাকে। এ কারণে আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে এই নতুন রীতি হয়তো ইসলামি রাজনীতিতেও ফুটিয়ে তুলবে বাদশাহি নিয়মের ছাপ। ফলে উম্মাহর নেতৃত্ব ও পরিচালনায় চেপে বসবে অযোগ্য ও অনুপযুক্ত লোকেরা।
- তা ছাড়া ইয়াজিদের ব্যক্তিগত চলাফেরাও এমন ছিল না যে, উম্মাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোচ্চ দায়িত্বটি কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়া তার হাতে তুলে দেওয়া যায়। যেমনিভাবে খোদ হজরত মুয়াবিয়ার ডান হিসেবে খ্যাত জিয়াদও মনে করতেন, ইয়াজিদ খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত নয়।[৪৯৫]

মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমান ইয়াজিদের মনোনয়ন সম্পর্কে লিখেছেন, 'যে পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটে ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনীত করা হয়েছিল, সেদিকে লক্ষ করলে অবশ্যই এ মত পোষণ করার সুযোগ ছিল যে, সে পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটে ইয়াজিদ খেলাফতের উপযুক্ত নয়। কেননা এটা তো স্পষ্ট যে, যেখানে হজরত হুসাইন, হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর, হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রা. এর মতো বিশিষ্ট সাহাবি, উম্মাহর সবচেয়ে সৎ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন, সে পরিবেশে ইয়াজিদের মতো ব্যক্তিকে খেলাফতের জন্য অনুপযুক্ত মনে করা মোটেই দুষ্কর ছিল না।[৪৯৬]

---

[৪৯৫] তারিখুত তাবারি : ৫/৩০৩

[৪৯৬] হজরত মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক, পৃষ্ঠা : ১১৩

মোটকথা, উল্লিখিত বিশিষ্ট সাহাবিদের মতবিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত নিজে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিভিন্নভাবে তাদেরকে এ প্রস্তাবের পক্ষে আনার চেষ্টা করলেন। সেমতে ৫৬ হিজরিতে তিনি হজ পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র হিজাজ ভূমিতে গেলেন। তখন আশারায়ে মুবাশশারার শেষ দুই ব্যক্তি তথা হজরত সাঈদ বিন যায়েদ এবং হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই হজরত মুয়াবিয়ার মনোযোগ ছিল অন্যদের দিকে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর, হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রা. প্রমুখ। কিন্তু এরা তিনজনই ইয়াজিদের বাইয়াত থেকে বাঁচতে মসজিদে হারামে আশ্রয় নেওয়ার জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।[৪৯৭] হজরত মুয়াবিয়াও তাদের পেছনে পেছনে মক্কায় পৌঁছেন। তারপর হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে বললেন, হে ইবনে উমর, আপনি বলতেন, আপনি একটি রাতও কোনো শাসকের অধীনে থাকা ছাড়া কাটাতে পছন্দ করেন না। সুতরাং লক্ষ রাখবেন, এখন যেন আপনি এমন কিছু না করে বসেন, যার দ্বারা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়।

হজরত ইবনে উমর রা. বললেন, দেখুন, পূর্ববর্তী খলিফাদেরও তো পুত্র ছিল। আপনার পুত্র তাদের পুত্রদের চেয়ে তো উত্তম কেউ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের পুত্রদের জন্য সেরকম চিন্তা করেননি, যেমনটি আপনি আপনার পুত্রের জন্য করছেন। আর মুসলমানদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টির কথা যা বললেন, আমি সে রকম কিছু করার মানুষ নই। সবাই যদি কোনো সিদ্ধান্তে একমত হয়ে যায়, তা হলে আমিও তাদের সাথে শামিল হয়ে যাবো'।[৪৯৮]

এরপর হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. এর সাথে কথা হয়। তিনি হজরত মুয়াবিয়াকে বলেন, একই সময়ে দুই ব্যক্তির হাতে কী করে বাইয়াত হওয়া যায়? আপনি নিজেই তো হাদিস বর্ণনা করেন, 'যখন

---

[৪৯৭] আত তারিখুল আওসাত লিল বুখারি : ১/১০৩, সনদ সহিহ,

[৪৯৮] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২১৩, ২১৪

দুই খলিফার হাতে বাইয়াত নেওয়া হবে, তখন দ্বিতীয়জনকে হত্যা করা হবে'।[৪৯৯]

একইভাবে হজরত হুসাইন রা.-ও এ প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন না। হজরত মুয়াবিয়া রা. তার সঙ্গেও কথা বলেন। কিন্তু কেউ কাউকে পক্ষে আনতে সক্ষম হননি।

অবশেষে হজরত মুয়াবিয়া রা. এ মহান ব্যক্তিদেরকে আপন অবস্থায় রেখে শামে চলে যান।[৫০০]

ইমাম আহমাদ বিন হামবল রহ. এর উক্তি আছে যে, হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর, হজরত হুসাইন বিন আলি, হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. হজরত মুয়াবিয়ার জীবদ্দশায় ইয়াজিদের পক্ষে বাইয়াত হননি। আর হজরত মুয়াবিয়াও তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৫০১]

হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রা. এর মৃত্যু

হজরত মুয়াবিয়া রা. শামে ফিরে যাওয়ার পর হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রা. মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু মক্কা থেকে দশ মাইল (১৬ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত حُبْشِی নামক পর্বতের কাছে গিয়ে ইনতেকাল করেন। সেখান থেকে তাকে মক্কায় নিয়ে দাফন করা হয়।[৫০২] পরের বছর হজরত আয়েশা রা. হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন। হজরত আবদুর রহমানের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি যদি উপস্থিত থাকতাম, তা হলে যেখানে সে মৃত্যুবরণ করেছে, সেখানেই দাফনের ব্যবস্থা করতাম'। তারপর তিনি নিম্নোক্ত বিরহের কবিতা দুটি আবৃত্তি করেন :

---

[৪৯৯] তারিখে খলিফা, পৃষ্ঠা : ২১৩, আল মু'জামুল আওসাত, হাদিস : ৩৮৮৫, সনদ হাসান, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদিস : ৯০১১, আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ১৯/ ৩১৪

[৫০০] মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদিস : ৯০০৯

[৫০১] মউসুআতু আকওয়ালি ইমাম আহমাদ : ৪/১৫৭, ১৫৮

[৫০২] আত তারিখুল আওসাত লিল বুখারি : ১/১০৩, সনদ সহিহ, তারিখে আবি যুরআ আদ দিমাশকি : ১/২২৯

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً ... مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا.

আমরা একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জাযিমার দুই বন্ধুর মতো ছিলাম। এমনকি বলা হতে লাগল, এরা দুজন কভু পৃথক হবে না।

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا ... لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا.

কিন্তু যখন আমরা পৃথক হলাম, আমি ও (আমার বন্ধু) মালিক বহুদিন একসাথে থেকেও যেন একটি রাতও থাকিনি একত্রে।[৫০৩]

আমর বিন হাযাম রা. এর ভিন্নমত, উপদেশ প্রদান ও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর উত্তর

আরো অনেকেই ইয়াজিদের মনোনয়নের ব্যাপারে একমত ছিলেন না। যেমন : হজরত আমর বিন হাযাম রা.। তিনি মদিনা থেকে সুদূর দামেশক গিয়ে সরাসরি হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সঙ্গে ইয়াজিদের মনোনয়নের ব্যাপারে স্পষ্ট কথা বলেন। তিনি জোরালোভাবে দাবি জানান, ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনয়ন না দেওয়া হোক। এ মর্মে তিনি হজরত মুয়াবিয়াকে এ হাদিস শুনিয়ে দেন, 'আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে যাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল বানিয়েছেন, তাদের সম্পর্কে কেয়ামতের দিন অবশ্যই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে'।

এ হাদিস শুনিয়ে হজরত আমর বিন হাযাম রা. বলেন, 'হে মুয়াবিয়া, আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, ভালো করে চিন্তা করে দেখুন, কাকে আপনি আপনার পরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের দায়িত্বশীল বানিয়ে যাচ্ছেন'।

কেয়ামতের দিনের হিসাবের কথা স্মরণ করে হজরত মুয়াবিয়া রা. শীতের মৌসুমেও ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠেন। তারপর আল্লাহর হামদ ও সানা করে বলেন, আপনি একজন কল্যাণকামী মানুষ। আপনি আপনার

---

[৫০৩] সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ১০৫৫, আবওয়াবুল জানাইয, বাবু মা জা আ ফির রুখসাতি ফি যিয়ারাতিল কুবুর... হজরত আয়েশা এ কথা এজন্য বলেছিলেন যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে মৃত ব্যক্তিকে সেখানে দাফন করাই উত্তম, যেখানে সে মৃত্যুবরণ করেছে। একান্ত ওজর ছাড়া অন্যত্র নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

القتيل او الميت يستحب لهما ان يدفنا فى المكان الذى قتل او مات فيه فى مقابر اولئك القوم لما روى عن عائشة رضى الله عنها انها زارت قبر اخيه ... الخ (البحرالرائق: ٢/٢١٠)

অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই করেছেন। আসলে ব্যাপার এই যে, এখন আমার পুত্র যেমন আছে, তেমনি অন্যান্য সাহাবির পুত্রও আছে। তবে আমার পুত্র তাদের পুত্রদের চেয়ে এ দায়িত্বের জন্য অধিক উপযুক্ত।

তারপর হজরত মুয়াবিয়া তাকে বিভিন্ন পুরস্কার দিয়ে বিদায় করে দেন।[৫০৪]

ইরাকের প্রধান ব্যবস্থাপক হজরত আহনাফ বিন কায়েসের অভিমত

হজরত মুয়াবিয়া রা. ভিন্নমতকে শ্রদ্ধা করতেন। তবু তিনি মনে করতেন, ইয়াজিদকে মনোনয়ন দান করাই উত্তম সিদ্ধান্ত। পরিশেষে তিনি সরকারি কর্মকর্তাদেরকে দামেশকে ডেকে এনে তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তখন খোরাসানের বিজেতা এবং ইরাকের প্রধান ব্যবস্থাপন হজরত আহনাফ বিন কায়েস রহ. এ প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তাকে যখন তার মত ব্যক্ত করতে বলা হলো, তখন তিনি বললেন, ইয়াজিদের দিনরাত ও ভেতর-বাহির সম্পর্কে আপনি বেশ ভালো জানেন। আমাদের কাজ তো কেবল শোনা ও মানা। আর আপনার কাজ উম্মাহর কল্যাণ কামনা করা।[৫০৫]

যাই হোক, দামেশকে আহূত সভাসদগণ হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সিদ্ধান্তের সম্মুখে মাথা নত করে দেন। তারপর গোটা মুসলিম জাহানে গভর্নরদের মাধ্যমে ইয়াজিদের মনোনয়নের উপর বাইয়াত গ্রহণ করা হয়।[৫০৬]

---

[৫০৪] মুসনাদে আবি ইয়া'লা, হাদিস : ৭১৭৪, সনদ সহিহ,

[৫০৫] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৩০৭

[৫০৬] আল আকদুল ফরিদ : ৫/১১৭, ১১৮, মাদায়েনি থেকে বর্ণিত, মুরুয যাহাব : ৩/২১৮, ২১৯,

নোট : প্রসিদ্ধ আছে, ইয়াজিদের পক্ষে বাইয়ায়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে হজরত মুয়াবিয়া রা. ঘুষ দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের সততাকে কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এমন কথাসংবলিত অধিকাংশ বর্ণনাই দুর্বল, বরং বানোয়াট। অবশ্য সহিহ সনদের এক-দু'টি বর্ণনাও আছে। তবে সেগুলোর অর্থ এই যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. আগে থেকেই অনেক সাহাবিকে উপহার-উপঢৌকন দিতেন। সে ধারাবাহিকতায় ইয়াজিদের মনোনয়নের বছরও উপহার পাঠিয়েছেন। কিন্তু এর কিছুদিন পরে যখন ইয়াজিদের বাইয়াতের দাবি পেশ করেন, তখন লোকমুখে এ ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়ে যে, ঐ অর্থ

ইয়াজিদের মনোনয়নের বিষয়ে অধিকাংশ আলেমের অভিমত

ইয়াজিদের মনোনয়নের বিষয়ে অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, এক্ষেত্রে তাদের মতটাই অধিক বিশুদ্ধ ও সময়োপযোগী ছিল, যারা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। তবে সমসাময়িক পরিস্থিতির কারণে এভাবেও খেলাফত সংঘটিত হয়ে যায়, যেমনটি হয়েছিল ইয়াজিদের ক্ষেত্রে। কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি রহ. বলেন,

'নিঃসন্দেহে হজরত মুয়াবিয়ার জন্য এ বিষয়টি শুরার হাতে ন্যস্ত করাটাই অধিক উত্তম ছিল। নিজের পুত্র তো পরের কথা, কোনো আত্মীয়কেও এ পদে না বসানোটাই ছিল তার জন্য উত্তম।... কিন্তু তিনি উত্তম উপায়টি পরিহার করেছেন।'[৫০৭]

মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি এ বিষয়ে লিখেছেন :

- এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. কোনো সৎ উদ্দেশ্যেই নিজের পুত্রকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে উপযুক্ত মনে করে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। কিন্তু তার এ কাজটি এমন একটি দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে, যার দ্বারা পরবর্তী লোকেরা অত্যন্ত মন্দ সুযোগ গ্রহণ করেছে। তারা এ সিদ্ধান্তকে ঢাল বানিয়ে খেলাফতের শুরাভিত্তিক কাঙ্ক্ষিত রীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে মুসলমানদের খেলাফতও একটি বংশীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে।

- আরেকটি সত্য এই যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর যুগে ইয়াজিদের পাপাচারের বিষয়টি নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং তাকে খেলাফতের উপযুক্ত অবশ্যই মনে করা যেত। কিন্তু উম্মাহর মধ্যে তখন এমন মানুষের অভাব ছিল না, যারা শুধু বিশ্বস্ততা ও খোদাভীরুতার দিক দিয়েই নয়, বরং রাষ্ট্রপরিচালনা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ক্ষেত্রেও ইয়াজিদের তুলনায় অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং খেলাফতের মহান দায়িত্ব তাদের হাতে অর্পণ করলে অবশ্যই তারা ইয়াজিদের তুলনায় অনেক বেশি যোগ্য

মূলত ছিল রাজনৈতিক ঘুষ। আলোচ্য প্রস্তাবে সম্মত করার জন্যই মূলত এটা দেওয়া হয়েছিল। অথচ হজরত মুয়াবিয়ার উদ্দেশ্য এটা ছিল না।

[৫০৭] আল আওয়াসিমু মিনাল কাওয়াসিম, পৃষ্ঠা : ২২৮,

প্রমাণিত হতেন। একথা সত্য যে, উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতে অনুত্তম ব্যক্তিকে খলিফা নিযুক্ত করা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ (তবে শর্ত হলো, সেই অনুত্তমের মধ্যে খেলাফতের শর্তাবলি থাকতে হবে)। কিন্তু সবচেয়ে উত্তম এই যে, এমন কাউকে খলিফা নিযুক্ত করা, যিনি গোটা উম্মাহর মধ্যে এ পদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত।

- উদ্দেশ্য যদি ভালো থাকে, তা হলে আপন পুত্রকে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ আছে। কিন্তু এতে মানুষের পক্ষ থেকে অপবাদ আসতে পারে। তাই এর থেকে বেঁচে থাকাই শ্রেয়। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এমনটি করার অর্থই হলো নিজেকে পরীক্ষায় ফেলা। এ কারণেই পূর্ববর্তী সকল খলিফা এর থেকে বিরত ছিলেন।[৫০৮]

ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের দিক থেকে ইয়াজিদের উপযুক্ততা

হজরত মুয়াবিয়ার সাথে একমত হয়ে যারা ইয়াজিদের মনোনয়ন মেনে নিয়েছিলেন, তাদের অবস্থানটিও শরিয়তের সীমারেখার বাইরে ছিল না। মনোনীত হওয়ার শর্তাবলির দিকে লক্ষ করলে ইয়াজিদের মধ্যে সেগুলোর উপস্থিতি দেখা যায়। যেমন : সুস্থ বিবেকের অধিকারী হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়া এবং কুরাইশ বংশের সন্তান হওয়া। এগুলোর জন্য আলাদা কোনো দলিলেরও প্রয়োজন নেই। কেননা ইয়াজিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ জিহাদি অভিযান ও হজের নেতৃত্ব দান করেছিল। যার দ্বারা তার মধ্যে সমরবিদ্যা ও পরিচালনার জ্ঞান ছিল বলে প্রমাণিত হয়। সুতরাং বাহ্যিকভাবে তার এসব গুণের প্রতি লক্ষ করে মেনে নেওয়ার সুযোগ ছিল যে, সে খেলাফতের উপযুক্ত।

আর মদ্যপান ও বিভিন্ন বাজে অভ্যাসে লিপ্ত হওয়ার যে কথা ইয়াজিদ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, তার উত্তর হলো, যে বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে, হজরত মুয়াবিয়ার জীবদ্দশায় ইয়াজিদ এসবে অভ্যস্ত ছিল, সেটি একটি দুর্বল ও সন্দেহপূর্ণ বর্ণনা।[৫০৯]

---

[৫০৮] হজরত মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক, পৃষ্ঠা : ১১৪, ১১৫

[৫০৯] যেমন, কোনো কোনো দুর্বল বর্ণনায় আছে, ইয়াজিদের মদ্যপানের অভ্যাস সম্পর্কে জানতে পেরে হজরত মুয়াবিয়া রা. তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, এসব কাজ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে করবে।

তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নেতৃত্বের যোগ্যতা ও দীনের উপর অবিচলতার ক্ষেত্রে ইয়াজিদ সে যুগের অন্যান্য পুণ্যবান ব্যক্তির চেয়ে অনেক পেছনে ছিল। তা ছাড়া তার মধ্যে দূরদর্শিতারও অভাব ছিল। স্বভাবে ছিল তাড়াহুড়া প্রবণতা, পরনির্ভরশীলতা ও বেপরোয়া ভাব। যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে খলিফা হওয়ার পর তার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত থেকে। আনন্দ-বিনোদনের ক্ষেত্রেও সে সতর্কতার চেয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকত।[৫১০]

কিন্তু এ বিষয়গুলোই যদি কোনো সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হতো, তা হলে হয়তো কারো কোনো আপত্তি হতো না। ইয়াজিদকে যেহেতু ভবিষ্যতের খলিফা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছিল, তাই এ দোষগুলো অনেক মারাত্মক মনে হচ্ছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. একান্ত ঘনিষ্ঠদের মধ্যে

এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এজাতীয় তথ্যসংবলিত বর্ণনাগুলো মেনে নিলে শুধু ইয়াজিদের উপরই আপত্তি আসে না; বরং এর দ্বারা একজন সাহাবির উপর কবিরা গুনাহের অনুমতি প্রদানের অপবাদ আরোপিত হয়। অথচ শুরুতে আমরা এ মূলনীতি পেশ করেছি যে, কোনো সাহাবির উপর আপত্তি করার জন্য কখনোই দুর্বল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না।

অন্যদিকে কিছু কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইয়াজিদ যদিও আবেদ, যাহেদ ছিল না; তবে জরুরি পর্যায়ের দীনদারি তার মধ্যে অবশ্যই ছিল। যেমনটি বলেছেন হজরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া রহ.। ইয়াজিদ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আমি দেখেছি ইয়াজিদ নামাজের প্রতি যত্নবান, কল্যাণ অন্বেষণকারী, ফিকহি মাসআলা জানতে আগ্রহী এবং সুন্নতের প্রতি গুরুত্ব প্রদানকারী।

(ذكره الذهبی فی تاریخ الاسلام: ٢٧٤/٥، ت تدمری، باسناد ضعیف منقطع، ونقله ابن المنظور فی مختصر تاریخ دمشق: ٢٨/٢٨، والحافظ فی البداية والنهاية: ٦٥٣/١١ بلا اسناد)

ونرى البلاذوری هو يذكر هذه القضية بسياق آخر مفصل يتضح به شخصية يزيد وضوحا تاما، فيه: "وكان يزيد يتصنع لابن الحنفية ويسأله عن القرآن والفقه". (الانساب الأشراف: ٢٧٨/٣، ط دار الفكر)

প্রকাশ থাকে যে, মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার এ বর্ণনাটি চরম পর্যায়ের দুর্বল। ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বের কোনো কিতাবে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এর সনদেও দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা আছে। কিন্তু আমরা এর দ্বারা ইয়াজিদের যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছি না, বা এর দ্বারা তার শাসনামলে তার থেকে কোনো পাপাচার সংঘটিত না হওয়াও প্রমাণ করছি না। বরং শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, খলিফারূপে মনোনীত হওয়ার সময় ইয়াজিদ এমন কোনো প্রকাশ্য পাপিষ্ঠ ছিল না যে, কোনোভাবেই তাকে মনোনয়ন প্রদানের সুযোগ ছিল না।

[৫১০] তারিখুত তাবারি : ৫/৩০৩

আমর বিন হাযাম, আহনাফ বিন কায়েস এবং জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানের দিক থেকে ইয়াজিদের মনোনয়নের বিষয়ে ব্যক্তিগত যে আপত্তি ছিল, তা সম্ভবত ইয়াজিদের এজাতীয় কর্মকাণ্ডের কারণেই ছিল। তদুপরি মদিনার বিশিষ্ট সাহাবিদের পক্ষ থেকে এ আপত্তিও করা হয়েছিল যে, ইসলামি শুরাভিত্তিক নিয়ম ও মুসলিমজাতির রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া ক্ষমতায় পরিণত হতে যাচ্ছে।

ইয়াজিদের দুর্বলতাগুলো হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দৃষ্টিতে লুক্কায়িত ছিল না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু হয়তো তিনি আশা করছিলেন যে, দায়িত্বের বোঝা চেপে এলে এসব দোষত্রুটি আপনা হতেই দূর হয়ে যাবে।[৫১১] হজরত মুয়াবিয়া এটা অবশ্যই জানতেন যে, বর্তমান শাসনব্যবস্থায় নিয়োগকৃত বহু যোগ্যতাসম্পন্ন আমির ও পরামর্শদাতা আছেন। ইয়াজিদ প্রতি কদমে তাদের দিকনির্দেশনা লাভ করবে। আর এভাবে সে বিভিন্ন ভুল পদক্ষেপ থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

এ ছাড়া হজরত মুয়াবিয়া রা. নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে ইয়াজিদকে বিভিন্ন সময় উপদেশ প্রদান করতেন। সেসব উপদেশ সামনে রাখলে ইয়াজিদ অবশ্যই একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হতে পারত।[৫১২]

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দোয়া ও ইসতিখারা

হজরত মুয়াবিয়া রা. ইয়াজিদের বিষয়ে ইসতিখারা ও দোয়াও করেছিলেন। এক জুমায় মিম্বারে দাঁড়িয়ে দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আপনার জানা অনুযায়ী আমি যদি ইয়াজিদকে তার যোগ্যতার কারণে খলিফা হিসেবে মনোনীত করে থাকি, তা হলে আমি তাকে যে পদ দিয়েছি, তাতে পূর্ণতা দান করুন। আর যদি আমি মহব্বতের কারণে তাকে মনোনয়ন দিয়ে থাকি, তা হলে আমি তাকে যে পদ দিয়েছি, তা পূর্ণ করবেন না।[৫১৩]

---

[৫১১] যেমন দেখা গেছে কোনো কোনো ব্যক্তির জীবনে, যারা শাসক হওয়ার পূর্বে প্রচুর বিলাশী জীবনযাপন করতেন। কিন্তু যখন নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে অর্পিত হয়েছে, তখন তাদের দিনরাতের চিত্র পালটে গেছে। হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি রহ. ছিলেন এমনই দুই মহান ব্যক্তি।

[৫১২] এ ধরনের অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশের একটি সংকলন আমরা সামনে পেশ করব।

[৫১৩] ইবনে কাসির রহ. বলেন,

এর দ্বারা অনুমান করা যায়, হজরত মুয়াবিয়া রা. পূর্ণ ইখলাস ও উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামিতা থেকেই ইয়াজিদের মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ইয়াজিদের দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, সে সঠিকভাবেই শাসন পরিচালনা করবে। তাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা তিনি নিজেই করে যাচ্ছিলেন এবং ইয়াজিদের জন্য পাথেয়স্বরূপ রেখে যাচ্ছিলেন দোয়া, মূল্যবান উপদেশ ও যোগ্য সহকর্মী। তদুপরি তিনি আলেমুল গায়েব ছিলেন না যে, ভবিষ্যতের ভয়াবহ ঘটনাবলি দেখে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন।

ইয়াজিদের মনোনয়ন, একটি সমীক্ষা

বস্তুত হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পক্ষ থেকে ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা বানানোটা ছিল একটি পরীক্ষা, যার সফলতা ও ব্যর্থতার সিদ্ধান্ত কেবল পরবর্তী ফল দেখেই করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এ অভিজ্ঞতা দেখার জন্য হজরত মুয়াবিয়া তো জীবিত ছিলেন না। সুতরাং পরীক্ষা ব্যর্থ বলা যায়; কিন্তু এর কারণে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর নিয়ত ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সন্দেহ করা ভদ্রতা ও ইনসাফের পরিপন্থি।

নিঃসন্দেহে অভিজ্ঞতা ব্যর্থ হয়েছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. যদি ওই সময় জীবিত থাকতেন, তা হলে অবশ্যই ব্যাপারটি সেখানেই সমাপ্ত করে দিতেন। যেমনটি করেছিলেন তারই পৌত্র মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ। পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া ক্ষমতার ধারা থামিয়ে দিয়ে ক্ষমতার পালাবদলের

ورويِنا عن معاوية انه قال يوما فى خطبته:
"اللهم ان كنت تعلم انى وليته لانه فيما اراه اهل لذلك فاتمم له ما وليته، وان كنت تعلم انى وليته لانى احبه فلا تتمم له ما وليته."
(البداية والنهاية: ۳۰۸/۱۱، حوادث سنة ٥٦ ه)
نقله الحافظ ابن كثير: بصيغة "رُوِينا" ولم يذكر اسناده، وعليك برواية اخرى اخرجها الذهبى:
"قال ابو بكر بن مريم عن عطية بن قيس قال: "خطب معاوية فقال: اللهم ان كنت عهدت ليزيد لما رأيت من فضله فبلغه ما امليت واعنه، وان كنت انما حملنى حب الوالد لولده وانه ليس لما صنعت به اهلا فاقبضه قبل ان يبلغ ذالك."
(تاريخ الاسلام للذهبى: ١٦٩/٤، وبلفظه نقل السيوطى فى تاريخ الخلفاء، ص: ١٥٦، ط مكتبة نزار)
وهذا الاسناد ايضا منقطع، ولم اجد الروايتين فى كتب المتقدمين، فضعفهما ظاهر لانقطاع الاسناد، لكن هذا من باب الفضائل والرقاق وفيهما مجال واسع.

সিদ্ধান্ত উম্মাহর হাতে ন্যস্ত করেছিলেন (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে আসবে)।

মাওলানা কাসেম নানুতুবি রহ. 'খেলাফত ব্যবস্থায় হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মতাদর্শ' শিরোনামের অধীনে লিখেছেন, 'খেলাফত ব্যবস্থায় হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রাষ্ট্রপরিচালনার যোগ্যতা যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকবে, তাকে খলিফা নিযুক্ত করাই সবচেয়ে উত্তম, যদিও অন্যরা তার চেয়ে উত্তম হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই হজরত মুয়াবিয়া রা. ইয়াজিদকে অন্যদের তুলনায় উত্তম মনে করেছেন।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে, অন্যদের তুলনায় ইয়াজিদকে উত্তম মনে করা হয়নি, তা হলেও এখানে সর্বোচ্চ এতটুকু হয়েছে যে, তিনি উত্তমকে বাদ দিয়েছেন। কেননা ইতিপূর্বে আমরা স্পষ্ট করে এসেছি যে, উত্তমকে খলিফা বানানো উত্তম, ওয়াজিব নয়। আর এতটুকু বিষয়ের কারণে উত্তমকে বর্জন করার গুনাহ তার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা যায় না। সুতরাং হজরত মুয়াবিয়াকে গালমন্দ করাও আমাদের জন্য জায়েজ নয়'।[৫১৪]

---

[৫১৪] দ্রষ্টব্য : আনওয়ারুন নুজুম (উর্দু অনুবাদ-'মাকতুবাতে কাসেমি') পৃষ্ঠা : ১৭৪, ১৭৫, অনুবাদ : মাওলানা প্রফেসর আনওয়ারুল হাসান শেরকোটি, ফাজেলে দারুল উলূম দেওবন্দ।

নোট : এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, এ আলোচনা হজরত মুয়াবিয়া রা. র জীবদ্দশায় ইয়াজিদের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে করা হচ্ছে। শাসক হওয়ার পর ইয়াজিদ পিতার উপদেশ ভুলে গিয়ে যে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল, সেটি ভিন্ন বিষয়। সিংহভাগ আলেমদের মত এটাই যে, সে প্রাকাশ্য পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল।

মাওলানা রশিদ আহমাদ গঙ্গুহি রহ. এর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, হজরত মুয়াবিয়া রা. কি ইয়াজিদকে মুখোমুখি বসিয়ে খলিফা বানিয়েছিলেন? উত্তরে তিনি লিখেছেন, হজরত মুয়াবিয়া রা. ইয়াজিদকে খলিফা বানিয়েছেন, আর ইয়াজিদ তখন ভালো ছিল।

পরবর্তীতে এজাতীয় আরেক চিঠির উত্তরে তিনি লিখেছেন, ইয়াজিদ প্রথমে ভালোই ছিল। খেলাফত লাভের পর সে নষ্ট হয়েছে। (তালিফাতে রশিদিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ৩৪২)

খলিফা হওয়ার পর ইয়াজিদের কিছু বাড়াবাড়ি সহিহ হাদিসে প্রমাণিত আছে। যেমন হজরত হুসাইন রা. র শাহাদাত, হাররার ঘটনা এবং মক্কা অবরোধ। আর খেলাফত লাভ করার পর নির্দিষ্ট কোনো গুনাহে (যেমন মদ্যপান, নামাজ না পড়া ইত্যাদি) লিপ্ত হওয়ার কথা দুর্বল বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত।

তবে সহিহ সনদে একথা প্রমাণিত আছে যে, মদিনার কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবি ও তাবেয়ির এক বিরাট দল ইয়াজিদের প্রকাশ্য পাপাচারের কথা বিশ্বাস করেছিলেন এবং সে বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিলেন। এমনকি এটি মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারাও প্রমাণিত। সুতরাং এসকল সাহাবি ও তাবেয়ির

তৎকালীন সময়ের দুটি হৃদয়বিদারক ঘটনা

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর যুগে এমন দুজন মহান ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটেছিল, যাদের দ্বারা হাদিসের বিশাল ভাণ্ডার উম্মাহর কাছে পৌঁছেছিল। তারা হলেন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এবং হজরত আবু হুরাইরা রা.।

এক. হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর মৃত্যু

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. ৫৮ হিজরিতে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।[৫১৫] জীবনের শেষদিনগুলোতে তিনি প্রায় সময়ই লাবিদ বিন রাবিয়ার এ কবিতা-দুটি আবৃত্তি করতেন :

নিশ্চিত বিশ্বাসের উপর আমরা আমাদের সুধারণাকে প্রাধান্য দিতে পারি না। এ কারণেই অধিকাংশ আলেম ইয়াজিদের 'ফিসক' তথা প্রকাশ্য পাপাচার সম্পর্কে একমত ছিলেন এবং তার পাপাচার সম্পর্কে দুর্বল বর্ণনাকেও দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন।

তবে একথাও সত্য যে, ইয়াজিদের উপর কিছু মিথ্যা অভিযোগও করা হয়েছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. সেসব অভিযোগ খণ্ডন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু তিনিও বলেছেন,

مع انه كان فيه من الظلم ما كان، ثم انه اقتتل هو وهم وفعل باهل الحرة امورا منكرة.

অর্থাৎ তা ছাড়া ইয়াজিদের মধ্যে জুলুমের অভ্যাস ছিল। তদুপরি সে এবং তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। আর সে হার্‌রার ঘটনায় লোকজনের সাথে অনেক খারাপ আচরণ করেছিল। (মিনহাজুস সুন্নাহ : ১/১১১)

তিনি আরো বলেছেন,

ومن آمن بالله واليوم الآخر لا يختار ان يكون مع يزيد ولا مع امثاله من الملوك الذين ليسوا بعادلين.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে কখনো ইয়াজিদ এবং তার মতো ন্যায়-নীতিহীন শাসকের সাথে থাকা পছন্দ করবে না। (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৪/৪৮৪)

[৫১৫] এখানে একটি বিষয় না বললেই নয়। মাওলানা আকবার শাহ নাজিবাবাদি হজরত আয়েশা রা. এর মৃত্যু সম্পর্কে একটি অদ্ভুত ভিত্তিহীন বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'হজরত আয়েশা রা. মারওয়ানের বিরোধিতা করতেন। তাই মারওয়ান একদিন হজরত আয়েশাকে ধোঁকা দিয়ে মিথ্যা দাওয়াত করল। দাওয়াতের কথা বলে ডেকে নিয়ে তাকে একটি গর্তে ফেলে দিল, যাতে খোলা তরবারি ও খঞ্জর রাখা ছিল। হজরত আয়েশা বেশ দুর্বল ও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। গর্তে পড়ে তিনি বেশ আহত

" ذَهَبَ الَّذِينَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ وَبَقِيتُ فِي خَلْفٍ كَجِلْدِ الأَجْرَبِ

তারা তো চলে গেছেন, যাদের ছায়ায় জীবন কাটানো যায়, আর আমি পড়ে আছি পরবর্তীদের মধ্যে পাঁচড়াযুক্ত উটের ন্যায়।

এ কবিতা পাঠ করে তিনি বলতেন, লাবিদের উপর আল্লাহ রহম করুন, তিনি যদি আমাদের যুগের অবস্থা দেখতেন, তা হলে না জানি কী বলতেন।

পরবর্তীতে উম্মুল মুমিনিনের এই উক্তি এমনই প্রবাদে পরিণত হয়, পূর্বসূরি সকল মনীষী একে অন্যের থেকে একথা বর্ণনা করতেন। প্রত্যেকে বলতেন, আগের মানুষেরা যদি আমাদের অবস্থা দেখতেন, জানি না তা হলে কী বলতেন।[৫১৬]

হজরত আয়েশা ৫৮ হিজরিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং রোগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. তার শুশ্রূষার জন্য গেলেন। তখন উম্মুল মুমিনিনের মধ্যে ভীতির অবস্থা বিরাজ করছিল।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আপনি দুনিয়ার বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আপনার প্রিয় ব্যক্তিদের কাছে যাচ্ছেন। আপনি আল্লাহর রাসুলের প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিলেন। আর আল্লাহর নবীর পছন্দ সর্বোত্তম ব্যক্তিই হতে পারেন। আপনার গলার হার যখন হারিয়ে গেল, তার তালাশে আল্লাহর নবী যাত্রাবিরতি করলেন, কাফেলার লোকেরা পানি না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠল, তখন আল্লাহ তায়ালা তাইম্মুমের মতো সহজ বিধান অবতীর্ণ করলেন। আপনার পবিত্রতা এবং নিষ্পাপতার প্রমাণ দিয়ে

হন এবং সেই জখমেই তার মৃত্যু হয়'। (তারিখে ইসলাম, আকবার শাহ নাজিবাবাদি : ১/৬৫৭)

এ ঘটনা সম্পূর্ণ বানোয়াট। এমনকি ওয়াকিদি ও আবু মিখনাফের মতো দুর্বল বর্ণনাকারীরাও এটা উল্লেখ করেনি। জানা নেই, মাওলানা নাজিবাবাদি এটা কোথায় পেয়েছেন। বিবেকের দাবিতেও এটা বেশ দুঃসাধ্য মনে হয়। মাওয়ানের সাথে উম্মুল মুমিনিনের যদি কোনো মনোমালিন্য থেকেও থাকে, সেজন্য তো সে উম্মুল মুমিনিনকে হত্যার দুঃসাহস করতে পারে না। আসলে মারওয়ানের এমন কিছু করার অবকাশও ছিল না। কেননা খোদ মুয়াবিয়া রা. উম্মুল মুমিনিনের সম্মুখে অত্যন্ত বিনয় ও ভদ্রতা সহকারে উপস্থিত হতেন।

[৫১৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/১৯৭,

আল্লাহর আরশ থেকে আয়াত নাজিল করলেন। এমন কোনো মসজিদ নেই, যেখানে আপনার পবিত্রতার আয়াত তেলাওয়াত করা হয় না।

এসব কথা শুনে উম্মুল মুমিনিন অবচেতনভাবে বলে উঠলেন, 'ইবনে আব্বাস, এসব রাখো। আমার তো ইচ্ছা হয়, আমি যদি বিলীন হয়ে যেতে পারতাম'।[৫১৭]

এরপর ১৭ রমজান তারাবি ও বিতির নামাজ আদায় করার পর তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই চারদিক থেকে লোকজন ছুটে আসতে থাকে। অনতিবিলম্বে জানাজার নামাজের ব্যবস্থা করা হয়। বিপুল মানুষের সমাগমে অসম্ভব ভিড় হয়েছিল। হজরত আবু হুরাইরা রা. জানাজার নামাজ পড়ান। অতঃপর জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সনের ব্যাপারে ৫৮ হিজরির মতটিই অগ্রগণ্য।[৫১৮]

হজরত আয়েশা সিদ্দিক রা. এর তিরোধানের সংবাদ পেয়ে হজরত উম্মে সালামা রা. অবচেতনভাবে বলে ওঠেন, 'আল্লাহর কসম, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর পর আয়েশাই ছিলেন আল্লাহর নবীর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।[৫১৯]

দুই. হজরত আবু হুরাইরা রা. র মৃত্যু

৫৯ হিজরিতে হজরত আবু হুরাইরা রা.-ও দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫৩৮৪। তিনি ছিলেন ইয়েমেনের দাউস গোত্রের সন্তান।

হজরত আবু হুরাইরা রা. ৮ হিজরিতে খাইবার যুদ্ধের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হন এবং নিজেকে আল্লাহর নবীর বাণীসমূহ সংরক্ষণের জন্য উৎসর্গ করেন। ৫৯ হিজরিতে তিনি অসুস্থ হন এবং কিছুদিন পরই মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।[৫২০]

---

[৫১৭] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৪৯৬, সনদ শক্তিশালী।

[৫১৮] ৫৭ হিজরির মত প্রসিদ্ধ, তবে সঠিক নয়।

[৫১৯] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৬৭৪৬, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/১৯১,

[৫২০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৩৬২, আল ইসাবাহ : ৭/৩৪৯, ৩৬২

উম্মাহর হক সম্পর্কে পিতার পক্ষ থেকে পুত্রকে অসিয়ত

হজরত মুয়াবিয়া রা. তার মৃত্যুর পর উম্মাহর অবস্থা নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, তার পুত্র ইয়াজিদ উম্মাহর জন্য একজন আদর্শ শাসক হোক। উম্মাহ তার শাসনের পক্ষে একমত হোক। চারদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা থাকুক। কারো উপর কোনো বাড়াবাড়ি না হোক। কারো হক নষ্ট না হোক।

যেহেতু এ বিষয়গুলোর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ইয়াজিদের উপরই বর্তায়, তাই হজরত মুয়াবিয়া রা. তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দান করেন, যার প্রতিটি বাক্য সোনার হরফে লিখে রাখার মতো। সাথে সাথে এ উপদেশমালা হজরত মুয়াবিয়ার দৃঢ়তা ও সতর্কতা, চিন্তাশীলতা ও দূরদর্শিতা, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামিতার সর্বোত্তম দলিল।

হজরত মুয়াবিয়া রা. ইয়াজিদকে লক্ষ করে বলেন :

১. সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে। আমি তোমার জন্য খেলাফতের এই মহান দায়িত্ব চূড়ান্ত করে দিয়েছি। এখন থেকে তুমি এর দায়িত্বশীল।

২. যদি ভালো হয়ে চলো, তবে এটা হবে আমার সৌভাগ্য। আর যদি তা না করো, তা হলে সেটা হবে তোমার দুর্ভাগ্য।

৩. মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করবে।

৪. নিজের সম্পর্কে যদি কখনো কোনো লাঞ্ছনা ও তাচ্ছিল্যের সংবাদ জানতে পারো, তা হলে তাতে ভ্রুক্ষেপ করবে না।

৫. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে কঠোরতা করবে না। তাদের মানহানি করা থেকে অত্যন্ত সাবধান থাকবে। তাদেরকে তোমার কাছে রাখার চেষ্টা করবে।

৬. যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসবে, প্রবীণ, অভিজ্ঞ, নেককার ও খোদাভীরু ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবে। তাদের মতের বিপরীত করবে না।

৭. নিজের মতের উপর কখনো গোয়ার্তুমি করবে না। কেননা একজনের মাথায় যে বিষয় আসে, তা সাধারণত সঠিক হয় না।

৮. নিজের নফসের সংশোধনের ব্যাপারে গুরুত্ব দেবে। কেননা মানুষ মন্দ বিষয়কে খুব দ্রুত ছড়িয়ে দেয়।

৯. সর্বদা জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায়ের প্রতি যত্নবান থাকবে।

যদি এসব উপদেশের উপর আমল করো, তা হলে মানুষ তাদের উপর তোমার অধিকার মনে রাখবে এবং তোমার ক্ষমতা শক্তিশালী থাকবে।[৫২১]

---

[৫২১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৬৪৪, ৬৪৫

জীবনসায়াহ্নে হজরত মুয়াবিয়া রা.

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বয়স আশি বছরেরও বেশি হয়েছিল।[৫২২] বৃদ্ধ বয়সে শাসনব্যবস্থার দুরূহ বোঝা তাকে ভীষণ কাবু করে ফেলেছিলে। ক্রমেই তিনি মৃত্যুদূতের পক্ষ থেকে তাড়া অনুভব করছিলেন। একদিন খুতবার মধ্যে বললেন, হে লোকসকল, আমি সেই ফসলের একটি অংশ, যা অচিরেই কেটে ফেলা হবে। আমি তোমাদের দায়িত্বশীল ছিলাম। আমার পরে বহু শাসক আসবে। তবে আমি তাদের চেয়ে উত্তম। যেমনিভাবে আমার পূর্বের শাসকরা আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। (হাদিস শরিফে) বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসে, আল্লাহ তায়ালাও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসেন। হে আল্লাহ, আমি আপনার সাক্ষাৎকে ভালোবাসি, আপনিও আমার সাক্ষাৎ পছন্দ করুন এবং তাতে বরকত দান করুন।[৫২৩]

জীবনের শেষদিনগুলোতে হজরত মুয়াবিয়া এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, হাতের বাহুকে মনে হচ্ছিল গাছের শুকনো ডাল। তিনি বলতেন, দুনিয়ার এর চেয়ে বেশি আর কিছুই নয়, যা আমি আস্বাদন করেছি এবং দেখে নিয়েছি। আল্লাহর কসম, আমাকে যদি ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়, তা হলে তিনদিনের বেশি তোমাদের মধ্যে থাকবো না।[৫২৪]

শেষদিকে হজরত মুয়াবিয়ার কাশির সঙ্গে রক্ত আসত। মৃত্যুর আগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। তার দুই কন্যা তার পার্শ্ব পরিবর্তন করে দিতেন। তিনি বলতেন, 'এরা এমন এক ব্যক্তিকে ওলটপালট করছে, যে দুনিয়াকে ওলটপালট করতে অভিজ্ঞ ছিল'।

---

[৫২২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১/৪৯৫

[৫২৩] তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি : ৪/৩১৬, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক : ৭৯ /২৫

[৫২৪] আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি, হাদিস : ৭৭৩১

কিন্তু রোগের এমন তীব্রতা সত্ত্বেও শাসকসুলভ ভাবগাম্ভীর্য ধরে রাখার প্রতি এত সজাগ ছিলেন যে, সাধারণ মানুষের কাছে তার শয্যাশায়ী হওয়ার বিষয়টি একদম প্রকাশ পেতে দেননি। মানুষ যখন তাকে দেখতে আসতে লাগল, পরিবারের লোকদেরকে বললেন, 'আমার চোখে সুরমা ও মাথায় তেল দিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসিয়ে দাও। আগন্তুকদের কেউ যেন বসতে না পারে। এসে শুধু দাঁড়িয়ে সালাম বলে চলে যাবে'।

মানুষ ঘরে প্রবেশ করে হজরত মুয়াবিয়াকে সালাম করল, আর দেখল তিনি বেশ হাসি-খুশিই আছেন। সবাই বলতে লাগল, আমিরুল মুমিনিন তো ঠিকই আছেন। কিন্তু এদিকে হজরত মুয়াবিয়া রা. লোকজন বিদায় নেওয়ার পর এই কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন,

وَتَجَلُّدِي لِلشَّامِتِينَ أُرِيهِمُ ... أَنِي لِرَيْبِ الدَّهرِ لاَ أَتَضَعضَعُ

> আমার বিপদে যারা খুশি হতে চায়, তাদের সম্মুখে তো আমি জাঁকজমকতা প্রদর্শন করি, যাতে তাদের দেখাতে পারি, যুগের নিপীড়ন সত্ত্বেও আমি দুর্বল হয়ে পড়িনি।

وَإِذَا المَنِيةُ أَنشَبَت أَظفَارَهَا ... أَلفَيتَ كُل تَمِيمَةٍ لاَ تَنْفَعُ

> কিন্তু মৃত্যু যখন থাবা বসিয়ে দেবে, তখন তুমি সব ধরনের তাবিজ-কবজ অক্ষম দেখতে পাবে।[৫২৫]

একজন সত্যিকার মুমিনের ন্যায় হজরত মুয়াবিয়া রা. এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশ্রিত ছিল আল্লাহর নবীর মহব্বত। সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়াসাল্লাম। মৃত্যুশয্যায় একদিন হজরত মুয়াবিয়া পরিবারের লোকদের বললেন, 'আল্লাহর নবী আমাকে একটি জামা পরিয়ে দিয়েছিলেন। বড় যত্ন করে আমি সেটি রেখে দিয়েছি। একবার নবীজির পবিত্র নখ কেটে দেওয়ার সৌভাগ্যও হয়েছিল আমার। সেই নখও একটি শিশিতে ভরে রেখে দিয়েছি। যখন আমি মারা যাব, সেই জামা দিয়ে আমাকে কাফন দেবে। আর সেই যে পবিত্র নখ, তা পেষণ করে আমার চোখে-মুখে লাগিয়ে দেবে। হয়তো এর বরকতে আল্লাহ তায়ালা আমার উপর দয়া করবেন'।

---

[৫২৫] তারিখুত তাবারি : ৫/৩২৬

আল্লাহর ভয় তার অন্তরে এত বেশি প্রবল ছিল যে, মৃত্যুর আগে তার সম্পদের অর্ধেক বাইতুল-মালে জমা করে দেওয়ার আদেশ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, অজান্তে যদি বাইতুল-মালের কোনো অর্থে কমবেশ হয়ে থাকে, তা যেন পরিশোধ হয়ে যায়।[৫২৬]

শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে হজরত মুয়াবিয়া ওয়ারিসদের লক্ষ করে বলেন, 'মহান আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে। আল্লাহকে যে ভয় করে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করে না, তাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না'।[৫২৭]

এর কিছুক্ষণ পরই তার আত্মা মর্তের দেহ ছেড়ে চলে যায়। হজরত যাহ্হাক বিন কায়েস ফিহরি রা. জানাজার নামাজ পড়ান এবং দামেশকেই তাকে দাফন করা হয়।[৫২৮]

انا لله وانا اليه راجعون

তিনি মোট বিশ বছর গভর্নর হিসেবে এবং বিশ বছর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এক উক্তি অনুযায়ী তার মৃত্যুর সময়টি ছিল, ৬০ হিজরি, ২২ রজব, বৃহস্পতিবার।[৫২৯] তবে অগ্রগণ্য মত অনুসারে মৃত্যুর তারিখ ৪ রজব।[৫৩০]

---

[৫২৬] তারিখুত তাবারি : ৫/৩২৭

[৫২৭] তারিখুত তাবারি : ৫/৩২৭ সনদ সহিহ।

[৫২৮] তারিখুত তাবারি : ৫/৩২৭

[৫২৯] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৪৫৮

[৫৩০] আল মা'রিফাতু ওয়াত তারিখ : ৩/৩২৪, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২২৯

নোট : হজরত মুয়াবিয়া রা. র মৃত্যুতারিখ সম্পর্কে জরুরি জ্ঞাতব্য

হজরত মুয়াবিয়া রা. র মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে ১৫ রজবের একটি উক্তিও আছে। তবে গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, ৪ রজবের মতটিই অধিক অগ্রগণ্য। কেননা বর্ণিত আছে, হজরত মুয়াবিয়ার মৃত্যুর সময় ইয়াজিদ ছিল দামেশক থেকে বহু দূরে হাওয়ারিনে। আবার এটাও প্রমাণিত যে, ২৭ রজব ইয়াজিদের পক্ষে বাইয়াতের আদেশপত্র নিয়ে পত্রবাহক মদিনায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং পরদিন ২৮ রজব হজরত হুসাইন রা. ইয়াজিদের বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করে মদিনা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। (দ্রষ্টব্য : তাবারি : ৫/ ৩৮১, আনসাবুল আশরাফ : ৩/১৬০)→

এসব তথ্য সামনে রেখে যদি হজরত মুয়াবিয়ার মৃত্যু ২২ রজব ধরা হয়, তাহলে একসাথে কয়েকটি বিষয় মাত্র পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে মেনে নিতে হবে। যথা:

১. দামেশক থেকে ইয়াজিদের কাছে মৃত্যুসংবাদ পৌছা।
২. হাওয়ারিন থেকে তার দামেশকে আসা।
৩. শোকপালনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করা।
৪. খেলাফতের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে আদেশ জারি করা।
৫. ইয়াজিদের বার্তাবাহকের মদিনায় পৌছা।

বলাবাহুল্য যে, তৎকালীন যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থার গতি হিসাবে মাত্র পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে এতগুলো বিষয় হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কেননা সে যুগে সফরের গতি ছিল নিম্নরূপ :

সাধারণ কাফেলা একদিনে অতিক্রম করত এক মঞ্জিল (তথা ১৬ মাইল/ পৌনে ২৬ কিলোমিটার)।

দ্রুতগামী অশ্বারোহী অতিক্রম করত দুই মঞ্জিল (প্রায় ৫২ কিলোমিটার)।

আর ডাক বিভাগের যাত্রার গতি ছিল দিনে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। কেননা এর জন্য প্রতি চৌকিতে জন্তু ও আরোহী পরিবর্তন করা হতো।

এখন চিন্তার বিষয় হলো, 'হাওয়ারিন' দামেশকের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি এলাকা।

(حوارين: بين دمشق وتدمر وحمص. العالم الاثيرة، ص: ١٠٥)

সুতরাং যদি সে যুগের সাধারণ গতি ধরা হয়, তাহলে দামেশক থেকে হাওয়ারিনে বার্তাবাহকের যাওয়া এবং হাওয়ারিন থেকে দামেশকে ইয়াজিদের আসতে কমপক্ষে তিনদিন অবশ্যই ব্যয় হওয়ার কথা। দ্বিতীয়ত এমনটা হওয়া দুরূহ যে, ইয়াজিদ দামেশক পৌছেই বাইয়াতের জন্য পত্রবাহক পাঠিয়ে দিয়েছিল। অবশ্যই এর পূর্বে তাকে শোকসংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনে অন্তত দুই-তিনদিন ব্যস্ত থাকার কথা। তৃতীয়ত এটাই স্বাভাবিক যে, খেলাফতের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তারপর বাইয়াতের আদেশপত্র প্রচার করা হয়েছিল। এখানেও কয়েকদিন সময় প্রয়োজন। চতুর্থত দামেশক থেকে মদিনার দূরত্ব ১২৭৪ কিলোমিটার (৭৯১ মাইল)। অর্থাৎ প্রায় ৪৮ মঞ্জিল। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এ পথ ডাকবিভাগের ঘোড়ায় পাড়ি দেওয়া হয়েছে, তাতেও বার্তাবাহকের জন্য মদিনায় পৌছতে বারো-তেরো দিন সময় ব্যয় হওয়ার কথা।

এখন যদি ধরা হয় যে, উক্ত কাজগুলো সে-যুগের সাধারণ গতিতে হয়েছিল, তাহলে মৃত্যুর তারিখ ৪ রজব হওয়াই যৌক্তিক ও সঠিক বলে মনে হয়। অবশ্য যদি ধরা হয়, সব কাজ অত্যন্ত দ্রুত ও অসাধারণ গতিতে করা হয়েছে, যেমন ইয়াজিদ একদিনের মধ্যে মৃত্যুসংবাদ পেয়েছে, দ্বিতীয়দিনই সে দামেশকে এসেছে, আর এসেই বাইয়াতের আদেশ দিয়ে পত্রবাহক পাঠিয়ে দিয়েছে, আর সে পত্রবাহক প্রতিদিন ১০০-১৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মদিনায় পৌছে গেছে, তাহলে মৃত্যুতারিখ ১৫ রজবও মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু হজরত হুসাইন রা. র মদিনা থেকে

হাদিসের দর্পণে হজরত মুয়াবিয়া রা.

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলকে যদি কেবল ইতিহাসের গ্রন্থাদির আলোকে বিবেচনা করা হয়, তা হলে অবশ্যই মনে হবে তিনি একজন দুনিয়াদার বাদশাহ ছিলেন। কিন্তু হাদিসের নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডারের প্রতি একটিবারের জন্যও দৃষ্টি বুলিয়ে নেওয়া যায়, তা হলে মনে হবে তিনি ছিলেন একাধারে একজন কর্মতৎপর, বিজ্ঞ আলেম, আন্তরিক ও খোদাভীরু শাসক। নিম্নে হাদিসভাণ্ডারের আলোকে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রতিচ্ছবি লক্ষ করুন।

অন্যায় ও গর্হিত কাজের প্রতি ঘৃণা

হজরত মুয়াবিয়া রা. নিজেও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতেন এবং অন্যদেরও এজাতীয় বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। আজো তার বয়ান ও আলোচনাগুলো এ চেতনার দর্পণ হয়ে আছে। একবার তিনি বললেন, আল্লাহর নবী সাতটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। আমিও সেগুলো নিষেধ করি। সেগুলো এই : মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা, গান গাওয়া, ছবি বানানো, (অবৈধ প্রেমের) কবিতা আবৃত্তি করা, (পুরুষের জন্য) স্বর্ণ ব্যবহার করা, হিংস্র পশুর চামড়া পরিধান করা, লৌকিকতা ও আড়ম্বরতা এবং (পুরুষের জন্য) রেশমি কাপড় পরিধান করা।[৫৩১]

একবার হজরত মুয়াবিয়া রা. জানতে পারলেন যে, এক ব্যক্তি তার মেয়েকে আরেকজনের কাছে বিবাহ দিয়েছে আর তার মোহর হিসেবে

কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার তারিখটিকে আপন স্থানে তথা ২৭ রজব ধরে, হজরত মুয়াবিয়ার মৃত্যুতারিখ ২২ রজব হওয়া কোনোভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। হ্যাঁ, যদি হজরত হুসাইন রা. এর মদিনা থেকে রওনা হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি মত থাকত, তাহলে হয়তো কোনো সুযোগ হতো। কিন্তু এ সম্পর্কে আমরা একাধিক নয়, কেবল একটি মতই পেয়েছি।

[৫৩১] মুসনাদে আবি ইয়া'লা, হাদিস : ৭৩৭৪,

ওই ব্যক্তির মেয়েকে নিজে বিবাহ করে নিয়েছে। তখন তিনি তার গভর্নরকে আদেশ পাঠান যে, উক্ত দুই দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দাও। চিঠিতে তিনি লিখলেন, এটা হচ্ছে 'শাগার' চুক্তি, আল্লাহর নবী এর থেকে নিষেধ করেছেন'।[৫৩২]

অনেক সময় অন্যায় কাজ থেকে বাধা প্রদানের জন্য এবং অন্যায়ের প্রতি মানুষের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, বলো, এসব বিষয় থেকে আল্লাহর নবীর নিষেধ করার বিষয়টি কি তোমরা জানো না?[৫৩৩]

সাবায়ি বর্ণনাকারীরা হজরত মুয়াবিয়ার পরিবারে ইয়াজিদকে মদ্যপায়ী এবং হজরত মুয়াবিয়াকে এ কাজের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রদর্শনকারী বলে উল্লেখ করেছে। অথচ এটা মিথ্যা অপবাদ। কেননা হজরত মুয়াবিয়া মদ্যপান থেকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করতেন এবং আল্লাহর নবীর এ আদেশ শোনাতেন, যে ব্যক্তি মদ পান করবে, তাকে চাবুক লাগাবে, আবার পান করলে আবার লাগাবে, আবার পান করলে আবার লাগাবে, তারপর যদি আবারও পান করে, তা হলে চতুর্থবারে তাকে হত্যা করবে'।[৫৩৪]

ফ্যাশন, কৃত্রিমতা এবং লৌকিকতা ও আড়ম্বরতা গতিরোধ

হজরত মুয়াবিয়া রা. আড়ম্বরতা ও লৌকিকতা খুব অপছন্দ করতেন। এজাতীয় আচরণ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাধা প্রদান করতেন। তার আমলে নারীরা মাথায় কালো পট্টি বাঁধা শুরু করেছিল এবং মাথায় পরচুলা লাগানোর ফ্যাশন চালু করেছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. এ প্রথা 'মিথ্যা' বলে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন, 'আমার ধারণা, এটা ইহুদি ছাড়া আর কারো প্রথা নয়'।

---

[৫৩২] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৯০২, সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ২০৭৫, কিতাবুন নিকাহ, বাবুন ফিশ শিগার।

[৫৩৩] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৯০৯

[৫৩৪] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৮৯৩, আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি, হাদিস : ৫২৭৮, কিতাবুল হাদ্দি ফিল খামার,
এখানে মনে রাখতে হবে যে, চতুর্থ বার মদ্যপায়ীকে হত্যা করার বিষয়টি হাদিস ব্যাখ্যাকারদের মতে ঐ সময় প্রযোজ্য হবে, যখন সে মদকে হালাল মনে করে পান করবে।

তারপর তিনি মানুষকে এসব প্রথা থেকে বেঁচে থাকার জন্য উৎসাহিত করেন।[৫৩৫]

মূলত তিনি নিজে আল্লাহর নবী থেকে এজাতীয় বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা শুনেছিলেন। তাই তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলতেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মিথ্যা' থেকে নিষেধ করেছিলেন, অথচ তোমরা সেই নিকৃষ্ট প্রথাটাই গ্রহণ করতে শুরু করেছ'।

একদিন এক ব্যক্তি লাঠিতে ভর করে মাথায় পট্টি বেঁধে এলো। হজরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, মন দিয়ে শোনো, এটাই সেই কৃত্রিমতা'।[৫৩৬]

এমনিভাবে কিছু মানুষ ফ্যাশন করে মাথায় চুল রাখতে শুরু করেছিল। হজরত মুয়াবিয়া তার বিরুদ্ধে আইন জারি করেছিলেন। একবার তিনি মদিনায় গিয়ে এজাতীয় চুলের একটি গোছা হাতে নিয়ে মসজিদে নববির মিম্বারে দাঁড়িয়ে মানুষকে দেখালেন (হয়তো সেটি ছিল কোনো ফ্যাশনপ্রিয় ব্যক্তির কর্তিত চুলের গোছা)। তখন বললেন, আমি যেন আগামীতে আর কাউকে ইহুদিদের মতো এমন চুল রাখতে না দেখি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে কৃত্রিমতা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।[৫৩৭]

তিনি আরো বললেন, হে মদিনাবাসী, তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আল্লাহর নবীকে আমি বলতে শুনেছি যে, তিনি এসব কৃত্রিমতা প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, বনি ইসরাইলের নারীরা যখন এমন কৃত্রিমতা শুরু করেছিল, তখন তাদের উপর আজাব এসেছিল।[৫৩৮]

দীনকে তার প্রকৃত রূপরেখায় অবিচল রাখার প্রেরণা

হজরত মুয়াবিয়া রা. দীনকে তার আসল রূপরেখায় ধরে রাখার জন্য ছিলেন ব্যাকুল। বিদআত তথা দীনের নামে নব আবিষ্কৃত বিষয়ের তিনি

---

[৫৩৫] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৭০২, সুনানে নাসায়ি মুজতাবা, হাদিস : ৫২৪৬

[৫৩৬] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৭০৩, বাবু তাহরিমি ফাসলিল ওয়াসিলাতি ওয়াল মুসতাওসিলাহ।

[৫৩৭] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৯৩৮, কিতাবুল লিবাস, বাবুল ওয়াসিল ফিশ্ শা'র।

[৫৩৮] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৯১১

ছিলেন ঘোরবিরোধী। দীনের মধ্যে কোনো সংযোজন বা বিয়োজন তিনি বরদাশত করতেন না।

একবার তিনি জানতে পারলেন যে, মানুষ আসরের পরে দুই রাকাত নফল পড়তে শুরু করেছে। তখন তিনি তার বিভিন্ন ভাষণে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, 'আজকাল তোমরা এক নতুন নামাজ চালু করেছ। অথচ আমরা আল্লাহর নবীর সঙ্গে ছিলাম। আমরা তাকে এ নামাজ পড়তে দেখিনি। বরং তিনি আসরের পরে দুই রাকাত নফল পড়তে নিষেধ করেছেন'।[৫৩৯]

মানবজীবনের মূল্যায়ন

প্রসিদ্ধ আছে, হজরত মুয়াবিয়া রা. অত্যন্ত নির্দয়ভাবে মানুষকে হত্যা করতেন। অথচ তিনি নিজে বলতেন যে, 'আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কাছে যেকোনো গুনাহ ক্ষমার আশা করা যায়, মানুষের কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ করা ও জেনে-শুনে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা ছাড়া'।[৫৪০]

অনৈসলামিক প্রথা বর্জন

মানুষ হজরত মুয়াবিয়া রা. কে অনারব রাজতন্ত্রের প্রথা পালনকারী বলে রটিয়ে দিয়েছে। অথচ তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শাসক হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য অনৈসলামিক কৃষ্টিকালচার একদম পছন্দ করতেন না।

একবার তিনি হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর ও হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. এর কাছে গমন করলেন। তখন হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. বসে থাকলেন, আর হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. দাঁড়িয়ে গেলেন।

হজরত মুয়াবিয়া রা. তাকে সতর্ক করে বললেন, এমনটি করবে না। কেননা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

---

[৫৩৯] শরহু মাআনিল আসার, হাদিস : ১৮২৩

[৫৪০] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৯৫৩

যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার সম্মানে মানুষ দাঁড়িয়ে যাক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে মনে করে'।[৫৪১]

তোষামোদকারী লোকদের মুখে লাগাম প্রদান

অনেকে হজরত মুয়াবিয়া রা. কে একজন তোষামোদপ্রিয় শাসক বলে আখ্যায়িত করেছে। যার কাছে সত্যবাদী লোকদের কোনো স্থান ছিল না। বরং চাটুকারদের মর্যাদাই ছিল তার কাছে বেশি।

অথচ সত্য এই যে, হজরত মুয়াবিয়া চাটুকারদের পছন্দ করতেন না। তোষামোদকারী লোকদের থেকে বেঁচে থাকার জন্য তিনি মানুষকে প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন করতে নিষেধ করতেন। তিনি আল্লাহর নবীর এ হাদিস শোনাতেন,

اياكم والتمادح فانه ذبح

> প্রশংসা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা এটা জবাই করে দেওয়ার সমতুল্য।[৫৪২]

সত্যকথনের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ ও বাকস্বাধীনতা

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর যুগে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সত্য বলার পরিবেশ যদিও খেলাফতে রাশেদার যুগের মতো ছিল না, তবে সত্যবাদী মানুষ অবশ্যই ছিলেন। হজরত মুয়াবিয়া রা. অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তাদের কথা শুনতেন। বরং মানুষের মধ্যে সত্য বলা ও সত্য প্রকাশের আগ্রহ যদি কম দেখতেন, তা হলে তিনি জালেম ও অত্যাচারী শাসকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার ভয় করতেন। নিম্নে এ সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা লক্ষ করুন।

- একবার হজরত মুয়াবিয়া পরীক্ষামূলকভাবে তার ভাষণে বললেন, 'এ সম্পদ আমাদের। সুতরাং যাকে ইচ্ছা দেব, যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করব'।

---

[৫৪১] শরহু মুশকিলিল আসার লিত তাহাবি, হাদিস : ১১২৭, মুসনাদে আবি দাউদ তায়ালিসি, হাদিস : ১০৪২, হাদিসে মুয়াবিয়া রা., হাদিস : ১৬৮৭৬

[৫৪২] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৮৪২, সনদ সহিহ, আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ১৯/৩৫০,

তিনি একথা বলে খুতবা শেষ করলেন। কিন্তু কেউ কোনো আপত্তি করল না। দ্বিতীয় জুমায়ও তিনি একই কথা বললেন। তখনো সবাই নীরব থাকল। কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর তৃতীয় জুমায় যখন তিনি একথা বললেন, তখন এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলল, সম্পদ তো আমাদের, কেউ যদি তা আটকে রাখে, তা হলে আমাদের এই তরবারি ফয়সালা করবে'।

নামাজের পর তিনি সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে গেলেন। নিজের সাথে সিংহাসনে বসালেন এবং উপস্থিত লোকদের লক্ষ করে বললেন, 'আমি আল্লাহর রাসুলকে বলতে শুনেছিলাম যে, অচিরেই এমন মানুষ আসবে, যাদের কথা কেউ খণ্ডন করবে না। তারা বানরের মতো দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে'। আমি পরপর দুই জুমায় ওই কথাটা বলেছি। কিন্তু কেউ খণ্ডন করেনি। ফলে আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে, আমি হাদিসে বর্ণিত হুঁশিয়ারির আওতায় পড়ে যাই কিনা। এই ভাইটি আমার কথা খণ্ডন করে আমাকে রক্ষা করেছে। আল্লাহ তাকে সুখে রাখুক। তাই আমি আশাকরি, আল্লাহ আমাকে ওই জালেমদের মধ্যে গণ্য করবেন না।[৫৪৩]

- একবার হজরত মুয়াবিয়া রা. জুমার খুতবায় প্লেগ মহামারি থেকে পলায়ন করা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ একটি হাদিস শোনালেন এবং তাতে একটি ভুল করলেন। তখন হজরত উবাদা বিন সামিত রা. খুতবার মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং চিৎকার করে বললেন, তোমার মা হিন্দ তোমার চেয়ে অধিক ইলমের অধিকারী ছিল।

  নামাজের পর হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত উবাদা বিন সামেত রা. কে ডেকে খুতবার মধ্যে ইমামের ভুল ধরার ব্যাপারে সাবধান করলেন। কিন্তু তার কথা শুনে হজরত মুয়াবিয়ার বিশ্বাস হয়ে গেল যে, হাদিসটি শোনাতে গিয়ে আসলেই তার ভুল হয়ে গেছে। তাই আসরের নামাজের পরে মিম্বারে দাঁড়িয়ে তিনি নিজে ঘোষণা করলেন যে, আমি মিম্বারে দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে একটি হাদিস শুনিয়েছিলাম। কিন্তু ঘরে গিয়ে জানতে পারলাম হাদিসটি তেমনই, যেমন বলছেন

[৫৪৩] মুসনাদে আবি ইয়া'লা, হাদিস : ৭৩৮২, সনদ সহিহ।

হজরত উবাদা। সুতরাং তার থেকেই শিখে নেবে, তিনি আমার চেয়ে বড় আলেম'।[৫৪৪]

- এমনিভাবে একবার হজরত মিসওয়ার বিন মাখরামা রা. কোনো কাজে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে গেলেন। হজরত মুয়াবিয়া রা. জিজ্ঞেস করলেন, আপনি শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকেন, সেগুলো কী কী?

  তিনি সংকোচ করতে লাগলেন আর হজরত মুয়াবিয়া বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। অবশেষে বললেন, না, বলতেই হবে। আপনার মনে যত অভিযোগ আছে সব আজ বলুন।

  হজরত মিসওয়ার বিন মাখরামা রা. বলেন, হজরত মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে আমার মনে যত অভিযোগ ছিল, সব বলে দিলাম। একটিও বাদ দিলাম না। হজরত মুয়াবিয়া রা. সেগুলো শুনে বললেন, 'দেখুন, ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে কেউ নয়। আপনিও আপনার অন্তরে এমন কিছু বিষয় অনুভব করেন, যদি আল্লাহ তা ক্ষমা না করেন, তা হলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন'।

হজরত মিসওয়ার বললেন, নিশ্চয়ই।

হজরত মুয়াবিয়া বললেন, যদি তা-ই হয়, তা হলে আপনি আমাকেও আপনার মতো আল্লাহর দরবারে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য কেন মনে করেন না? আল্লাহর কসম, আমি সাধারণ মানুষের সংশোধন, শরয়ি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন এবং জিহাদের মতো যে খেদমতে রত আছি, তা এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে ভারী। আর আমি সেই দীন-ধর্ম স্বীকার করি, যাতে প্রভু ভালো কাজগুলো গ্রহণ করেন এবং মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করেন।

তারপর বললেন, 'আল্লাহর কসম, যখনই আমার সামনে আল্লাহ ও আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো বিষয় থেকে কোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ আসে, তখন আমি আল্লাহ ছাড়া কিছু গ্রহণ করি না'।

---

[৫৪৪] জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, হাদিস : ৫৮৩২, তারিখে দিমাশক : ২৬/৯৫, হজরত উবাদা বিন সামিত রা. এর জীবনী।

হজরত মিসওয়ার রা. বলেন, আমি হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দলিল নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। অবশেষে আমি মানতে বাধ্য হলাম যে, তিনি আমাকে নির্বাক করে দিয়েছেন।

এ ঘটনার পর থেকে হজরত মুয়াবিয়ার আলোচনা এলে হজরত মিসওয়ার সব সময় কল্যাণের দোয়া করতেন।[৫৪৫]

অনাড়ম্বর জীবনযাপন

হজরত মুয়াবিয়ার জীবনযাপন এত সাদাসিধে ছিল যে, তিনি যখন আরাম করতেন, তখনও তার সাথিরা আশপাশে বসে কথা বলত। কাউকে কোনো বাধা দেওয়া হতো না।[৫৪৬]

শরিয়তের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়, সুন্নাত ও মুসতাহাবের প্রতিও যত্নশীলতা

অনেকে মনে করেন, হজরত মুয়াবিয়া রা. ছিলেন নিছক জাগতিক শাসক। ফলে ক্ষমতার নিরাপত্তা ও উন্নয়নের প্রতি তার নজর থাকলেও শাসনের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করা ও ইসলামি ব্যক্তিত্ব গঠন করার প্রতি তার মনোযোগ ছিল না। তাই তিনি ফিকহে শাখাগত বিধান ও সুন্নাত উপেক্ষা করতেন।

অথচ হাদিসের কিতাবে উল্লিখিত তথ্য এসব ধারণাকে অস্বীকার করে। হাদিস থেকে জানা যায়, হজরত মুয়াবিয়া রা. ব্যক্তিজীবনে সুন্নাত, এমনকি মুসতাহাব বিষয়ের প্রতিও লক্ষ রাখতেন। একবার এক ব্যক্তি হজরত মুয়াবিয়ার সঙ্গে জামাতে নামাজ আদায় করল। নামাজের পর সে একই স্থানে দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়তে আরম্ভ করল। হজরত মুয়াবিয়া রা. তাকে ডেকে এ হাদিস শোনালেন :

لا توصل صلوة بصلوة حتى تتكلم او تخرج

নামাজের পর সঙ্গে সঙ্গে আরেক নামাজ শুরু করে দিয়ো না, কোনো কথা বলে নাও, অথবা স্থান থেকে সরে দাঁড়াও।[৫৪৭]

---

[৫৪৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/১৫১,

[৫৪৬] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৯৫২

[৫৪৭] আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, হাদিস : ৪৯৪৪,

প্রিয় রাসুলের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার বিপুল প্রেরণা

হজরত মুয়াবিয়া রা. সুন্নাত ও ফিকহের আলেম ছিলেন। এ ইলমের প্রচার-প্রসারের প্রেরণাও ছিল তার মধ্যে প্রচুর। তিনি মনে করতেন, দীনের প্রচার-প্রসার ঘটানো মুসলিম শাসকের নৈতিক দায়িত্ব। তাই বিভিন্ন সুযোগে হাদিস বর্ণনা করে তিনি এ দায়িত্ব পালন করতেন।

হজরত মুয়াবিয়া অজু করে তার সাথিদেরকে দেখাতেন, আর বলতেন, এভাবে আল্লাহর নবী অজু করতেন। মাথা মাসেহ করার ক্ষেত্রে মানুষ প্রায় ভুল করে। হজরত মুয়াবিয়া রা. নিজে মাসাহ করে দেখাতেন আল্লাহর রাসুল কীভাবে উভয় হাতের তালু মাথার অগ্রভাগে রেখে মাসাহ করে করে উভয় হাত পেছন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতেন এবং সেখান থেকে আবার কীভাবে কপাল পর্যন্ত টেনে আনতেন।[৫৪৮]

জনৈক তাবেয়ি বলেন, একদা আমরা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে ছিলাম। এমন সময় আজান শুরু হয়ে গেল। তিনি আল্লাহু আকবার, আল্লাহ আকবার থেকে আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসুলুল্লাহ পর্যন্ত প্রতিটি বাক্যের উত্তরে একই বাক্য উচ্চারণ করলেন। হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ-এর উত্তরে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়লেন। আর অবশিষ্ট বাক্যগুলোর উত্তরে একই বাক্য বললেন। শেষে বললেন, এভাবেই আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি।[৫৪৯]

বিশেষ দিবসগুলো সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান ও ভারসাম্য রক্ষা

হজরত মুয়াবিয়া রা. বিশেষ বিশেষ দিন, যেমন শবে কদর, আশুরা, ইত্যাদির প্রতি লক্ষ রাখতেন। অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন, যেন সবাই আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত এসব সময় থেকে উপকৃত হয়। হজরত মুয়াবিয়া রা. থেকে আল্লাহর নবীর এ ইরশাদ বর্ণিত আছে : 'শবে কদরকে রমজানের সাতাইশতম রাতে তালাশ করো'।[৫৫০]

---

[৫৪৮] মুসনাদে আহমাদ বিন হামবল, হাদিস : ১৬৮৫৪, ১৬৮৫৫

[৫৪৯] আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, হাদিস : ১৯২৮, সহিহ ইবনে খুজাইমা : ২/২১৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৮৯৬, ১৬৮৩২, ১৬৮২৮

[৫৫০] সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৩৬৮০

কিন্তু এজাতীয় উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে তিনি ভারসাম্য রক্ষার প্রতি পূর্ণ সতর্ক থাকতেন, যাতে একটি মুসতাহাব আমলকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিংবা ওয়াজিব মনে না করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় একবার মহররমের দশ তারিখে মদিনায় থাকাকালে তিনি লোকজনকে লক্ষ করে বলেন, হে মদিনাবাসী, আজ পবিত্র আশুরার দিন। এদিনের রোজা তোমাদের উপর ফরজ নয়। অবশ্য আমি রোজা রেখেছি। তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা রাখতে পারে, ইচ্ছা না হলে নাও রাখতে পারে।[৫৫১]

ইলমের জন্য শিক্ষার্থীসুলভ স্পৃহা

হজরত মুয়াবিয়া রা. একজন আলেম ও ফকিহ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে সব সময় একজন শিক্ষার্থী মনে করতেন। সারাজীবন সুন্নাত শিখতেন। হজরত মুগিরা বিন শু'বাকে চিঠি লিখেছিলেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের পর যে দোয়া পড়তেন, তা লিখে পাঠাও। তিনি এই দোয়া লিখে পাঠালেন,

لا اله الا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

হজরত মুয়াবিয়া নিজে এ দোয়া মুখস্থ করেছেন এবং অন্যদেরকেও শিখিয়েছেন।[৫৫২]

দীনি মাসআলার তাহকিক (যাচাই-বাছাই)

যেকোনো একটি বিষয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ফিকহি মাসআলার পূর্ণ তাহকিক না করতেন এবং পুরো সনদ সম্পর্কে অবগত না হতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। শরয়ি মাসআলা ও সুন্নাত শিক্ষা করা এবং তাকে ব্যাপক করার প্রেরণা এত অধিক ছিল যে, একদিন খুতবা চলাকালে মিম্বারে দাঁড়িয়েই হজরত কাসির বিন সালত রা. কে আদেশ করলেন যে, উম্মুল মুমিনিন রা. র কাছে গিয়ে এ মাসআলাটি জিজ্ঞেস করে আসুন।[৫৫৩]

---

[৫৫১] শরহু মাআনিল আসার, হাদিস : ৩২৯৮, বাবু সওমি আশুরা'

[৫৫২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৬১৫, কিতাবুল কাদরি, বাবু লা মানিআ লিমা আ'তাল্লাহ।

[৫৫৩] শরহু মাআনিল আসার, হাদিস : ১৮০৫, মুসনাদুশ শাফিয়ি : ১/৩৬২

সুতরাং এক একটি বিষয়ের জন্য এত যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধান হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ইলমি ও তাহকিকি মেজাজের স্পষ্ট প্রমাণ।

ইলমি ও ফিকহি পারদর্শিতা ও বিশিষ্ট সাহাবিদের আস্থা

হাদিস সম্পর্কে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দৃষ্টি এত গভীর ছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম কিছু হাদিস একমাত্র তার মাধ্যমেই জানতে পেরেছিলেন এবং সকলেই অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে তা গ্রহণও করেছিলেন। এমনকি বনু হাশিমের লোকেরাও আল্লাহর নবীর হাদিসের ক্ষেত্রে হজরত মুয়াবিয়ার উপর পূর্ণ আস্থা রাখতেন। আর তার ইলমি ও ফিকহি প্রাজ্ঞতার অবস্থা এমন ছিল যে, হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এর মতো কয়েকজন গভীর ইলমের অধিকারী ব্যক্তিও কয়েকটি সুন্নাত তার থেকে শিখেছিলেন।

একবার হজের সময় তাওয়াফ চলাকালে হজরত মুয়াবিয়া রা. দেখলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কাবাঘরের চার কোণেই চুম্বন করছেন। হজরত মুয়াবিয়া বললেন, 'আল্লাহর নবী তো কেবল দুই কোণে (হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়েমেনি)-কে চুম্বন করেছিলেন'।[৫৫৪]

হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. একবার নিজেই বলেছেন, হজরত মুয়াবিয়া রা. আমাকে বলেছেন, তিনি আল্লাহর নবীকে কাঁচি দ্বারা স্বীয় চুল খাটো করতে দেখেছেন।

একথা শুনে হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর শাগরিদ হজরত মুজাহিদ ও আতা বলতে লাগলেন, হজরত, এ হাদিস তো আমরা অন্যকারো থেকে শুনিনি'।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, মুয়াবিয়া এমন ছিলেন না যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ক্ষেত্রে তাকে সন্দেহ করা যায়'।[৫৫৫]

---

[৫৫৪] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৮৫৮, গায়াতুল মাকসাদ ফি যাওয়াইদিল মুসনাদ লিল হাইসামি : ২/৬৩

[৫৫৫] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৮৬৩, আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ১৯/৩০৯

আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন, শাসনক্ষমতার প্রথম দায়িত্ব

হজরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে অপপ্রচার চালানো হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর দণ্ডবিধিকে অকার্যকর করতেন, শরিয়তের বাস্তবায়নকে বর্জন করতেন এবং রাজনৈতিক স্বার্থে মানুষের উপর জুলুম করতেন। অথচ তিনি সর্বদা জোর দিয়ে বলতেন, দীন কায়েম করাই হচ্ছে শাসনক্ষমতার মূল। এ উম্মাহর ক্ষমতা ও নেতৃত্ব একমাত্র দীনের ভিত্তিতেই টিকে থাকবে, অন্যথায় নয়। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একবার তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি, এই খেলাফতের দায়িত্ব কুরাইশের হাতেই থাকবে। যারাই কুরাইশের হাত থেকে এ দায়িত্ব ছিনিয়ে নিতে চাইবে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা অধোমুখী করে আছড়ে ফেলবেন। তবে এটা ততদিন, যতদিন কুরাইশরা দীন কায়েমের পথে অবিচল থাকবে।'[৫৫৬]

খেলাফতের গুরুত্ব

মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি ধরে রাখার জন্য হজরত মুয়াবিয়া রা. খেলাফতব্যবস্থা ও শাসকের বিদ্যমানতাকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, তেমনি এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততার বিষয়টিও জরুরি মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি এ হাদিস শোনাতেন, 'যে ব্যক্তি কোনো শাসকের অধীন হওয়া ছাড়া মারা যাবে, সে জাহিলিযুগের মতো মরবে'।[৫৫৭]

বিভেদ সৃষ্টিকারীদের সংশোধন : শরিয়ত আঁকড়ে ধরা

নতুন নতুন বিশৃঙ্খলা ও বিভেদের বিভিন্ন নিদর্শন হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দৃষ্টিতে ছিল। কিন্তু তিনি মনে করতেন, এর একমাত্র সমাধান, হলো সবার আগে এই দীনের প্রথম আহ্বায়ক তথা আরবজাতিকে শরিয়তের উপর সেভাবে আমল করতে হবে, যেভাবে আল্লাহর নবী তাদেরকে গড়ে তুলেছিলেন।

---

[৫৫৬] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭১৩৯, কিতাবুল আহকাম, বাবুল উমারা' মিন কুরাইশ

[৫৫৭] আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ১৯/৩৮৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৮৭৬, সনদ সহিহ।

একবার তিনি হজের সময় মক্কায় ভাষণ দানকালে বললেন, আল্লাহর নবী ইরশাদ করেছেন, ইহুদি ও নাসারারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করে ৭২ দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আর এই উম্মত অচিরেই ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাদের মধ্যে একটি দল ছাড়া সব জাহান্নামে যাবে। মুক্তিপ্রাপ্ত সেই একটি দল হলো, মুসলমানদের দল (সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জামাত)।

এ হাদিস শোনানোর পর তিনি অত্যন্ত আবেগ ও মমতার সঙ্গে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ করে বলেন, আল্লাহর কসম, হে আরবজাতি, যে স্পষ্ট দীন তোমাদের নবী নিয়ে এসেছেন, তোমরা যদি তার উপর যত্নবান না হও, তা হলে অন্যদের থেকে কী করে আশা করা যায় যে, তারা এ দীন রক্ষা করবে'?[৫৫৮]

সাহাবিদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা

হজরত মুয়াবিয়া রা. সাহাবায়ে কেরামের সকল শ্রেণিকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা স্বীকার করতেন। কেউ যেন মনে কষ্ট না পান, সেদিকে লক্ষ রাখতেন।

একবার আনসারদের একটি মজলিসে গমন করে বললেন, তোমাদের মর্যাদা সম্পর্কে আরেকটি হাদিস কি আমি শোনাবো না? আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আনসারদের ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। আর যে আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহও তার প্রতি রাগান্বিত হন'।[৫৫৯]

জিহাদ ও দীন কায়েমের অদম্য স্পৃহা

জিহাদ ও দীন কায়েম করা ছিল হজরত মুয়াবিয়া রা. এর জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তিনি জিহাদের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন যৌবনে। তারপর মাঝে বিশৃঙ্খলার কয়েকটি বছর বাদ দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করে গিয়েছিলেন। তরবারি কিংবা বর্শা, কথা কিংবা লিখন, যে যার দ্বারা জিহাদে অবতীর্ণ হতো, হজরত মুয়াবিয়া রা.

---

[৫৫৮] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৯৩৭

[৫৫৯] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩২৩৫৬,

তাদের মনোবল বৃদ্ধি করতেন। এ সম্পর্কে তিনি আল্লাহর নবীর বিভিন্ন বাণী শোনাতেন। তন্মধ্যে এ হাদিসটিও ছিল : এ উম্মাহর একটি দল সর্বদা আল্লাহর আদেশের উপর অবিচল থাকবে। কারো বিরোধিতা কিংবা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি যতদিন আল্লাহর আদেশ (কেয়ামত) না আসবে ততদিন তারা এভাবেই সত্যের উপর অবিচল থাকবে।[৫৬০]

জিহাদের ধারাবাহিকতাকে বেগবান করার লক্ষ্যে হজরত মুয়াবিয়া রা. ইউরোপ জয় করতে চেয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি কনস্টান্টিনোপলে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সেখানে বড় বড় সাহাবি ও তার সন্তানদেরকে প্রেরণ করেন। জীবনের শেষসময়ে তিনি তার একান্ত ঘনিষ্ঠজনদের যে উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, তা ছিল এই :

شدوا خناق الروم، فانكم تضبطون بذالك غيرهم من الامم

> তোমরা রোমকদের টুটি চেপে ধরো। কেননা তাদের মাধ্যমে তোমরা অন্যান্য জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।[৫৬১]

ইতিহাস সাক্ষী, মুসলিম উম্মাহ যতদিন পর্যন্ত এ জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের এই উপদেশ স্মরণ রেখেছিল, ততদিন পর্যন্ত গোটা পৃথিবীতে তাদেরই ক্ষমতা বিরাজমান ছিল। যেদিন থেকে তারা এ উপদেশটি ভুলে গেছে এবং ইউরোপ মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছে, সেদিন থেকে দেখতে দেখতেই ইউরোপের দাপট ও ক্ষমতার বড় বড় প্রাসাদ পৃথিবীর মাটিতে শেকড় গেড়েছে।

হাদিস বর্ণনায় হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পন্থা

হজরত মুয়াবিয়া রা. হাদিসের সনদের গুরুত্বকে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতেন। তাই হাদিস শোনানোর ক্ষেত্রে তার নিয়ম ছিল, কখনো কোনো মাধ্যম উহ্য রাখার সন্দেহও সৃষ্টি হতে দিতেন না। সব সময় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তিনি বলতেন,

---

[৫৬০] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪৬০, কিতাবুত তাওহিদ, বাবু কওলিল্লাহ : ইন্নামা কওলুনা লি শাইইন

[৫৬১] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২৩০

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি...

হজরত মুয়াবিয়া রা. থেকে প্রায় সব হাদিস এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।[৫৬২]

মূলত আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয়েই আল্লাহর রাসুল থেকে হাদিস বর্ণনায় তিনি এই সতর্কতা অবলম্বন করতেন, যাতে অসতর্কতামূলক কোনো বর্ণনা প্রচার না হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, 'আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে আমার মতো নৈকট্য থাকা সত্ত্বেও আমার চেয়ে কম সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করে এমন আর কেউ নেই'।[৫৬৩]

এ কারণেই ইলমি মহলে বলা হতো, হজরত মুয়াবিয়া রা. অনেক কম হাদিস বর্ণনা করতেন।[৫৬৪]

বানোয়াট বর্ণনার গতিরোধ এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

সেই যুগে ষড়যন্ত্রকারী চক্রের সদস্যরা এবং অজ্ঞ বক্তারা মনগড়া হাদিস প্রচার করতে শুরু করেছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের শাসন করেন। কখনো এমন কোনো বর্ণনা শুনলে তিনি খুব কঠিনভাবে দমন করতেন। মিথ্যা হাদিস প্রচারের নিন্দা করে তিনি আল্লাহর নবীর এ হাদিস শোনাতেন, 'যে ব্যক্তি জেনে-শুনে আমার দিকে মিথ্যা বিষয়ের সম্বন্ধ করে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়'।[৫৬৫]

মিথ্যা বর্ণনা চেনার মাপকাঠি

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর নিকট কোনো বর্ণনা মনগড়া হওয়ার লক্ষণ এই ছিল যে, হয়তো সেটি কুরআনের আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থি হবে

---

[৫৬২] দ্রষ্টব্য : 'মুসনাদে আহমাদ বিন হামবল' কিতাবে হজরত মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা. এর বর্ণনাসমূহ। ১৬৮৬৮ থেকে ১৬৯৪০ পর্যন্ত বর্ণনাসমূহ।

[৫৬৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৭২৩২, বাবু ফজলিল ইজতিমা আলা তিলাওয়াতিল কুরআন।

[৫৬৪]

كان معاوية قلما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (مسند ابى داؤد طيالسى، ح: ١٠٤٧)

[৫৬৫] শরহু মুশকিলিল আসার, হাদিস : ৩৯৫; আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ১৯/৩৯২

অথবা সহিহ সনদে বর্ণিত হবে না, অথবা তার দ্বারা নফসকে সন্তুষ্ট করার চাহিদার সমর্থন হবে।

এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একবার তিনি বলেন, 'আমি শুনেছি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কিছু হাদিস শোনায়, যা আল্লাহর কিতাবেও নেই, আল্লাহর রাসুল থেকেও বর্ণিত নেই। আসলে এটা তোমাদের অজ্ঞ ও মুর্খদের কাজ। সুতরাং তাদের থেকে সাবধান থাকো এবং ওইসব চাহিদা থেকেও বেঁচে থাকো, যা মানুষকে পথভ্রষ্ট করেই ছাড়ে।[৫৬৬]

বানোয়াট বর্ণনাকারী ও অজ্ঞ বক্তাদের ব্যাপারে সরকারি পদক্ষেপ

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর একটি বিরাট অবদান এই ছিল যে, তিনি বানোয়াট বর্ণনাকারীদের পথ বন্ধ করার জন্য অজ্ঞ বক্তাদের বিরুদ্ধে আইন জারি করেছিলেন। তার যুগে সরকারি অনুমোদন বা অনুমতি অর্জন করা ছাড়া কারো জন্য সাধারণ মানুষের মজলিসে কিছু বর্ণনা করা, কিংবা ঘটনা শোনানোর অনুমতি ছিল না। কেননা এভাবে অজ্ঞ লোকেরা সব ধরনের বর্ণনা প্রচার করে দিত।

একবার হজের সময় হজরত মুয়াবিয়া রা. জানতে পারলেন যে, মক্কায় বনু মাখযুমের জনৈক আজাদকৃত গোলাম মানুষকে কিচ্ছা ও ঘটনা শুনিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে?

সে বলল, না।

তিনি বললেন, তা হলে অনুমতি ছাড়া তুমি এ কাজ করছ কেন?

সে বলল, আমরা তো সেই ইলম প্রচার করি, যা আল্লাহ দান করেছেন।

তিনি বললেন, আমি যদি তোমার মজলিসে এসে পড়তাম, তা হলে তোমার জিহ্বা কেটে ফেলতাম।[৫৬৭]

---

[৫৬৬] সহিহ বুখারী, হাদিস : ৭১৩৯, কিতাবুল আহকাম, বাবুল উমারা' মিন কুরাইশ।
[৫৬৭] আনসাবুল আশরাফ : ৫/৪৫,

'শুধু ভেতর ভালো হলেই চলে' এই ভুল ধারণার অপনোদন

তৎকালীন সময়ে কিছু ভ্রান্ত দল গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দ্বারা প্রভাবিত কিছু লোক এ চিন্তা লালন করত যে, মানুষের বাহ্যিক অবস্থা শরিয়ত অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক নয়। শুধু অন্তর পরিষ্কার হলেই চলে।

এ ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে হজরত মুয়াবিয়া রা. একবার বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসুলকে বলতে শুনেছি, তোমাদের আমলের উদাহরণ হলো পাত্রের ন্যায়। পাত্রের উপরিভাগ ভালো হলে নিচের অংশও ভালো হবে। আর উপরিভাগ যদি নষ্ট হয়, তা হলে নিচের অংশও নষ্ট হবে।[৫৬৮]

একথার অর্থ এই ছিল যে, জাহের ও বাতেন তথা ভিতর ও বাহির দুটোই সংশোধন করতে হবে এবং শরিয়তের অনুগামী বানাতে হবে।

আলেম, শিক্ষার্থী ও মুয়াজ্জিনদের মনোবল বৃদ্ধি

হজরত মুয়াবিয়া রা. যদি মানুষকে ইলম শেখার জন্য কিংবা জিকিরের মজলিসের জন্য মসজিদে গমন করতে দেখতেন, তা হলে খুব খুশি হতেন। তিনি এতে অংশগ্রহণকারী লোকদের মনোবল বৃদ্ধি করতেন।

একবার একটি জিকিরের মজলিসে গিয়ে হজরত মুয়াবিয়া কসম দিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি তোমরা শুধু জিকিরের জন্য বসেছ?

তারা বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসুলও এভাবে একটি জিকিরের মজলিসে গিয়েছিলেন এবং কসম দিয়ে তাদেরকে এ কথাই জিজ্ঞেস করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করছেন'।[৫৬৯]

এ ছাড়া প্রায় প্রতি জুমাতেই তিনি ইলম অন্বেষণকারীদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য এ হাদিস শোনাতেন, 'আল্লাহ যখন কোনো বান্দার

---

[৫৬৮] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৮৯৯

[৫৬৯] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৭২৩২, অধ্যায়: ফাজলিল ইজতিমা আলা তিলাওয়াতিল কুরআন।

ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন'।[৫৭০]

হজরত মুয়াবিয়া রা. পাশাপাশি মুয়াজ্জিনদের ব্যাপারেও বেশ গুরুত্বারোপ করতেন। অথচ প্রায়ই এদের সম্মান ও মর্যাদা এবং গুরুত্বকে উপেক্ষা করা হয়। হজরত মুয়াবিয়া তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে এ হাদিস শোনাতেন,

ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامة

নিশ্চয় কেয়ামতের দিন সবচেয়ে দীর্ঘ গ্রীবার অধিকারী হবেন মুয়াজ্জিনগণ।[৫৭১]

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, আখেরাতের ভাবনা ও নবীপ্রেম

দুনিয়ার সাজসজ্জা ও স্বপ্নবিলাসিতার প্রতি হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কোনো আগ্রহ ছিল না। তার অন্তর সর্বদা পরকালের ভাবনায় মুহ্যমান থাকত। প্রায় তিনি আখেরাত সম্পর্কে আল্লাহর নবীর হাদিস স্মরণ করতেন এবং আশপাশের লোকদেরকে শোনাতেন।

একবার বললেন, 'আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি, দুনিয়াতে এখন পরীক্ষা ও ফেতনা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই'।[৫৭২]

আরেকবার খুতবা প্রদানের জন্য মিম্বারে আরোহণ করলেন। তারপর মানুষের চেহারার দিকে ফিরে ইসতিগফার পড়লেন এবং কান্না শুরু করলেন। তারপর বললেন, চেহারা তো অনেক, কিন্তু পরিচিত মুখ খুব কম দেখছি। মানুষ একে অপরের সমকালীন হয়ে থাকে। আর মানুষের মৃত্যুর লক্ষণ হলো, তার সমকালীন লোকদের বিদায় হয়ে যাওয়া। সিফফিনের যুদ্ধে আল্লাহর নবীর অনেক সাহাবি আমার সাথে ছিলেন। আজ পৃথিবীর বুকে তাদের মতো কেউ নেই'।

---

[৫৭০] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৮৮৮, ১৬৮৪৬, শরহু মুশকিলিল আসার, হাদিস : ১৬৮৩, আল মু'জামুল কাবির, কৃত: তাবারানি : ১৯/৩২১,

[৫৭১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ২৩৪১, আস সুনানুল কুবরা কৃত: বাইহাকি, হাদিস : ২০৩৬,

[৫৭২] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৮৯৯

এ কথা বলে মিম্বার থেকে নেমে আসেন। এর কিছুদিন পরই তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যান।[৫৭৩]

আল্লাহর নবীর প্রতি তার ভক্তি ও ভালোবাসা এত অধিক ছিল যে, যখন তার বয়স ৬৩ বছর হলো, তখন তিনি আশা করতে লাগলেন, এ বয়সেই যেন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, যাতে সাধ্যের ঊর্ধ্বের এ সুন্নাতের উপরও তার আমল হয়ে যায়।[৫৭৪]

স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে হজরত মুয়াবিয়া রা.

কোনো কোনো অভিযোগকারী বলে থাকে, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর যুগে বাকস্বাধীনতার উপর তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মানুষের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মতপ্রকাশের কোনোরকম স্বাধীনতা ছিল না।

এ অভিযোগ আসলে এতটাই অসাড় যে, হজরত মুয়াবিয়ার চরম বিরোধীরাও এর সঙ্গে একমত হবে না। হজরত মুয়াবিয়ার নম্র আচরণ, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও ধৈর্য এমনই জনশ্রুত ছিল যে, সাধারণ ইতিহাসরচিয়তা তো দূরের কথা, বিরোধী ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনা তুলে ধরা হলো :

- একবার জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হজরত মুয়াবিয়া রা. কে গালমন্দ করতে থাকল। হজরত মুয়াবিয়া কোনো কথা বললেন না।

  লোকেরা বলল, এই লোকের আচরণেও আপনি ধৈর্যের পরিচয় দেবেন?

---

[৫৭৩]

كثرت الوجوه وقلت المعارف، وانما الناس قرون، ومن فناء المرء فناء قرنه، لقد شهد معى صفين عدة من اصحاب محمد ﷺ ما اصبح على وجه الارض مثل عدتهم. (الآحاد والمثانى، عن عبادة بن نسى، رقم الرواية: ٥٠٠) اسناده منقطع لان عبادة بن نسى مات سنة ثمانى عشرة (ومائة) وهو شاب. (اكمال تهذيب الكمال للمغلطائى: ١٩٣/٧، ط الفارةوق الحديثة) قال الحافظ الذهبى: اظن رواياته عن الكبار منقطعة. (الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة: ٥٣٣،٥٣٤/١)

[৫৭৪] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৯১৯

তিনি বললেন, আমি মানুষ ও তাদের জিহ্বার মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরায় হতে চাই না, যতক্ষণ তারা আমাদের শাসনক্ষমতার মধ্যে অন্তরায় না হবে'।[৫৭৫] (অর্থাৎ বিদ্রোহ না করবে।)

- আরেকবার এক লোক তাকে চরমভাবে গালাগালি করল। কিন্তু তিনি কোনো উত্তরই দিলেন না। উপস্থিত লোকেরা পরে বলল, আপনি যদি কিছু বলে দিতেন, তা হলে ভালো হতো।

  তিনি বললেন, আমি আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জাবোধ করি যে, আমার প্রজাদের কারো ভুলের চেয়ে আমার সহনশীলতা কম হবে।[৫৭৬]

- সাধারণ মানুষের মনোতুষ্টি ও প্রশান্তি লাভের বিষয়টির প্রতি হজরত মুয়াবিয়া সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। ফলে ওইসব লোককে বন্ধু ও নৈকট্যশীল বানিয়ে নিতেন, যারা সাধারণ মানুষের নিকট স্বীকৃত ও প্রিয় হতো। একবার কেউ একজন প্রশ্ন করল, আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কারা?

  তিনি বললেন, যাদেরকে সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।[৫৭৭]

- অনেক সময় হজরত মুয়াবিয়া মানুষের কটু কথা ও দুর্ব্যবহারের উত্তর দিয়ে দিতেন। কিন্তু সেটাও হতো সহনশীলতা, গাম্ভীর্য ও কল্যাণকামিতার উৎকৃষ্ট নমুনা। একবার আবু জুহাম নামক জনৈক ব্যক্তি তাকে কঠোর ভাষায় কথা বলতে লাগল। হজরত মুয়াবিয়া অবনত মস্তকে চুপচাপ শুনতে লাগলেন। যখন লোকটি তার মনের সব ক্ষেদ ঝেড়ে ফেলল, তখন তিনি বললেন, 'শোনো, শাসকদের থেকে সাবধান থাকবে। কারণ, তাদের ক্রোধ শিশুদের ক্রোধের মতো এবং তাদের আক্রমণ কিন্তু সিংহের মতো'।

  তারপর লোকটিকে অনেক উপহার-উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করে দেন।[৫৭৮]

---

[৫৭৫] আওনুল আখয়ার, কৃত: ইবনে কুতাইবা আদ্দীনাওয়ারি : ১/৬৩, আল কামিল ফিত তারিখ : ৩/১২৬, হিজরি : ৬০

[৫৭৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৩৫, মুয়াবিয়া রা. এর জীবনী।

[৫৭৭] তারিখুত তাবারি : ৫/৩৩৫, আল কামিল ফিত তারিখ, হিজরি : ৬০

- হজরত মুয়াবিয়া রা. একদিকে যেমন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সততা ও সত্যবাদিতার জন্য মানুষের মনোবল বৃদ্ধি করতেন, অন্যদিকে তোষামোদ ও চাটুকারিতা থেকেও নিষেধ করতেন। একবার মারওয়ান বিন হাকামের ভাই আবদুর রহমান বিন হাকামকে কবিতা আবৃত্তিতে নিমগ্ন দেখে বললেন, 'কাব্যচর্চা থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা এটা নির্লজ্জ লোকদের কাজ'।[৫৭৯]

এই বর্ণনা একটি শক্তিশালী সাক্ষী যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. তোষামোদ ও চাটুকারিতা ঘৃণা করতেন। তিনি মতপ্রকাশের পক্ষে মানুষের মনোবল বৃদ্ধি করতেন। অথচ কেউ কেউ মনে করে, তার যুগে সাধারণ মানুষের টুটি চেপে রাখা হতো। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তার যুগে বরং সর্বত্র নীতি-নৈতিকতা, ক্ষমা-উদারতা এবং দয়া ও নম্রতার পরিবেশ বিরাজমান ছিল। স্বয়ং বড় বড় সাহাবি একথার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেন যে, রাজনীতিতে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ক্ষমা ও উদারতা এবং অবকাশ ও ছাড়ের বিষয়টি ছিল সর্বজনস্বীকৃত। এর একটি বড় কারণ বর্ণনা করেছিলেন বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবু দারদা রা.।[৫৮০]

---

[৫৭৮] তারিখে দিমাশক : ৫৯/১৮২, আল মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, কৃতঃ আবু বাকর আহমাদ আদ্দীনাওয়ারি : ৪/৪০৮,

[৫৭৯] তারিখে দিমাশক : ৩৪/৩১৫, আল কামিল ফিত তারিখ, হিজরি : ৬০

[৫৮০] হজরত আবু দারদা রা. হজরত মুয়াবিয়া রা. এর খেলাফতকাল দেখার সুযোগ পাননি। কেননা হজরত মুয়াবিয়া যখন শামের গভর্নর ছিলেন, তখন তার ইনতেকাল হয়ে যায়। সুতরাং তার এ অভিব্যক্তি হরজত মুয়াবিয়া রা. শামের গভর্নর থাকাকালের। তবে হজরত মুয়াবিয়ার খেলাফতকালও এ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত ছিল না।

নোট : এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, হজরত আবু দারদা থেকে বর্ণিত উক্ত হাদিসের অর্থ এই নয় যে, শাসকগণ জনগণের অবস্থার খোঁজ-খবর রাখবেন না এবং শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকেও উদাসীন থাকবেন। বরং হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, একেবারে উদাসীনও থাকা যাবে না, আবার প্রত্যেকের পেছনে গোয়েন্দার মতোও লেগে থাকা যাবে না। ছোট-খাটো ভুল ক্ষমা করে দিতে হবে। তবে যারা দেশ, জাতি ও ইসলামের দুশমন, তাদের ব্যাপারে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। এ নিয়ম যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্যই কার্যকর। হজরত মুয়াবিয়া রা. এর যুগেও সাধারণ মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া হতো এবং তাদের সাথে নম্র আচরণ করা হতো। কিন্তু শত্রুদের ক্ষেত্রে রাখা হতো অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি।

হজরত মুয়াবিয়া রা. যখন গভর্নর হয়েছিলেন, তখন হজরত আবু দারদা রা. তাকে একটি হাদিস শুনিয়েছিলেন। হজরত মুয়াবিয়া রা. সে হাদিসের উপর আমল করে বেশ উপকৃত হয়েছিলেন এবং গভর্নর হিসেবে সফল হয়েছিলেন।

তখন হজরত আবু দারদা রা. বলেছিলেন, মুয়াবিয়াকে একটি বাক্য বেশ উপকৃত করেছে, যেটি আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছিলাম। বাক্যটি হলো, 'মানুষের গোপন বিষয় খুঁজতে যেয়ো না, তা হলে তোমরা তাদেরকে বিগড়ে ফেলবে'।[৫৮১]

মূলত হজরত মুয়াবিয়া রা. এভাবেই বিশিষ্ট সাহাবিদের উপদেশ শুনে শুনে আমল করতেন। একবার হজরত আয়েশা রা. কে চিঠি লিখে উপদেশ গ্রহণের জন্য হাদিস জানতে চাইলেন। হজরত আয়েশা উত্তরে লিখলেন, 'আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কাজ করে, তার প্রশংসাকারীরাও তার দোষত্রুটি অন্বেষণকারী হয়ে যায়'।[৫৮২]

ইতিহাসের সংস্কারক এবং সমাজবিজ্ঞানের প্রণেতা ইবনে খালদুন রহ. হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সহনশীলতা সম্পর্কে লিখেছেন, 'হজরত মুয়াবিয়া রা. আরব-নেতৃবর্গ এবং দুষ্কৃতিকারী গোত্রগুলোর সাথে ক্ষমাসুন্দর আচরণ করতেন। কষ্টদায়ক বিষয় ও অসহনীয় কথাও সয়ে নিতেন এবং ধৈর্যধারণ করতেন। সত্যিই তিনি ধৈর্যশীলতার এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, যেখানে অন্য কেউ পৌঁছতে সক্ষম হয়নি।[৫৮৩]

শিয়া মতাবলম্বী ইতিহাসবিদ মাসউদির নিম্নোক্ত বক্তব্যও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পর আবদুল মালিক বিন মারওয়ান এবং তার মতো আরো অনেকে চেয়েছিল হজরত মুয়াবিয়া রা. এর উন্নত চরিত্র-মাধুর্য অনুকরণ করবে। কিন্তু তার মতো

৫৮১

كلمة نفع الله بها معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفتشوا الناس فتفسدوهم. (المعجم الكبير للطبراني: ٣١١/١٩)

৫৮২ ইবনে আবী খাইসামাহ কৃত তারিখ থেকে 'মক্কাবাসীর ঘটনাবলী', পৃষ্ঠা : ৩৯৭

৫৮৩ তারিখে ইবনে খালদুন : ৩/৫

সহনশীলতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি, মানুষকে তাদের মর্যাদা অনুসারে সম্মানপ্রদর্শন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে তার অবস্থা অনুযায়ী দয়ার আচরণ করতে কেউ সক্ষম হয়নি'।[৫৮৪]

অপর এক শিয়া ইতিহাসবিদ ইয়াকুবি বলেন, 'হজরত মুয়াবিয়া রা. বলতেন, যেখানে আমার চাবুক কাজ করে, সেখানে আমি তরবারি ব্যবহার করি না। যেখানে মুখের কথায় কাজ হয়, সেখানে আমি চাবুক উত্তোলন করি না। যদি একটি চুল দিয়েও মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্কের বন্ধন থাকে, আমি তা-ও ছিন্ন হতে দেব না।

জিজ্ঞাসা করা হলো, সেটা কীভাবে?

তিনি বললেন, তারা যখন টেনে ধরবে, আমি তখন ঢিল দেব। আবার তারা যখন ঢিল দেবে, আমি তখন টেনে ধরব।[৫৮৫]

এ সকল বর্ণনা থেকে জানা গেল, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

---

[৫৮৪] মুরুয যাহাব : ৩/২২২,

[৫৮৫] তারিখে ইয়াকুবি, পৃষ্ঠা : ২০৪

মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলের প্রকৃত রূপরেখা

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলের যে তথ্যচিত্র নির্ভরযোগ্য বর্ণনার আলোকে এ যাবৎ আমরা উল্লেখ করে এলাম, তার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তার শাসনের যুগটিও শরিয়তের অনুসরণ, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, জাতির প্রতি সহমর্মিতা, খোদাভীতি, মানুষের অধিকার রক্ষা এবং দেশ ও জাতির জন্য অতন্দ্র প্রহরা গুণে গুণান্বিত। এ হিসেবে নিশ্চয় তার শাসনামল আমাদের জন্য ঈর্ষণীয় ও অনুসরণীয়। একইভাবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে, খোলাফায়ে রাশেদিনের ত্রিশ বছর শেষ হয়ে যখনই হজরত মুয়াবিয়ার শাসনামল শুরু হয়েছে, তখনই আচমকা ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম, সৎকাজের পরিবর্তে পাপাচার, পরোপকারের স্থলে স্বার্থপরতা এবং সহমর্মিতার স্থলে স্বজনপ্রীতি স্থান করে নিয়েছিল।

তবে একথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তার শাসনামলটি সর্বদিক থেকে খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগের মতোই ছিল এবং তার যুগেও কল্যাণ ও বরকত, পরোপকার ও আত্মত্যাগ, সরলতা ও অল্পতুষ্টির গুণাবলি সেই মাপকাঠিতেই ছিল, যা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ও উমর রা. এর যুগে ছিল। বরং বাস্তব সত্য হলো, যুগের পরিবর্তন, অবস্থার তারতম্য, মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, নতুন নতুন মুসলিম জনপদের সংখ্যাধিক্য, বিশিষ্ট সাহাবিদের অন্তর্ধান, সর্বোপরি নবুওয়াতের যুগ থেকে দূরত্বসহ বহু কারণে মুসলিমসমাজ যেমন আগের মতো ছিল না, তেমনি শাসনব্যবস্থাও সেরকম ছিল না।

তবে এ পরিবর্তন ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সৃষ্টিগত। কেননা হজরত মুয়াবিয়ার যুগে পূর্বের যুগের মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ছিল না। তাই পূর্বের যুগের কল্যাণ ও বরকতের আশা করারও সুযোগ ছিল না। সুতরাং দুই যুগের মধ্যকার এ পার্থক্য মেনে নেওয়া ছাড়াও উপায় ছিল না। বরং পরবর্তী যুগের মানুষের জন্য হজরত মুয়াবিয়ার যুগটিও ছিল ঈর্ষণীয় এবং সেটি অর্জন করাও ছিল দুষ্কর।

একথা সত্য যে, হজরত আবু বকর ও উমর রা. এর যুগের তাকওয়া ও খোদাভীতি এবং বিশ্বস্ততা ও সতর্কতার পরিবেশ যারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাদের দৃষ্টিতে হজরত মুয়াবিয়ার যুগটি অবশ্যই নিম্ন পর্যায়ের মনে হয়েছিল। অনেক সময় তারা এ অধঃপতনের কারণে ক্ষোভও প্রকাশ করতেন। তবু সত্য এই যে, যা কিছু পরিবর্তন হয়েছিল, তা ছিল যুগের স্বাভাবিক চাহিদা। আর সবচেয়ে বড় কথা, তা শরিয়তের বৈধতার সীমার মধ্যেই ছিল।

বিবর্তনের বড় কারণ

আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে পরিবর্তনের একটি বড় কারণ এই ছিল যে, হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের পরপরই যে ফেতনার সূত্রপাত ঘটেছিল, তার দ্বারা দেশের রাজনীতি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। এমনকি আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির অঙ্গনেও অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছিল এবং মুসলমানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও হয়েছিল।

হজরত মুয়াবিয়া রা. উক্ত অস্থিতিশীলতা দূর করার জন্য যা কিছু করেছেন, আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তার কারণ- হজরত মুয়াবিয়া মনে করতেন, সাধারণ উপায়ে এ অবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি উম্মাহর সাধারণ ও শুরাভিত্তিক রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে যে অস্বাভাবিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তার কারণ ও প্রেক্ষাপট বোধ করি কিছুটা এমনই ছিল।

বর্তমান পৃথিবীতেও আমরা দেখতে পাই যে, কোনো গণতান্ত্রিক দেশে যখন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়, তখন কোনো সামরিক নেতা এসে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয় এবং 'মার্শল ল' চালু করে দেয়। তারপর কয়েক বছরের জন্য দেশে চালু হয় জরুরি অবস্থা। বহু মানুষের অধিকার ধ্বংস হয়। তবু পৃথিবীর বড় বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বহুবার এমন ঘটেছে এবং অধিকাংশ মানুষ মার্শাল ল পছন্দ না করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য তাকে মেনে নিয়েছে।

তা ছাড়া অনেক সময় অবস্থাও এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, দেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মার্শাল ল চালু করা ছাড়া কোনো উপায়ও থাকে না। হজরত আলি ও হজরত হাসানের যুগে অবস্থা আসলেই এমন ছিল কি না, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. পরিস্থিতি তেমনই মনে করেছিলেন। তিনি

যে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তার পেছনে আসলে দেশ ও জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ইতিবাচক চিন্তাই কার্যকর ছিল।

তদুপরি হজরত মুয়াবিয়া রা. ক্ষমতায় এসেছিলেন হজরত হাসানের সঙ্গে সুচিন্তিত চুক্তি ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে। সুতরাং তিনি বৈধ শাসকই ছিলেন। তার শাসন কখনোই একনায়কতান্ত্রিক শাসন ছিল না। অতএব, নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং পূর্বের খলিফাদের উত্তম গুণাবলি যথাসাধ্য তিনি অনুসরণ করেছিলেন।

মুয়াবিয়া রা. র শাসনামলকে খেলাফতে রাশেদার মধ্যে গণ্য করা হয় না কেন?

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এতসব ভালো দিক থাকা সত্ত্বেও হজরত মুয়াবিয়ার শাসনামলকে খেলাফতে রাশেদা বলা হয় না কেন? আসলে এর চারটি কারণ আছে। যথা :

১. 'খেলাফতে রাশেদা' আসলে একটি পরিভাষা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোত্তম প্রতিনিধিত্ব, যা বাস্তবায়ন করেছিলেন আল্লাহর নবীর সবচেয়ে নিকটতম মুহাজির সাহাবিগণ। প্রথম চার খলিফাই ছিলেন প্রথমসারির মুহাজির সাহাবি। তাই তাদের যুগকে 'খেলাফতে রাশেদা' বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে হজরত মুয়াবিয়া রা. এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাই তার শাসনামলকে 'খেলাফতে রাশেদা' বলা যায় না।

২. হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ক্ষমতাগ্রহণের বিষয়টি খেলাফতে রাশেদার যুগে অনুসৃত ক্ষমতা বদলের নিয়মে ছিল না। কেননা খোলাফায়ে রাশেদিন তাদের আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশিষ্টজনের ঐকমত্যের ভিত্তিতে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে হজরত মুয়াবিয়া রা. শাসক হয়েছিলেন নিজ চেষ্টা ও আগ্রহের মাধ্যমে। উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একমত হওয়ার আগেই তিনি এর জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

তবে একথা সত্য যে, এ চেষ্টা ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য অবশ্যই সৎ ছিল ও উম্মাহর কল্যাণকামনাই ছিল। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের এ পার্থক্য তার যুগটিকে খেলাফতে রাশেদা থেকে পৃথক করে দেয়। ইবনে খালদুন রহ. এ মৌলিক পার্থক্যটি এভাবে স্পষ্ট করেছেন যে,

'হজরত মুয়াবিয়া রা. এর হাতে ক্ষমতা এসেছিল নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার মাধ্যমে। আর এর কারণ ছিল তার যুগে সৃষ্ট বিভেদ ও দলাদলি। যেমনটি ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি। অথচ তার আগে খেলাফত গ্রহণ করা হতো সকলের সন্তুষ্টি ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে। এ কারণে আলেমগণ উভয় যুগের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন। হজরত মুয়াবিয়াই ছিলেন নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের চেষ্টা ও দলাদলির ভিত্তিতে নিযুক্ত প্রথম খলিফা।[৫৮৬]

৩. প্রথম চার খলিফা তাদের সন্তানদের জন্য স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নিয়ম চালু করেননি। হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সূচনা করেছিলেন। এ উদ্যোগটি যদিও জায়েজ ছিল, তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্বের উত্তম নমুনা ছিল না। বরং এটা ছিল রাজা-বাদশাহদের রীতি।

৪. এ ছাড়া আরেকটি কারণ হলো, সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

خلافة النبوة ثلاثون سنة

নবুতওয়াতের প্রতিনিধিত্বকারী খেলাফত হবে ত্রিশ বছর।[৫৮৭]

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ত্রিশ বছরের পরের শাসন হবে ভিন্ন অবস্থান ও মানদণ্ডের।

'খেলাফতে রাশেদা' পরিভাষাটি চার খলিফা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার এই ছিল গুরুত্বপূর্ণ চার কারণ। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, খেলাফতে রাশেদা একটি পরিভাষা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, খেলাফতে রাশেদার যুগটি ছাড়া অন্যান্য সব খেলাফত বা সব শাসনব্যবস্থা ভ্রষ্ট ও বিপথগামী। বরং আভিধানিক অর্থে যেকোনো ন্যায়পরায়ণ শাসককে 'রাশেদ' এবং তার শাসনামলকে 'খেলাফতে রাশেদা' বলে অভিহিত করা যায়।

---

[৫৮৬] ان الخلافة لعهده كانت مغالبة لاجل ما قدمناه من العصبية التى حدثت لعصره، اما قبل ذلك اختيارا واجتماعا. فميزوا بين الحالتين. فكان معاوية اول خلفاء المغالبة والعصبية. (تاريخ ابن خلدون: ٢/٦٥٠)

[৫৮৭] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস, হাদিস : ৪৬৪৬ কিতাবুস সুন্নাহ, বাবুন ফিল খিলাফাহ, সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ২২২৬, অধ্যায়: খিলাফাহ, সনদ হাসান।

কিন্তু উম্মাহর অধিকাংশ আলেমের নিকট খেলাফতে রাশেদা পরিভাষাটি যেহেতু একটি ভিন্ন আকিদা হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে, ফলে এতে পরিবর্তনের চেষ্টা করলে উম্মাহর মধ্যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই এমন কোনো চেষ্টাকে বৈধ বলা যায় না।

খেলাফতে রাশেদা ও খেলাফতে মুয়াবিয়ার মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে বিশিষ্ট আলেমদের বক্তব্য

- ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. খেলাফতে রাশেদা এবং খেলাফতে মুয়াবিয়ার মধ্যকার পার্থক্যটি এভাবে তুলে ধরেছেন, 'হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলকে যদি তার পরবর্তী যেকোনো সময়ের সাথে তুলনা করা হয়, তা হলে দেখা যাবে, হজরত মুয়াবিয়ার চেয়ে উত্তম কোনো শাসক যেমন কেউ ছিল না, তেমনি তার যুগের চেয়ে উত্তম কোনো যুগও সাধারণ মানুষ দেখতে পায়নি। কিন্তু যদি তার যুগকে তার পূর্ববর্তী খলিফা হজরত আবু বকর ও উমর রা. র যুগের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তা হলে অবশ্যই দুটির মধ্যে উত্তম-অনুত্তমের পার্থক্য ফুটে উঠবে।'[৫৮৮]

- আল্লামা আবদুল আজিজ ফারহারি মুলতানি রহ. হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলের স্বরূপ এভাবে তুলে ধরেছেন, 'পুণ্যবানদের মর্যাদা ও স্তর বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাদের একেকজন মর্যাদার ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় উচ্চস্তরের অধিকারী হয়ে থাকেন। প্রতিটি স্তরই উপরের স্তরের হিসেবে প্রশ্নবিদ্ধ ও অভিযুক্ত মনে হয়। এ কারণেই প্রবাদ আছে, 'সৎলোকদের সৎকর্ম, নৈকট্যশীলদের জন্য মন্দকর্ম'।

  এর আরেকটি উদাহরণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমি প্রতিদিন ৭০ বার ইসতিগফার পাঠ করি'। নবীজির এ বাণীর ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মনীষী বলেছেন, এর কারণ, প্রতিমুহূর্তে নবীজির স্তর উপরের দিকে উঠতে থাকত। আর নবীজি যখনই কোনো উপরের স্তরের মর্যাদা লাভ করতেন, তখন (আগের স্তরটিকে মনে হতো অনেক নিম্ন ও ত্রুটিপূর্ণ। তাই তিনি) পূর্বের স্তরের জন্য ইসতিগফার করতেন।

---

[৫৮৮] মিনহাজুস সুন্নাহ : ৬/২৩২

সুতরাং মর্যাদাগত তারতম্যের এই ব্যাপারটি যখন আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন আমরা বলতে পারি, খোলাফায়ে রাশেদিন বৈধ বিষয়েও অবকাশ ও প্রশস্ততা গ্রহণ করেননি। তাই তাদের জীবনাদর্শ সংকীর্ণতা ও আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে নবীজির জীবনের সঙ্গে খুব বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।

আর হজরত মুয়াবিয়া রা. যদিও কোনো পাপে লিপ্ত হননি, তবে বৈধ বিষয়ের মধ্যে অবকাশ ও প্রশস্ততা গ্রহণ করেছেন। খেলাফতের হক ও অধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে তিনি খোলাফায়ে রাশেদিনের স্তরে ছিলেন না। তবে তাদের সমতুল্য হতে না পারা হজরত মুয়াবিয়ার উপর আপত্তির কারণ হতে পারে না।[৫৮৯]

- মুফতি তাকি উসমানি অত্যন্ত সমৃদ্ধভাবে এ প্রসঙ্গটির সারাংশ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'খেলাফতে রাশেদা ও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলের মাঝে প্রকৃতিগত পার্থক্য অবশ্যই ছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসন সেই মানের ছিল না, যে মান ছিল খোলাফায়ে রাশেদিনের। কিন্তু উম্মাহর অধিকাংশ আলেমের মতে সে পার্থক্য এত বিশাল বা ভয়ঙ্কর ছিল না যে, একদিকে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা এবং তাকওয়া ও ধর্মভীরুতা, অন্যদিকে অনাচার-পাপাচার এবং জুলুম-অবিচার। বরং সে পার্থক্য ছিল শরিয়তের আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে কঠোরতা ও উদারতার, তাকওয়ার চূড়ান্ত সীমা ও বৈধতার প্রান্ত সীমার এবং নির্ভুল ইজতিহাদ ও অপেক্ষাকৃত ভুল ইজতিহাদের'।[৫৯০]

  অন্যত্র তিনি লিখেছেন, 'খোলাফায়ে রাশেদিনের পবিত্র যুগে সতর্কতা, দায়িত্ব-সচেতনতা ও আল্লাহভীতির যে কঠোর মানদণ্ড সমুন্নত ছিল, পরে তা সর্বাংশে অক্ষুণ্ন থাকেনি। খোলাফায়ে রাশেদিন শরিয়তি বিধানের 'আযিমত' তথা চূড়ান্ত স্তর অনুসরণ করতেন। পক্ষান্তরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হজরত মুয়াবিয়া রা. 'রুখসত' তথা উদার বৈধতার উপর আমল করতেন। খোলাফায়ে রাশেদিন ব্যক্তি ও

---

[৫৮৯] আন নিবরাস আলা শারহিল আকায়েদ, কৃত: ফারহারি, পৃষ্ঠা : ৫১০,

[৫৯০] হজরত মুয়াবিয়া রা. আওর তারিখি হাকায়েক, পৃষ্ঠা : ১৪৯, ১৫০

পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে কঠোরতম সতর্কতার দিক বিবেচনা করতেন। পক্ষান্তরে কোনো কোনো বিষয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. বৈধতার গণ্ডিতে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন বোধ করতেন না। যেমন, খোলাফায়ে রাশেদিন আযিমত তথা নিরঙ্কুশ সতর্কতার দিক বিবেচনা করে পূর্ণ যোগ্যতা সত্ত্বেও আপন পুত্রদের মনোনয়নদানে সম্মত হননি, অথচ শরিয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ ছিল। পক্ষান্তরে হজরত মুয়াবিয়া রা. সে বৈধতার পথ ধরে পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়ন দিয়েছিলেন।

খোলাফায়ে রাশেদিন আযিমত তথা কঠোরতম সতর্কতার উপর আমল করে অকল্পনীয় অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা অনুসরণ করতেন। পক্ষান্তরে হজরত মুয়াবিয়া রুখসত ও বৈধতার উপর আমল করেছেন এবং নিজের জীবনে খোলাফায়ে রাশেদিনের তুলনায় কিঞ্চিৎ স্বাচ্ছন্দ্যের পরশ বুলিয়েছিলেন।

খোলাফায়ে রাশেদিনের দায়িত্বসচেনতা ও কোমল অনুভূতি এমন ছিল যে, দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তারা মানুষের খোঁজ নিয়ে বেড়াতেন। পক্ষান্তরে হজরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে ইতিহাস এ ধরনের কোনো ঘটনা আমাদের শোনায়নি। খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রজ্ঞা, ইজতিহাদ ও মতামত এমন সরল ও নির্ভুল ছিল যে, স্বয়ং আল্লাহর রাসুল উম্মাহকে নিজের আনুগত্যের পাশাপাশি তাদেরও অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে হজরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে উম্মাহর অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, তিনি একাধিকবার বড়ধরনের ভুল ইজতিহাদের শিকার হয়েছেন'।[৫৯১]

সারকথা এই যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামল আপন স্থানে অতি উত্তম ও প্রশংসনীয় ছিল। কিন্তু যদি খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগের সঙ্গে তার শাসনামলের তুলনা করা হয়, তা হলে নিশ্চয় তা নিম্ন পর্যায়ের ছিল, যেমনিভাবে স্বয়ং হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মর্যাদা ও স্তর তাদের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের ছিল। কিন্তু পরবর্তীদের তুলনায় তার শাসনামল ছিল অত্যন্ত উন্নত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

---

[৫৯১] হজরত মুয়াবিয়া রা. আওর তারিখি হাকায়েক, পৃষ্ঠা : ১৪৪

ইতিহাসের শিক্ষা

এক

ইসলামি রাজনীতিতে ক্ষমতার পালাবদল থেকে শুরু করে শাসন পরিচালনা পর্যন্ত এমন একটি জীবনীশক্তি কার্যকর থাকে, যা শাসকদের কর্তৃত্ব দৃঢ় করে। সেটি হচ্ছে ইসলামি বন্ধনের শক্তি। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব, শুরাভিত্তিক পরিচালনা পরিষদ, শাসক ও শাসিতের পরস্পর আস্থা এবং জনতার আদালতে শাসকশ্রেণির জবাবদিহিতা- এসব বিষয়ের উপরই গড়ে ওঠে ওই শক্তি।

ইসলাম সাধারণ মানুষকে আমিরের আনুগত্য স্বীকার করার শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু সেই সাথে ইসলামি শাসনব্যবস্থায় মানুষকে শাসকদের সম্পর্কে মতপ্রকাশের একটি ভারসাম্যপূর্ণ সুযোগ অবশ্যই প্রদান করেছে। সাধারণ জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ইসলাম কখনোই হরণ করে না। কখনো এই মতপার্থক্যের বিষয়টি দলগত বিভক্তির রূপও ধারণ করতে পারে। অর্থাৎ শাসকদের সাথে যারা একমত হতে পারে না, তারা আলাদা হয়ে একটি দল গঠন করে।

দুই

সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে মুসলমানদের মধ্যে এজাতীয় মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়া এবং কোনো ক্ষেত্রে তা রক্তপাত পর্যন্ত গড়ানো যদিও অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার কারণ; কিন্তু এর মধ্যেও আল্লাহ তায়ালার একটি বড় রহস্য স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। আর তা এই যে, এর দ্বারা মুসলমানদের পারস্পরিক মতপার্থক্য, রাজনৈতিক মতবিরোধ এবং দ্বন্দ্ব-কলহের ক্ষেত্রে অনুসরণ করার মতো একটি বাস্তব ও চারিত্রিক নীতিমালা পাওয়া গেল। এ কারণেই ইমাম আবু হানিফা রহ.

বলতেন, 'যদি হজরত আলি রা. (তার বিরোধিতাকারীদের সাথে) যুদ্ধের জন্য না জড়াতেন, তা হলে কেউ জানতে পারত না যে, এ ধরনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের কর্মপন্থা কী হওয়া উচিত'।[৫৯২]

তিন

এ সকল মতবিরোধের কারণে শুধু যে গৃহযুদ্ধের সময় বিদ্রোহীদের সাথে আচরণের নীতিমালা জানা গেছে তা-ই নয়, বরং দুজন মুসলিম শাসকের মধ্যকার বিরোধ ও দ্বন্দ্বের জন্যও একটি চারিত্রিক নীতিমালা আমাদের সম্মুখে এসে গেছে। অথচ অমুসলিম দুনিয়ায় ওই সময়ের বহু শতাব্দী পরও এমন কোনো নীতিমালার রূপরেখা পাওয়া যায়নি, যা গৃহযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি কমাতে পারে। ইদানীং এ বিষয়ে কিছু আইন প্রণয়ন করা হলেও এর প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাগজ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে।

চার

বস্তুত মতবিরোধ হচ্ছে সমাজের একটি স্বাভাবিক চাহিদা ও দাবি। ইসলাম কখনোই এর উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে না। বরং ইসলাম সব সময় মানুষের আবেগ ও অনুভূতির প্রতিটি অঙ্গনকে কিছু শর্ত ও নীতির আওতায় এনে সমাজের জন্য তাকে ইতিবাচক ও উপকারী বানিয়ে দেয়। এটাই ইসলামের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। দলগত বিভক্তিও মূলত প্রতিটি দেশ, জাতি, সমাজ ও জনপদের একটি স্বাভাবিক দাবি। যদি একে কল্যাণের উপর নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা যায়, তা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপকারী প্রমাণিত হয়। কেননা এর দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা ও পরিস্থিতির অপর পিঠও সামনে আসে এবং নিজেদের ভুলের অনুভূতি সজাগ হয়। যদি বিরোধী দল না থাকে, তা হলে শাসকদের আশপাশে কেবল চাটুকার ও পদলেহীদের ভিড় জমে ওঠে। জবাবদিহিতার কোনো সুযোগ থাকে না। এসব কারণেই

---

[৫৯২] বুগয়াতুত তলাব ফি তারিখি হালব : ১/৩০২

খোলাফায়ে রাশেদিন ইসলামি শিক্ষা অনুসারে বিরোধীদলের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছিলেন।

পাঁচ

বিভিন্ন বিরোধী দলের মোকাবেলা করার জন্য ইসলাম শাসকদের কিছু নিয়ম-নীতি বেঁধে দিয়েছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসকদের জন্য সঠিক ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দিয়েছে।

ইসলামি সমাজে বিরোধী দলের মোট ৫টি ধরন হতে পারে। যথা :

১. একটি দল হতে পারে এমন, যাতে অমুসলিমরা মুসলমাদের বেশ ধারণ করে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে মাঠে নামবে।

   এর উদাহরণ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মুনাফিকরা। এদের উৎপত্তি পরবর্তীযুগেও হতে পারে। নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, মুসলিম বেশধারী এমন কাফেররা কখন কীভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। তবে মুখে কালিমা উচ্চারণকারী একজন মানুষকে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুনাফিক আখ্যা দেওয়া যায় না।

   এজাতীয় দল যদিও অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে থাকে, তবু আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কারণ ছাড়া তাদেরকে সহ্য করে গেছেন। তবে যদি এদের কেউ প্রকাশ্যভাবে সীমালজ্ঘন করত, তা হলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হতো। সুতরাং বর্তমানেও যদি কারো থেকে অপরাধ প্রমাণিত হয়, তা হলে তাকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।

২. দ্বিতীয় প্রকারের দল এমন হতে পারে যে, দলের অধিকাংশ সদস্য হবে কালিমা স্বীকারকারী মুসলমান। কিন্তু তারা বাতিলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। নিজেদের অজ্ঞতার কারণে শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভুল ধারণার শিকার হয়ে পড়েছে।

   এর উদাহরণ, হজরত উসমান রা. এর জীবনের শেষদিনগুলোতে প্রকাশিত দলগুলো।

হজরত উসমান রা. মূলত এ ধরনের দলেরই মোকাবেলা করেছিলেন। তবে তিনি তার কর্মপন্থা দ্বারা মুসলিমবিশ্বকে এ শিক্ষা প্রদান করে গেছেন যে, এজাতীয় বিরোধী দলকে মতপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। তাদের ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। বিশেষত এমন ক্ষেত্রে, যেখানে বিরোধীদের দাবি কেবল খলিফা ও তার গভর্নরদের পদচ্যুতি অর্থাৎ আন্দোলন হবে শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে, ক্ষমতার বিরুদ্ধে নয়।

হজরত উসমান রা. দেখিয়ে গেছেন যে, এজাতীয় ক্ষেত্রে কখনোই শাসকরা আগে অস্ত্র হাতে নেবে না। যথাসম্ভব কোন্দল ও গৃহযুদ্ধ দমানোর চেষ্টা করবে। জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যদি শাসকদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তা হলে বিরোধীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শাসনব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন আনবে না। বরং তৃতীয় কোনো উপায়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে এবং বিরোধী দলকে সহ্য করে যাবে।

এ কারণেই হজরত উসমান রা. বিরোধী দলের সঙ্গে চূড়ান্ত পর্যায়ের নম্র আচরণ করেছেন। পরামর্শদানকারীদের মতামত তিনি অবশ্যই শুনেছেন; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না। কেননা এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সরকারবিরোধী আন্দোলন। সুতরাং একে যদি কঠোর হস্তে দমন করা হতো, তা হলে পরবর্তী শাসকদের জন্য বিরোধীদের উপর সব ধরনের জুলুম ও কঠোরতা করার অজুহাত তৈরি হতো।

সুতরাং হজরত উসমান রা. এর এ সহনশীলতা যথার্থই ছিল। স্বয়ং তার আশপাশের অধিকাংশ সাহাবির মত ছিল ভিন্ন। তারা তরবারির ব্যবহারকেই মনে করেছিলেন উত্তম ব্যবস্থা। সুতরাং হজরত উসমান রা. এর জীবনাদর্শকে দেখে পরবর্তী যেকোনো শাসকের জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, তিনি বিরোধীদলের সাথে নম্র আচরণ করবেন। বরং ক্ষেত্রবিশেষ কঠোর আচরণও করতে পারবেন। যেমনটি করেছেন হজরত আলি রা.। একইভাবে হজরত মুয়াবিয়া রা. তার বিপক্ষে হুজর বিন আদি রা. এর নেতৃত্বে

উদীয়মান আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করেছিলেন, যাতে হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের মতো কোনো দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

৩. বিরোধী দলের সম্ভাব্য তৃতীয় ধরনটি হলো, সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষের দল। অর্থাৎ তারা সরকার-ব্যবস্থার সংশোধন ও ইনসাফ কায়েম করার নিমিত্তে আন্দোলনে নামবেন। অন্যদিকে তাদের শাসকও জাতির প্রতি কল্যাণকামী হবেন, যার কাছে তারা দাবি জানাবেন।

এর উদাহরণ হজরত আয়েশা রা. ও হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর আন্দোলন। কেননা তারা হজরত আলি রা. এর যুগে ইনসাফের দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন।

হজরত আলি রা. সংলাপ ও সমঝোতার মাধ্যমে সেই আন্দোলন থামাতে চেয়েছিলেন। ইত্যবসরে ভুল বোঝাবুঝির কারণে হঠাৎ যুদ্ধও শুরু হয়েছিল। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই তা আবার শেষও হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের পর আলি রা. সংস্কারক ও খোদাভীরুদের সঙ্গে সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ বজায় রেখেছিলেন। পাশাপাশি আমর বিন জুরমুযের মতো সন্ত্রাসীদের কঠোর ভাষায় শাসিয়েছিলেন।

৪. চতুর্থ ধরন হলো, কোনো নেক ও পুণ্যবান এবং সহিহ আকিদার অধিকারী সেনাপতি কোনো ব্যাখ্যাসাপেক্ষে কোনো জায়েজ দাবি আদায়ের জন্য ন্যায়পরায়ণ শাসকের আনুগত্য বর্জন করে কার্যত কোনো এলাকার স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসক হয়ে বসবে।

এর উদাহরণ হজরত আলি রা. এর বিপক্ষে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মৌলিক ও ইজতিহাদি ইখতিলাফ। হজরত মুয়াবিয়া তার অনুসারীদের নিয়ে হজরত উসমান রা. এর কিসাসের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। আর হজরত আলি রা. একদিকে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে, তাদেরকে বাধ্য বানানোর চেষ্টা করে প্রমাণ করেছেন যে, শক্তির প্রয়োগও জায়েজ আছে, অন্যদিকে সংলাপ চালিয়ে গেছেন। এমনকি চূড়ান্ত লড়াই চলাকালেও সংলাপের প্রস্তাব

মেনে নিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বিরোধীদলের সেনাপতিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেননি। তাদের উপর প্রকাশ্য পাপাচারের অভিযোগ আনেননি।

৫. পঞ্চম ধরন হলো, কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে এমন কোনো দলের সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করা, যারা ভিন্ন কোনো আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিকে মানুষকে আহ্বান করবে। সাথে সাথে তারা সাধারণ মুসলমানদের রক্তও হালাল মনে করবে।

   এর উদাহরণ খারেজি সম্প্রদায়, যারা হজরত আলি রা. এর যুগে আত্মপ্রকাশ করেছিল। হজরত আলি রা. এর কর্মপন্থা আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, এমন দলকে কঠোর হাতে দমন করা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে পুরো ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে।

৬. হজরত উসমান রা. এর শাহাদাত থেকে সৃষ্ট ফেতনার যুগে সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থা আমাদের সম্মুখে এই দৃষ্টান্ত রেখে গেছে যে, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধের সময় সর্বোত্তম কর্মপন্থা কী হতে পারে।

৭. জঙ্গে সিফফিন ও তাহকিমের পর হজরত মুয়াবিয়ার সঙ্গে হজরত আলির আচরণ প্রমাণ করে যে, খলিফার জন্য মুসলমানদের সকল দেশের উপর কর্তৃত্ব চালানো আবশ্যক নয়। যদিও উত্তম পন্থা এটিই যে, গোটা দুনিয়ার মুসলমান একই শাসকের অধীনে বসবাস করবে, যাতে একতা ও সংহতি বজায় থাকে, তবু সকলকে একই ক্ষমতার অধীনে আনতে গেলে যদি সেই ঐক্যই খান খান হয়ে যায়, রক্তপাতের ঘটনা বৃদ্ধি পায়, অকারণে প্রাণহানির পরিমাণ বেড়ে যায়, তা হলে খলিফার জন্য আলাদা হয়ে যাওয়া শাসককে মেনে নেওয়ারও সুযোগ আছে; যদি সে ন্যায়পরায়ণ ও মুসলিম হয়।

৮. এসব সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সাহাবি ছিলেন উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামী, নিষ্ঠাবান এবং সাওয়াব ও প্রতিদানের যোগ্য। কেউ-ই অনিষ্ট বা অকল্যাণ চাননি।

অবশ্য জ্ঞানের তারতম্যের কারণে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের থেকে ভুল হওয়ার আশংকা ছিল। কেননা তারা তো আলিমুল গায়েব ছিলেন না।

৯. উক্ত ঘটনাবলির মধ্যে উম্মাহর যেকোনো শাসক, সেনাপতি ও সিপাহসালারের জন্য রয়েছে শিক্ষা। আর তা এই যে, বিরোধপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপটে যদি তারা নিষ্ঠার সাথে শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে পূর্ণ চিন্তা ও গবেষণা এবং আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা হলে পূর্ণ আশা রাখতে পারে যে, এর জন্য তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে। পরে যদি দেখা যায় যে, ফল ভুল হয়েছে, তাতেও তারা গুনাহগার হবে না। কেননা মানুষ তো সাধ্যের অতীত কোনো বিষয়ের জন্য আদিষ্ট নয়। তবে হ্যাঁ, নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টায় যে ত্রুটি করবে, সে আল্লাহর কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

১০. মূলত সাহাবায়ে কেরামের এসব মতানৈক্যের নেপথ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে শরিয়তের বিধানাবলি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করে দেখানোর ইচ্ছা কার্যকর ছিল, তাই কোনো সাহাবি আযিমত তথা শরিয়তের বিধানের চূড়ান্ত স্তরের উপর আমল করেছেন, আবার কেউ রুখসত তথা উদার বৈধতার উপর আমল করেছেন। আর এর দ্বারা উম্মাহর সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে গেছে শরিয়তের উভয় দিকের সীমারেখা; অর্থাৎ কোন পন্থাটি সর্বোত্তম, মর্যাদাপূর্ণ ও সঠিক আর কোন পন্থাটি কেবল জায়েজ এবং বিশেষ কারণে গ্রহণযোগ্য।

যেমন হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কোনো সিদ্ধান্ত শরয়ি রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে আযিমত তথা শরিয়তের বিধানের চূড়ান্ত স্তর ছিল না। বরং কেবল জায়েজ ও বৈধতার সীমার মধ্যে ছিল। কিন্তু তার কর্মপন্থার মাধ্যমে উম্মাহ নিরুপায় অবস্থায় এমন বৈধতার উপর আমল করার সুযোগ পেয়ে গেছে। কেননা যদি তিনি এমনটি না করতেন, তা হলে কেয়ামত পর্যন্ত যেকোনো মুসলিম শাসক ও নেতার জন্য সর্বাবস্থায় আযিমত তথা শরিয়তের বিধানের চূড়ান্ত স্তরের উপরই আমল করতে হতো। কারো জন্য রুখসত তথা উদার

বৈধতার উপর আমল করার অবকাশ থাকত না। অথচ অনেক সময় মানুষ রুখসতের উপর আমল করতে বাধ্য হয়ে যায়।

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

হে আমাদের প্রভু, ক্ষমা করুন আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। আর আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না ওইসব লোকের প্রতি, যারা ঈমান আনয়ন করেছেন। হে আমাদের প্রতিপালক, নিঃসন্দেহে আপনি অত্যন্ত মেহেরবান ও পরম দয়ালু। -সুরা হাশর, আয়াত ১০

তারিখে সাহাবা

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

৩৩ - ৬০ হিজরি/ ৬৫৩ - ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ

৩৩ হিজরি

ইবনে সাবার গোপন দাওয়াতি কার্যক্রমের প্রকাশ, কুফার সন্ত্রাসীদের দেশান্তর

৩৪ হিজরি

হজরত আবু তালহা আনসারি রা. এর মৃত্যু... সফর/আগস্ট ৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত উবাদা বিন সামিত রা. এর মৃত্যু... জুমাদাল উলা/নভেম্বর ৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত উসমান রা. এর উপর ব্যর্থ হামলা।

ইবনে সাবা কর্তৃক গুজব রটানো।

কুফায় বিদ্রোহের চেষ্টা... রমজান/মার্চ ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দ।

কুফা থেকে হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. এর দূরে পদচ্যুতি... শাওয়াল/এপ্রিল ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দ।

কুফায় হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এর নিযুক্তি... শাওয়াল/এপ্রিল ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত উসমান রা. এর তদন্ত দল গঠন... জিলহজ/অক্টোবর ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত কা'ব আহবার রা. এর মৃত্যু... ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৩৫ হিজরি

বিদ্রোহীদের মদিনায় অনুপ্রবেশ এবং হজরত উসমান রা. এর সঙ্গে বিতর্ক... রজব/জানুয়ারি ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

বিদ্রোহীদের দ্বিতীয়বার অনুপ্রবেশ... শাওয়াল/এপ্রিল ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দ।

বিদ্রোহীদের সাথে চুক্তি... ১ জিলকদ/ ১ মে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

বিদ্রোহীদের আগ্রাসন ও মদিনা দখল... মধ্য জিলকদ/১৫ মে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত উসমান রা. এর নির্মম শাহাদাত... ১৮ জিলহজ/১৭ জুন ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত আলি রা. এর খেলাফত লাভ ...২৪ জিলহজ/২৩ জুন ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

৩৬ হিজরি

হজরত হুজাইফা ইবনুল ইয়েমেন রা. এর মৃত্যু... মহররম/জুলাইয়ের প্রথম দিকে, ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. এর মক্কা থেকে বসরার দিকে অভিযাত্রা... মহররমের শেষদিকে/জুলাইয়ের শেষদিকে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত সালমান ফারসি রা. এর মৃত্যু... রবিউল আউয়াল/আগস্টের শেষদিকে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত আলি রা. এর মদিনা থেকে কুফার দিকে যাত্রা... ৩০ রবিউল উখরা/ ২৫ অক্টোবর ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

জঙ্গে জামাল... ১০ জুমাদাল উখরা/ ৫ ডিসেম্বর ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত আলি রা. এর সিফফিন গমন... জিলহজ/ মে ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ।

৩৭ হিজরি

জঙ্গে সিফফিন... ৭-৯ সফর/২৬-২৮ জুলাই ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ।

খারেজিদের আত্মপ্রকাশ... রবিউল আউয়াল/ আগস্ট ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ।

দুমাতুল জান্দালের মীমাংসা... রমজান/ ফেব্রুয়ারি ৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ।

৩৮ হিজরি

আশতার নাখায়ির মৃত্যু... ৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ।

নিহরুওয়ানের যুদ্ধ... শা'বান/ জানুয়ারি ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ।

খিররিত বিন রাশেদের শিরশ্ছেদ... ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত সুহাইব রুমি রা. এর মৃত্যু... শাওয়াল/ মার্চ ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত মুয়াবিয়া রা. কর্তৃক মিসর দখল... ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ।

৩৯ হিজরি

পারস্যে হজরত আলি রা. এর সেনাপতি হজরত জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানের বিজয়াভিযান... ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ।

উম্মুল মুমিনিন হজরত মাইমুনা রা. এর মৃত্যু... রজব/ নভেম্বর ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ।

৪০ হিজরি

হজরত আলি ও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মধ্যে সন্ধিচুক্তি... ৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত আলি রা. র শাহাদাত... ১৭ রমজান/ ২৫ জানুয়ারি ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত হাসান রা. এর খেলাফত লাভ... রমজান/ জানুয়ারির শেষদিকে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ।

৪১ হিজরি

হজরত হাসান রা. এর পদত্যাগ... রবিউল উখরা/আগস্ট ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর খেলাফত লাভ... রবিউল উখরা/আগস্ট ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত উকবা বিন নাফে রা. কর্তৃক আফ্রিকায় বিজয়াভিযান... ৬৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

১৭৫ বছর বয়সে হজরত লাবিদ বিন রবিআ রা. এর মৃত্যু... জিলকদ/মার্চ ৬৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

৪২ হিজরি

ইরাকে খারেজিদের গণ্ডগোল... ৬৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. কর্তৃক দক্ষিণ আফগানিস্তানে হামলা... ৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

রাশেদ বিন আমর কর্তৃক সিন্ধুপ্রদেশে আক্রমণ... জিলকদ/ফেব্রুয়ারি ৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান কর্তৃক হজরত মুয়াবিয়া রা. এর আনুগত্য স্বীকার... ৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত উসমান বিন তালহা এবং হজরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া রা. এর মৃত্যু... ৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

৪৩ হিজরি

হজরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা রা. এর মৃত্যু... সফর/মে ৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

খারেজিদের সরদার মুসতাওরিদকে হত্যা... ৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. কর্তৃক খোরাসানের বিজয়াভিযান... ৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত উকবা বিন নাফে কর্তৃক সুদানে বিজয়াভিযান... ৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রা. এর মৃত্যু... রজব/অক্টোবর ৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর মৃত্যু... ৩০ রমজান/জানুয়ারি ৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দ।

৪৪ হিজরি

কাবুল বিজয়... রবিউল আউয়াল/ জুন ৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত মুহাল্লাব বিন আবু সুফরা রহ. কর্তৃক হিন্দুস্থান সীমান্তে বিজয়াভিযান... জুন ৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দ।

লাহোর পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা... জুন ৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দ।

উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবা রা. এর মৃত্যু... জুমাদাল উলা/ আগস্ট ৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর নিজ খেলাফত আমলের প্রথম হজ... জিলহজ/ফেব্রুয়ারি ৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এর মৃত্যু... জিলহজ/ফেব্রুয়ারি ৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত মুয়াবিয়া কর্তৃক হজরত আবু সুফিয়ান রা. থেকে ইয়াজিদের বংশ প্রমাণিত হওয়ার ঘোষণা...

৪৫ হিজরি

হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা. কর্তৃক আফ্রিকায় বিজয়াভিযান... মহররম/মার্চ ৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ।

জিয়াদ কর্তৃক বসরা নিয়ন্ত্রণ... ৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত যায়েদ বিন সাবিত রা. এর মৃত্যু... রজব/সেপ্টেম্বর ৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৪৬ হিজরি

হজরত আবদুর রহমান বিন খালিদ রা. এর মৃত্যু... রজব/ সেপ্টেম্বর ৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দ।
রাবি বিন জিয়াদ হারেসি কর্তৃক সিজিস্তানে কাবুল সম্রাটের সঙ্গে লড়াই ও বিজয়... ৬৬৬৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ।
কিকানে আবদুল্লাহ বিন সাওয়ারের পরাজয়...

৪৭ হিজরি

খোরাসান ও গুরের জিহাদ... ৬৬৭৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ।
রুওয়াইফি বিন সাবিত আনসারি রা. কর্তৃক পূর্ব আফ্রিকায় ত্রিপোলি বিজয়... ৬৬৭৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ।
সিনান বিন সালামা কর্তৃক কিকানে (সিন্ধু ও বেলুচিস্তান) বিজয়াভিজান... ৬৬৭৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

৪৮ হিজরি

মারওয়ান বিন হাকামকে মদিনা থেকে অব্যাহতি ও হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. এর নিযুক্তি... ৬৬৮৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

৪৯ হিজরি

হজরত হাসান বিন আলি রা. এর মৃত্যু... ৬৬৯৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ, এক মত অনুসারে ৫০ হিজরিতে ইনতেকাল করেছেন।
শাবিব বিন বাজরা খারেজির হট্টগোল... ৬৬৯৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

৫০ হিজরি

উম্মুল মুমিনিন হজরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই রা. এর মৃত্যু... সফর/ ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ।
হজরত কা'ব বিন মালিক রা. এর মৃত্যু... রবিউস সানি/এপ্রিল ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ।
হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. এর মৃত্যু... জুমাদাল উখরা/ জুন ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

হজরত মুগিরা বিন শু'বা রা. এর মৃত্যু... শাবান/আগস্ট ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ।
জিয়াদের কুফার শাসনক্ষমতা লাভ... ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ।
আশাল পর্বতমালার জিহাদ... ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ।
কনস্টান্টিনোপলের জিহাদ, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার নেতৃত্ব... ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ।
আফ্রিকায় সর্বপ্রথম সামরিক শহর কাইরাওয়ানের গোড়াপত্তন... ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

৫১ হিজরি

হজরত আবু আইয়ুব আনসারির শাহাদাত... মহররম/জানুয়ারি ৬৭১ খ্রিষ্টাব্দ।
হুজর বিন আদি রা. এর মৃত্যুদণ্ড... ৬৭১ খ্রিষ্টাব্দ।
হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালি রা. মৃত্যু... জিলহজ/ডিসেম্বর ৬৭১ খ্রিষ্টাব্দ।
ইয়াজিদ কর্তৃক হজের নেতৃত্ব প্রদান... জিলহজ/ডিসেম্বর ৬৭১ খ্রিষ্টাব্দ।

৫২ হিজরি

হজরত ইমরান বিন হুসাইন রা. এর মৃত্যু... সফর/ফেব্রুয়ারি ৬৭২ খ্রিষ্টাব্দ।
হজরত কা'ব বিন উজরা রা. এর মৃত্যু... জুমাদাল উলা/মে ৬৭২ খ্রিষ্টাব্দ।
হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা. এর মৃত্যু... রজব/জুলাই ৬৭২ খ্রিষ্টাব্দ।
হজরত আবু বকরাহ রা. এর মৃত্যু... ৬৭২ খ্রিষ্টাব্দ।

৫৩ হিজরি

জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ারে মৃত্যু... রমজান/ আগস্ট ৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দ।
হজরত জুনাদা বিন উমাইয়া রা. কর্তৃক রোডসে জিহাদ... ৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দ।
দামেশকের প্রধান কাজি হজরত ফাজালা বিন উবাইদ আনসারি রা. এর মৃত্যু... ৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দ।

৫৪ হিজরি

মদিনা থেকে হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. কে অব্যাহতি প্রদান এবং মারওয়ানকে পুনরায় নিয়োগদান... ৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দ।
খোরাসানে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের নিয়োগ, বুখারার জন্য প্রথমবার সৈন্য সমাবেশ ঘটানো... ৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দ।
হজরত উসামা বিন যায়েদ রা. এর মৃত্যু... রজব/ জুন ৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দ।
হজরত হাকিম বিন হিযাম রা. এর মৃত্যু... ৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দ।
১২০ বছর বয়সে হজরত হাসসান বিন সাবিত রা. এর মৃত্যু... রমজান/আগস্ট ৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দ।
ইয়াজিদের ক্ষমতায়নের জন্য মারওয়ান বিন হাকামের চেষ্টা।
হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা. এর মৃত্যু।

৫৫ হিজরি

হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এর অভিযাত্রা... মহররম/ ডিসেম্বর ৬৭৪ রবিউল উখরা/ফেব্রুয়ারি ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দ।
মধ্যএশিয়ায় সাঈদ বিন উসমানের বিজয় অভিযান... জিলকদ/সেপ্টেম্বর ৬৭৫ রবিউল উখরা/ফেব্রুয়ারি ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দ।

৫৬ হিজরি

উম্মুল মুমিনিন হজরত জুওয়াইরিয়া রা. এর মৃত্যু... মহররম/ ডিসেম্বর ৬৭৫ রবিউল উখরা/ফেব্রুয়ারি ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দ।
মধ্য এশিয়ায় সাঈদ বিন উসমানের বিজয়যাত্রা, সমরকন্দ বিজয়... রবিউল উখরা/ফেব্রুয়ারি ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দ।
সমরকন্দের রণাঙ্গনে হজরত কুসাম বিন আব্বাস রা. এর শাহাদাত... রবিউল উখরা/ফেব্রুয়ারি ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দ।
নিজ শাসনামলে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দ্বিতীয় হজ, ইয়াজিদের মনোনয়নের ঘোষণা... জিলহজ/অক্টোবর ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দ।

৫৭ হিজরি

আফ্রিকায় হজরত হাসসান বিন নুমানের নিযুক্তি ও বিজয়াভিযান... ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দ।
মদিনা থেকে মারওয়ানকে অব্যাহতি ও ওয়ালিদ বিন উতবার গভর্নরের পদ লাভ... শাওয়াল/আগস্ট ৬৭৭ খ্রিষ্টাব্দ।

৫৮ হিজরি

উবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এর মৃত্যু... এপ্রিল ৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দ।
মিসরের সাবেক গভর্নর ও নৌবাহিনী প্রধান, হজরত উকবা বিন আমের আল জুহানি রা. এর মৃত্যু.... এপ্রিল ৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দ।
হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর মৃত্যু... ১৭ রমজান/১৩ জুলাই ৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দ।

৫৯ হিজরি

আফ্রিকায় আবুল মুহাজির দিনারের বিজয়যাত্রা এবং কারতাজনার উপর আক্রমণ... ৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দ।
মক্কার মুয়াজ্জিন হজরত আবু মাহযুরা রা. এর মৃত্যু... ৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দ।
হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. এর মৃত্যু... ৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দ।
হজরত আবু হুরাইরা রা. এর মৃত্যু... জিলকদ/আগস্ট ৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দ, আরেক মত অনুসারে ৫৭ হিজরি।

৬০ হিজরি

হজরত সামুরা বিন জুনদুব রা. এর মৃত্যু... মহররম/অক্টোবর ৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দ।
মুয়াবিয়া রা. এর মৃত্যু... প্রসিদ্ধ মত ২২ রজব, সহিহ মত ৪ রজব/ ১১ এপ্রিল ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ।

[পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত]

Al-MANHAL
Publishers

Ref: AMP-107

Permission

for the publication of the Book.

Peace be upon you and Allah's mercy and blessings be upon you!

Name: Maktabatul Ettihad,
Bangla Bazar, Dhaka, Bangladesh

We allow Maktabatul Ettihad, Bangladesh to publish the Bengali translation of our famous book, "Tareekh E Ummat E Muslima (4 volumes per now)" by Molana Ismail Rehan Sahib.

No person / institution other than Maktabatul Ettihad is allowed to copy or translate the contents of the said book. Otherwise Maktabatul Ettihad (NID: 15137592689З) will take strict legal action.

اجازت نامہ

برائے اشاعت کتاب

Al Manhal Publisher

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা | জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২ | ০১৭৮৯-৮৭৩৬৭৯
০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫ | ০১৯৫৩-০৩৯৮৯৩

Cover: Kelayat 01712-813599